একটি খামে ভরা কাহিনী

আবুল বাশার

সৃষ্টি প্রকাশন

প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৯
প্রকাশক : অমল সাহা
সৃষ্টি প্রকাশন, ৩৩ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯।
প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী
মুদ্রক : দি সরস্বতী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
২০ গুরুপ্রসাদ চৌধুরী লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯।

‘সৃষ্টি’র কথা

উনবিংশ শতাব্দীকে বলা হয় বইয়ের শতক। বিংশ শতাব্দীর গর্ব, তা নাকি ফিল্মের, আর একবিংশ শতাব্দী পূর্বচিহ্নিত হয়ে রয়েছে টেলিভিশনের জন্য। এই বাতাবরণে দাঁড়িয়ে একটা কথা এখন প্রায় স্লোগানে দাঁড়িয়ে গিয়েছে— বই আর কেউ পড়তে চায় না। ওটা সেকেলে অভ্যেস। বই পড়ুন, বই পড়ান— পোস্টার নিয়ে বিশিষ্ট সাহিত্যসেবীদের পদযাত্রা সেই ভাবনাকেই আরও উসকে দেয়।

আমরা কিন্তু এই ভাবনার শরিক নই। আমরা বিশ্বাস করি, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়ার আগুনে পুড়তে পুড়তেও ফিনিক্স পাখির মতো বেঁচে থাকবে, ডানা মেলে আকাশে উড়বে এবং দিগন্তের মৃত্তিকা স্পর্শ করবে বই। বিদেশে গ্রন্থপাঠের সাম্প্রতিক প্রবণতা আমাদের বিশ্বাসকেই বলিষ্ঠভাবে সমর্থন করে। এই চিন্তা থেকেই জন্ম সৃষ্টি প্রকাশনের— সৃষ্টি পরিবারের প্রথম সন্তান। জন্মলগ্নেই যে শুনেছে প্রকাশকের কান্না, চোখ খুলেই যে অনুভব করেছে লেখকের হাহাকার। জ্ঞান হওয়ার আগেই যার মনে হয়েছে বাংলা প্রকাশন আজ মুমূর্ষু শিল্পের অন্তর্গত।

অথচ এরকম তো হওয়ার কথা ছিল না। বাংলা ভাষায় সাহিত্যসেবীরা যে বিশ্ববন্দিত সে কথা আজ আর অজানা নয়। সেই সুমহান ঐতিহ্যকে মাথায় রেখেই সৃষ্টি প্রকাশন তাদের কাজ শুরু করেছে। আমাদের ব্রত বাংলা প্রকাশনা জগতের স্বর্ণযুগ ফিরিয়ে আনা। আমরা বিশ্বাস করি, যে জমি একদা সুফলা ছিল তা কখনও বন্ধ্যা হতে পারে না। দরকার যুগোপযোগী সার দিয়ে তাকে উর্বর করে তোলা, যাতে নবীন-প্রবীণ লেখকেরা শুধু তাঁদের সৃষ্টির প্রতি দায়বদ্ধ থেকে লেখার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করতে পারেন। বাকি দায়িত্ব তো আমাদের। আমরা মনে করি, বাংলা বইয়ের পাঠক ছিল, আছে, থাকবে। আসুন, আমরা সবাই মিলে চেষ্টা করি যাতে বাংলা প্রকাশনা জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করতে পারে।

সূচিপত্র

একটি খামে ভরা কাহিনী	৯
খেলনা ভাইবোন	১৪
রক্ত সরস্বতী	২৮
নদীর ওপার কহে	৪৩
আমার মতো একটা লোক	৬৪
হিংসার উৎস	৭৮
হাওয়া একটি সংকেত	৯০
কারাগার	১০৭
অরণ্য বৃষ্টির গল্প	১২৪
ডানামেলা বৃশ্চিক	১৩৬
উৎসর্গ	১৫০
ছোটগল্প	১৬৭
কালো মেঘ যেন সাজিল রে	১৭৮
পথ	১৯১
একটি রক্তাক্ত ভুল	২০৫

একটি খামে ভরা কাহিনী

বিয়ের রাতেই সুমনা জানতে পারে তার বর আসলে একজন কাঠ বেকার। সিম্প্‌ল্‌ বি. এ. পাশ। যখন একথা তার কানে এল, তখন যা হওয়ার হয়ে গেছে। কী অদ্ভুতভাবে ঠকে গেল সুমনা। এই ধরনের ঘটনা সে সস্তা বাংলা উপন্যাসে পড়েছে এবং কাঁচা বাংলা সিনেমায় দেখেছে।

বরের ছোট বোনটার বয়েস দশ-এগারো হবে। ওর নাম তুলসী। তুলসীর একটা হাত নরম করে মুঠোয় ধরে কাছে টেনে নেয় সুমনা এবং শুধোয়—ওরা সব কী যেন বলাবলি করছে, তোমার ছোড়দা সম্পর্কে। আচ্ছা তুলসী, তুমি কোন্ ক্লাসে পড়?

—সিক্সে।

—তোমার ছোড়দা কোন্ ক্লাসে পড়ত?

—কলেজে।

—কবে পাশ করল?

—বছর চার আগে। না, পাঁচ-ছ বছর হয়ে গেল।

—তারপর?

—তারপর কী?

—এম. এ. পড়ে নি?

—না। কী জানি!

—তোমাদের কাপড়ের ব্যবসা ছোড়দা চালায়?

—না।

—কে চালায়?

—মেজদা ফার্নিচারের দোকানে বসে।

—কাঠের ফার্নিচার?

—হ্যাঁ।

—বড়দা কী করে?

—স্কুলে পড়ায়।

—কী স্কুল?

—প্রাইমারি।

—ছোড়দা তাহলে কী করে?

—তোমরা টাকা দিলে বুথ চালাবে, সঙ্গে জেরক্স মেশিন বসাবে।

—ওহ, টেলিফোন বুথ?

—হ্যাঁ।

—আচ্ছা, যাও। বলে তুলসীর হাত ছেড়ে দেয় সুমনা। তার শরীরটা কেমন ঠান্ডা হয়ে আসছিল।

যথা সময়ে বরকে সুমনা তার অঙ্গ স্পর্শ করতে দিল না এবং অষ্ট মঙ্গলায় সম্পূর্ণ বেঁকে বসল। শ্বশুরবাড়ি যেতে চাইল না। বড় পিসেকে ডেকে বলল—ওদের ফিরিয়ে দিন পিসেমশাই আমি যেতে পারব না । এই বিয়ে আমি স্বীকার করি না । আচ্ছা ছেলেকে ডাকুন, আমিই যা বলার বলে দিচ্ছি । সবার সামনেই বলতে চাই।

—তোমার সঙ্গে কথা হয়নি তিলকের?

—কী কথা ?

—তিলক এম এ পাস করেছে । অনার্স রাখতে পারেনি । কাপড়ের ব্যবসাও করে না । অথচ এই সবই আমাকে বলেছিল ওরা । সবচেয়ে যা খারাপ লাগছে তা হল, তিলকের বড় মামা গণেশ দত্ত এখনও বলে যাচ্ছে, ছেলে ওর সঙ্গে কাপড়ের ব্যবসাই করে । কোথায় আর করে? ছেলে তো দোকানের চাকর।

—আমাকে বলেছে, ওকে ওর মামা দোকানের অর্ধেকটা লিখে দিয়ে ব্যবসা আলাদা করে দেবে । তবে শর্ত আছে, লাখ টাকার যৌতুকের পুঁজি লাগিয়ে ভালো করে ব্যবসা খাড়া করে দিতে হবে। তা না করলে কম্পিটিশনের বাজারে বিজনেস দাঁড়াবে না। আবার একথাও শুনেছি, টেলিফোনের বুথ আর জেরক্স। —দোকানের অর্ধেকটা খালি করে কাঁচের ঘর দু'খানা বসিয়ে নতুন ব্যবসা ধরবে। তার জন্য আমাদেরই ব্যবস্থা করে দিতে হবে। অন্তত এক লাখ দিতে হবে।

—আপনার সঙ্গে এই সব দরদাম আগেই নাকি হয়েছে।

—মিথ্যে কথা সুমনা। নির্জলা মিথ্যে। ভয়ানক ধাপ্পা দিয়েছে আমাকে।

—আপনি আগে থাকতে কিছুই টের পেলেন না। ও যে সিম্পল বি. এ.। এম. এ. করেনি। বেকার। কিছুই জানলেন না!

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে শিশুর মতো দু'হাতে মুখ ঢেকে বড় পিসে সহসা হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন।

পিসের ওই কান্নার ভিতর দিয়েই অষ্টমঙ্গলার ভয়ানক ব্যর্থ কুটুম্বিতার পর্ব চুকেবুকে গেল এবং সময়ান্তরে একদিন বোঝাপড়ার এক আইনি বিচ্ছেদ শেষ হল। সুমনা তিলকের চোখের দিকে একবার চেয়েও দেখল না।

ওই ঘটনার কোনও চিহ্ন সুমনার শরীরে ছিল না। সুমনার ধারণা, তার মনেও কিছু নেই, রাজহংসীর ডানার ঝাপটায় যেমন নীর ঝরে যায়, সেইভাবে ওই বিয়ের সমস্ত স্মৃতি ঝরে গেছে। কষ্টও আর নেই। তিলকের সঙ্গে তার শুভদৃষ্টি হয়েছিল, সেই মুখও মনে পড়ে না। এতদিনে সে বড় পিসেকেও ক্ষমা করে দিতে পেরেছে।

সুমনার বিয়ে হয়েছিল তার অনার্স পরীক্ষার পর রেজাল্টের আগে। অষ্টমঙ্গলার

তিন মাসের মধ্যে রেজাল্ট বেরল। তারপর এম. এ. ভর্তি হল যাদবপুরে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াকালীন সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্র সুদীপ্তর প্রেমে পড়ল সুমনা। কিন্তু সুদীপ্তকে সে তার বিয়ের ঘটনা মুখ ফুটে কিছুই বলতে পারল না। তার কেবলই মনে হতে লাগল, সুদীপ্ত যদি ভুল বোঝে। অথচ কোনও ভাবে একদিন কথাটা যদি সুদীপ্তর কানে যায়, তাহলেই বা সুদীপ্ত কী ভাববে!

ভাবনাটা সুমনাকে ধীরে ধীরে এমন করে পেয়ে বসল যে, তার মনে এক দুর্বহ আতঙ্ক সৃষ্টি হল। মাঝে মাঝেই তার অসম্ভব মাথা ধরত। সুদীপ্ত প্রশ্ন করত—কী হয়েছে তোমার! মাঝে মাঝে অদ্ভুত লাগে তোমাকে! মনে হয়, তুমি আমাকে চিনতেই পারছ না।

—মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, সুদীপ্ত।

—মাঝে মাঝেই মাথা ধরছে। মনে হচ্ছে, অন্য কোনও অসুখ!

—কী অসুখ?

—একজন বড় ডাক্তার দেখানো দরকার। তুমি ঘুমের বড়ি খাও বলছিলে।

—না খেলে ঘুমাতে পারি না যে!

—কতদিন ধরে খাচ্ছ?

—তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই। যখন বুঝলাম, তুমি আমাকে ভালোবাসো তখন থেকে।

—আমিই তাহলে তোমার মাথা ধরিয়ে দিয়েছি। আচ্ছা, তুমি কি আমার সম্পর্কে কখনও নিশ্চিত হতে পার না?

—না।

—কেন?

—আমারই দোষ। বলে মিনিট খানিক চুপ করে থেকে সুমনা নিঃশব্দে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল। এবং মনে মনে বড় পিসের বুদ্ধির দোষেই যে এত কষ্ট, তা সে অনুভব করছিল। এবং তিলকের লোভার্ত চোখ দু'টি কল্পনা করবার চেষ্টায় চোখ বুজে কেঁদে চলেছিল। কিন্তু কিছুতেই মুখটা মনে করতে পারছিল না।

সুমনার অসুখ আরও বেড়ে যেতে লাগল। সে এক আশ্চর্য আচ্ছন্নতার ভিতরে ঢুকে পড়ল। কথা বলা কমে গেল। সুদীপ্তর সঙ্গে দেখা হলেই তার চোখে নিঃশব্দে জল এসে পড়ত। কথা বলতে গেলেই আবেগে গলা বুজে আসত। ইংরেজি এম. এ.-র পরীক্ষা তার ভালো হল না। ফল বার হলে দেখা গেল, নম্বর যা সে পেয়েছে, তাতে কলেজের চাকরি তার হবে না। তাকে স্কুল-সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসতে হবে। উত্তীর্ণ হলে হাই বা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে চাকরি হবে। এই পরাজয় সুমনা মনে মনে মেনে নিতে পারল না। ফলে তার স্নায়ুর অসুখ আরও জটিল হল।

সেই অসুখকে জটিলতর করে তুলল সুমনার চাকরি। চাকরি হল একটি মফঃস্বল স্কুলে। শিয়ালদা দক্ষিণ থেকে ঘণ্টা দেড় ট্রেনে গিয়ে রিকশা ধরে বিশ মিনিট গেলে স্কুলে পৌঁছনো যায়। সুমনা স্কুলে পৌঁছে ভূত দেখার মতো চমকে উঠল। টিচার্সরুমে এক

কোণে চুপ করে বসে রয়েছে তিলক। এই সময় স্কুলের নতুন বর্ষ শুরু হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের বুকলিস্ট দেওয়া হচ্ছে। পুরনো স্কুল। ছাত্রছাত্রী অনেক। বুকলিস্টে শিক্ষকদের মুদ্রিত নামের তালিকা মস্ত।

হেড মাস্টার মশাই তাঁর ঘর থেকে বেরিয়ে নূতন শিক্ষয়িত্রীর সঙ্গে টিচার্সরুমে এসে পরিচয় করলেন এবং অন্যান্য শিক্ষকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে নমস্কার বিনিময় করালেন।

তিলকও হাত তুলে নমস্কার করল সসংকোচে। হেডমাস্টার মশাই বললেন— তিলককুমার দত্ত। বাংলায় এম. এ.। ছ'মাস হল এসেছেন। ভাল পড়ান। আপনাকেও পাওয়া গেল। ইংরেজির আরও একজন আছেন। উনি আজ আসেননি। পরে নিশ্চয় পরিচয় করানো যাবে। আচ্ছা, আপনিও একটা বুকলিস্ট রাখুন, সামনের বারে আপনার নাম উঠবে। এ বছরটা হল না।

ক্লাশ এখনও শুরু হয়নি। মাস্টারমশাইরা যে যার মতো সময় কাটিয়ে, গল্পগাছা করে, ক্যারম খেলে দুপুর গড়ালে বাড়ি ফিরে যাচ্ছেন। অল্প শিক্ষকই তিন-চারটে নাগাদ রইলেন। ছাত্রছাত্রীরাও বুকলিস্ট পেয়ে ধীরে ধীরে বাড়ি ফিরে গেছে। এ স্কুলে আরও পাঁচজন শিক্ষিকা রয়েছেন। আজ তিনজন এসেছিলেন। তাঁদের একজন তো অত্যন্ত কম বয়েসি। তিলকের সঙ্গে অনর্গল কথা বলে যাচ্ছিল।

রিকশায় বসে বুকলিস্টে চোখ রেখে তিলকের নাম খুঁজল সুমনা। শেষের দিকে রয়েছে তিলককুমার দত্ত এম. এ.।

রিকশা ছেড়ে দিয়েছিল। পিছন থেকে ডেকে উঠল তিলক। রিকশা থেকে বুকলিস্ট হাতে, ব্যাগ কাঁধে নেমে পড়ল সুমনা।

তিলক এগিয়ে এসে বলল—আপনি আসছেন, খবর দু'দিন আগেই পেয়েছি। নাম শুনে কৌতূহল হল, ভাবলাম, এই নামে অন্য কেউ হবেন। তা নয়, আপনার অনার্স ছিল, এম. এ. করেছেন, আপনিই সেই । ভারি সুন্দর ঘটনা। ভয় নেই আপনার। ভালো জায়গা। সুদীপ্তকে আমি চিনি।

—কী করে!

—কী করে আবার, ও আমার দূর সম্পর্কের মামাতো ভাই। এক বছরের ছোট। ভালো ছেলে। আপনার সঙ্গে ভাব হয়েছে শুনে আমার ভালো লেগেছে। ছোট মামার দোকানের ভাগ আমি আর নিইনি। স্কুল-সার্ভিস করে চাকরিটা হয়ে গেল কিনা!

—আপনি তাহলে মিথ্যা বলেছিলেন।

—না।

—এম. এ. পাশ করলেন কবে?

—অষ্টমঙ্গলায় তাড়া খেয়ে ফিরে এসে প্রাইভেট এম. এ.-র রেজাল্ট পেলাম।

—বললে পারতেন।

—প্রাইভেটের কথা বলা যায়! যদি না উতরোই! তা যাই হোক। আপনার কাছে

আমার কৃতজ্ঞতা জানানোর আছে সুমনা।

—কৃতজ্ঞতা!

—কৃতজ্ঞতাবশত একটি চিঠিও লিখে রেখেছি। কেন কী, সুদীপ্ত বলেছিল, সুমনা স্কুল সার্ভিস দিয়েছে, ওরালে আটকাবে না। তাই মনে হল, আপনিই সেই, অন্য কেউ নয় দেখে, বেশ আনন্দ হল। ছোট চিঠি লিখেছি, 'আমি সুমনাকে ছুঁয়েও দেখিনি। আসলে সুমনা আমাকে ছুঁতে দেয়নি। যে কেউ তাকে পবিত্র চিত্তে গ্রহণ করতে পারে।' এতে যদি আপনার অসুখ সারে! নিন। চিঠিটা সঙ্গে রাখুন। বলে একটা সাদা খাম সুমনার সামনে এগিয়ে ধরল তিলক।

—কৃতজ্ঞতা কিসের বললেন না?

—ওই আর কী!

—বলুন শুনি। না বললে বুঝব কী করে।

—আমার ধারণা, কলেজে সুমনা মিত্র আমাকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাই আমি অনার্স পাইনি। বিয়ের পর সুমনা ঘোষাল বাতিল করে দিল। কিন্তু এম. এ. পাশ করে গেলাম। ভারি আশ্চর্য! দুই সুমনা আমাকে মেরেও বাঁচিয়েছে, তাই কৃতজ্ঞতা! বলতে বলতে তিলকের চোখ দু'টি একটুখানি ছলছল করে উঠল।

রিকশা তাড়া দিল সুমনাকে। হাতে ধরা মোক্ষম, অমোঘ খাম। পরম আশ্বাস। চরম নিশ্চয়তা। তিলকের চোখে বিস্ময়কর অশ্রুর ঘন ব্যথা।

সুমনা হো হো করে একলা আপন মনে হেসে উঠে খামটা ছিঁড়ে কুটি কুটি করে বাতাসে ছড়াতে ছড়াতে সম্পূর্ণ পাগল হয়ে গেল।

খেলনা ভাইবোন

সুগতর পড়া এবং থাকার ঘর একটাই। পাশের ঘরে বাবা থাকেন। ঠিকে কাজের লোক দুবেলা রান্না এবং অন্যান্য কাজ করে দেয়। বাড়িতে অন্য কোনও মানুষ নেই এবং প্রাণীও নেই। তবে মাঝে মাঝে রাস্তার দু' একটা পাগল ঢুকে পড়ে। এবং রাস্তার কুকুরও আসে। বাবা এবং ছেলে দু'জনই এদের কখনও মানা করে না।

দরজায় ঢোকার মুখে দুটো কুকুর আলগাভাবে পাহারায় বসে ছিল, মালবীর পথ আটকাল না মোটে। দরজা খোলাই ছিল। এরা দরজা আঁটে না, আধখোলা রেখে বাড়িতে থাকে। রাত বারোটার পর খিল দেয়। জানলায় কোনও পর্দা নেই, পাল্লাও ভেজানো থাকে না। জানলার কাছে এসে দাঁড়ালে ঘরের ভেতরটায় প্রায় সমস্ত বস্তু চোখে পড়বে।

দরজা আধখোলা। মালবী ঢুকে এসেই চমকে উঠল, সিঁড়ির তলায় একটা পাগল শুয়ে আছে। সিঁড়িটা উপরে মেজনাইন ফ্লোরে উঠেছে। হিসেব করে বুঝলে, বাড়িটাকে দেড়তলা বলা যায়। পাগল যে সিঁড়ির তলায় এভাবে শুয়ে থাকে তাই বা কে জানত!

পাগলটা মালবীকে একচোখ খুলে দেখে নিয়ে মিচকি একটা হাসি দিয়ে কাত ফিরে ভালো করে শোবার চেষ্টা করতে করতে বলল—ওয়েলকাম।

মালবী রীতিমতো ঘাবড়ে গিয়ে ঘামতে শুরু করেছে। এ তো শিক্ষিত পাগল! কুকুর দুটোও ভালো খায়দায় মনে হল। পাগলটার সারামুখে দাড়িগোঁফ এবং বাবরি চুল মাথায়, মোটে নোংরা নয়। চুল এবং দাড়িগোঁফ চিরুনি দিয়ে আঁচড়ে রাখে। তবে গায়ের জামাটা পিঠ-ফাটা, পরনের ফুলপ্যান্টটাও জুতের নয়। সব দেখে শুনে মালবী ভয়ে চেঁচিয়ে উঠতে গিয়ে সামলে নিয়ে একটা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। ঢুকেই খানিকটা অনুমান করে, এটিই তাহলে বোধহয় সুগতর ঘর। আলমারি ভর্তি বই, সেলফে বই। চৌকির উপর বই, ম্যাগাজিন ইত্যাদি ছড়ানো। এই সবই সুগতর চিহ্ন হতে পারে। কিন্তু সারা ঘরে এত খেলনা সাজানো কেন? পুতুল, খরগোশ, ভালুক, সিংহ, বানর, বাঘ, হরিণ, কী নেই? খেলনা মোটরগাড়ি, ট্রেন, উড়োজাহাজ, সব আছে। সবচেয়ে যা অবাক করে দেয়, তা হল, নিপল্অলা দুধের বোতল পর্যন্ত আছে।

সুগত কি তাহলে বিবাহিত? নাকি এটা তার বউদির ঘর?

সুগতর সঙ্গে মালবীর পরিচয় বেশি দিনের তো নয়। ঘনিষ্ঠতাই বা কতটুকু! আজ এই প্রথম মালবী সুগতদের বাড়ি এসেছে। এখন খাড়াখাড়ি দুপুর। রোববারের ছুটির দিন।

কিছুক্ষণ হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে থাকে মালবী। ঘরের কোণে ছোট টেবিলটায় থাক করে বই সাজানো, ম্যাগাজিনগুলোও সাজিয়ে রাখা, কিন্তু সেখানেও একটা কালো

ভল্লুক বসে রয়েছে। চেয়ারটায় পড়ে রয়েছে একটা খেলনা মোটরবাস। কাত হয়ে পড়া। সমস্ত যত্নের মধ্যে যেন বা রয়েছে একটি শিশুর খেয়ালি শান্ত উপদ্রব। শরৎ রচনাবলির একটা খণ্ডের উপর শিশুটি ফেলে রেখেছে একটি খেলনা পিস্তল। রচনাবলির গা-লাগা দুধের বোতলটা সামান্য কাত করে শোয়ানো। কিন্তু শিশুটি কোথায়?

সুগত বিয়ে করবে কেন? এই বয়সে, তা-ও কি কেউ করে নাকি! এম. এ. ফাইনাল ইয়ার হয়ে গেছে, রেজাল্ট হয়নি। তার আগে বিয়ে এবং বাচ্চা? ভেবেই মালবীর হাসি পেয়ে গেল। আসলে, সুগতর গায়ের গন্ধই বলে দেয়, সে অসংসারী এবং অবিবাহিত তরুণ।

তাহলে এই খেলনাগুলি কিসের? বিস্ময়ের ঘোর নিয়ে ডাইনিংয়ের সিঁড়ির কাছে বেরিয়ে আসে মালবী। পাশের ঘরে ঢুকে দেখবে কিনা ভাবে। কোথায় সুগত? পাগলটা এবার চিৎ হয়ে একটা চোখ খুলে ফিচেল হাসি দিয়ে বলল—লড়কা উপরমে হ্যায়। যাও, উধর দেখো। বলেই আবার কাত হয়ে গেল পাগলটা।

দেড়তলায় উঠে আসে মালবী। এই ঘরটাও নীচের ঘরটার মতো বই আর খেলনায় ভর্তি। ঘরের চৌকিতে চারদিক ঘেরা বইয়ের মাঝখানে শুয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে সুগত। কোলের কাছে একটা জোকার লালমুখো পুতুল পড়ে রয়েছে। খুবই অবাক হয়ে গেল মালবী।

সুগত প্রখর যুক্তিবাদী এবং গভীর তার মেধা। অসম্ভব ভালো প্রবন্ধ লেখে এবং একটি লিটল ম্যাগাজিন চালায়। একটু আধটু কবিতাও লিখতে পারে। সবচেয়ে অবাক করার মতো ওর খোলা গলার গান। একদিন ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসে ক্যানটিনের সামনের চাতালে ওকে গাইতে শুনেছিল মালবী। সেই দিনই তার হৃদয় দ্রবীভূত হয়ে পড়ে।

মালবীর মন সেদিনই বলেছিল, এই গান আমি একান্তে শুনব। কেউ সেখানে থাকবে না। কিন্তু চাই বললেই তো হল না, সুগতকে বাগে আনতে হবে। সেই সুযোগও সুগতই দিয়েছিল। হঠাৎ সরল গলায় বলে উঠেছিল—তোমার হাতের গোলাপটা কি আমার জন্যে?

—বাঃ! নেবে নাকি। দিতে পারি, তবে আর একটা গাইতে হবে।

—ওটা কোথা থেকে পেলে?

—একজন দিয়েছে।

—সরি! তাহলে নেব না।

—কেন? সে কিন্তু ছেলে নয়।

এই কথায় বেদম সমস্বর হাসির সাড়া পড়ে যায়। তারপর কী হয়েছিল? মালবী হাসির মধ্যেই বলেছিল—এটা উত্তরার মুঠোয় ছিল। আমি নিয়েছি।

—এ তাহলে অনেক হাত ঘুরে আসছে সুগত। ভেবে দ্যাখ নিবি কিনা। বলে উঠেছিল কে যেন।

মালবী কিন্তু চমৎকার উত্তর দিয়েছিল—ওই গানটাও কিন্তু অনেক কণ্ঠ ঘুরে এখানে এসেছে। উত্তরাকে কে প্রেজেন্ট করেছে, আমি জানতেই চাইনি। গান আর গোলাপ এঁটো হয় না। কী বলিস স্নিগ্ধা?

—এটা কিন্তু ভাই অকাট্য ফিলসফি হয়ে গেল মুকুন্দ।

—হবেও বা। তবে মালবী নিদারুণ বলেছে সুব্রত। আমি তো এঁটোকাটা যা পাই তাই নিই।

—তুমি কি বেড়াল নাকি সিকন্দর?

—না, আমি রুমাল।

আবার হাসি যেন বেতস দোলায় ছন্দ পেয়েছে, তখনই সুগতর কোলে এসে পড়ে লাল গোলাপ। অন্য কে সেটা ছোঁ মেরে তুলে নেয়। গান ধরে সুগত। মনেও হয় না, সে কারও উপহার প্রত্যাশা করে।

পরের দিনই বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটের মুখে সুগতর সঙ্গে মালবীর দেখা হয়ে গেল। মালবী বলল—ফুলটা কিন্তু অন্য কেউ নেয়, আমি চাইনি।

—উৎপল নিয়েছিল বোধহয়।

—আমি চাইনি।

—বেশ তো, এখন দাও তাহলে।

—এখন কোথায় পাব। ঠিক আছে, আমি দেব। তবে একটা শর্তে।

—উপহারের আবার শর্ত কী? একটা তো মাত্র গোলাপ।

—তা-ও আছে। আমাকে একলা গান শোনাতে হবে। সেখানে কেউ থাকবে না। তোমাকে অনেক গোলাপ দেব সুগত।

—আমি কারও হাত থেকে একটার বেশি নিই না, তা-ও একবার। তুমি একবারই দিও। একদিন তোমাকে নিশ্চয় শোনাব।

সুগতর কথায় মালবীর মুখটা ম্লান হয়ে গেল। পরের দিন সুগতকে খুঁজে বার করে মালবী বলল—কবে যাবে তুমি?

—আজই।

—কখন?

—এখনই।

—বেশ চলো।

মালবীদের বিশাল অট্টালিকা দেখেই সুগত বলল—জানতাম।

—কী জানতে?

—তোমরা ভীষণ বড়লোক।

—জানতে কীভাবে? কার কাছে শুনেছ?

—কেউ বলেনি। আমি এমনিই বুঝতে পারি।

বাড়িতে ঢোকার মুখে নেমপ্লেট দেখে অত্যন্ত বিচলিত বোধ করে সুগত।

মালবীর বাপমা দু'জনই ডাক্তার। বাবা মনোরোগ বিশেষজ্ঞ। মা শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ। কী সাংঘাতিক বাড়িতে ঢুকতে হচ্ছে সুগতকে।

সুগত হঠাৎ বলল—তুমিও ডাক্তার হলে পারতে মালবী। অবশ্য তাহলে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হত না।

—সেই জন্যই তো হইনি।

—একেই কবিরা বলেছেন মধুর মিথ্যা। তা-ও ভালো যে, সত্যিই তুমি হওনি।

—হায়ার সেকেন্ডারিতে আমার সায়েন্স ছিল সুগত। ডাক্তারি পড়ার নম্বর পাইনি তা নয়। তবে জয়েন্ট এন্ট্রান্সে না বসে ইংরাজি অনার্স নিয়ে কলেজে ভর্তি হলাম। ক্ষমতা ছিল কিনা জানি না, তবে ইচ্ছে একটুও ছিল না।

—তার মানে, মনে মনে একটা পস্তানি তোমার রয়েই গেছে। তুমি ভুল স্ট্রিমে এসে পড়েছ।

—না, একদম নয়। বাবা বলেন, উগ্র ইচ্ছের নামই ক্ষমতা। কিন্তু আমার সে ধাতই নয়। তবে বাবার সমস্ত ইচ্ছেই খুব কঠিন। খুব ধারালো আর অন্ধ।

মালবীর কথা শুনতে শুনতে এবার সুগত চমকে উঠল। মালবীর প্রতিটি বাংলা শব্দ খুব নির্বাচিত এবং ইংরেজির অনুবাদ। সুগত কল্পনা করল, একটি ধারালো অন্ধ ছুরিকে, যা দিশেহারা বেগে কোথাও এগিয়ে যাচ্ছে।

মালবীর মুখের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে সুগত জানতে চাইল—তুমি তোমার বাবার মতো নও?

—না।

—মায়ের মতো?

—কী জানি। মাকে আমি ভালো করে দেখলামই বা কবে।

মালবীর কথা অদ্ভুত ঠেকল সুগতর। নেমপ্লেটটা ভালো করে দেখতে দেখতে বিস্মিত গলায় বলল—শ্রীমতী বি. বি. চ্যাটার্জির সঙ্গে তোমার....

—সম্বন্ধ বক্র। উনি আমার মা নন। উনি আমার বাবার মিসেস। কই এসো। বি. বি. চ্যাটার্জি অন্যের বউ ছিলেন, বাবা তাকে ছিনিয়ে নিয়েছেন। মাই ফাদার ইজ এ স্ন্যাচার। এসো, দরজা খুলেছে।

—কিন্তু তোমার মা?

—মা কোথায়? অস্পষ্ট ভাবে জানি, শহরতলির একটা নার্সিং হোমে মা নার্সের কাজ করে। ডাক্তারি পড়ার কথা ভাবামাত্র মনে হয়েছিল, আমি ডাক্তার হয়ে যেখানে যাব, সেই হাসপাতাল বা নার্সিংহোমে মা আমারই আন্ডারে কাজ করবে, মাকে আমি চিনতে পারব না। এই কল্পনাটাই সব মাটি করে দিয়েছে সুগত। কাউকে খুঁজতে হলে বা খুঁজে না পাওয়ার জন্য সাহিত্যই সবচেয়ে ভালো মিন্‌স। আমি জানি, মাকে আমি খুঁজি না। সুগত, আমার কথা তুমি কাউকে বোলো না। বলার শেষে মালবীর চোখে নিঃশব্দে জল এসে পড়ল।

চিত্রার্পিত বোবা বিস্ময় সুগতকে বাণবিদ্ধ অবস্থায় দাঁড় করিয়ে দিল মালবীদের সৌধের বাইরে দরজার কাছে। সুগত শিথিল জিহ্বায় সতৃষ্ণ স্বরে বলে উঠল—আমরা দু'জন আদিম ভাইবোন মালবী। এসো, আমরা সম্পর্ক পাতাই।

—তাহলে তুমিও এসো ভেতরে! গাঢ় বেদনা-বিস্ময়ে সুগতকে ডাকল মালবী। এবং শুধালো—ভাইবোন কেন?

—আদিম বাইবোন।

—কেন সুগত?

—পরে বলব তোমাকে। কিন্তু আমি ভেতরে যাব না।

—তোমার গান?

—শোনাব একদিন।

—তোমার ফুল?

—দিও একদিন। বলেই দ্রুত রাস্তায় নেমে চলে গেল সুগত।

সেই ফুল আজ কাঁধে ঝোলানো কাপড়ের থলের মধ্যে সঙ্গে করে এনেছে মালবী। এ ঘরে একটা চেয়ারে চুপচাপ বসে সুগতর ঘুমন্ত মুখের দিকে চেয়ে থাকল এবং পলক পড়তে চাইল না। মালবী চেয়ে থাকতে থাকতে মাথার মধ্যে বিদ্যুৎবাহী তরঙ্গের মতো চমক লাগল তার। স্পষ্টত মনে হল, সুগতই সেই শিশু, অজস্র খেলনা জুগিয়ে দিয়ে যার মা কোথায় লুকিয়ে পড়েছে।

ভীষণ মায়া হচ্ছিল। পাগল আর কুকুরের সঙ্গে থাকে বেচারি। কী অদ্ভুত! এই মানুষটাই শেষ পর্যন্ত তার পথের উপর এসে দাঁড়াল! আমাদের দু'জনের পরিচয়ই পৃথিবী জানে না। একটি মাত্র গোলাপ, মাত্র একবার। একটি মাত্র গান একান্ত তাকে লক্ষ করে, তা-ও শুধু একবার। এই জন্য আসা, তারপর আদিম ভাইবোনের দুর্বোধ্য, অভিশপ্ত বিচ্ছেদ ঘটে যাবে। তাইই কি তুমি বলেছ সুগত?

চেয়ারে বসে কোলের উপর কাপড়ের থলেটা রেখেছিল মালবী। হঠাৎ উঠে দাঁড়িয়ে ঘুমন্ত সুগতর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল সে এবং বুকের ভেতরটা তার মায়াবশে শিরশির করে উঠল। মমতা আর লোভে তার ঠান্ডা হাত সুগতর কপালে গিয়ে চেপে স্পর্শ করল। জ্বরে পুড়ছে গা। জ্বরের তাড়স নেই, তবে জ্বর খুব স্বল্পও নয়। চোখ খুলে গেল সুগতর। ঠান্ডা স্পর্শে তার চোখ ছলছল করে উঠল। চেয়েই রইল বেচারি কিছুক্ষণ। তারপর উঠে বসল।

সুগতর কপাল থেকে হাত টেনে নিয়ে মালবী বলল—তোমার জ্বর!

—হ্যাঁ। সর্দিজ্বর।

—ওষুধ খেয়েছ?

—হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা নিজেই করি। তবে এই ধরনের জ্বর শরীরে দু'চারদিন পুষে রাখতে ভালো লাগে। গায়ে জ্বর, বেহুঁস হয়ে থাকলে বেশ স্বপ্ন দেখি।

—এখন দেখছিলে বুঝি!

—হ্যাঁ, দেখলাম। মা এসেছে। তারপরই চোখ খুলে গেল, দেখি আমার কপালে হাত রেখে তুমি দাঁড়িয়ে আছ।

এ কথায় মালবী কেমন বিচলিত বোধ করে এবং চেয়ারে বসে পড়ে। প্রসঙ্গ অন্য দিকে টেনে নেবার জন্য বলে—নীচে দেখলাম একটা পাগল সিঁড়ির তলায় শুয়ে মাস্টারের মতো....

—আমার বাবা। বলে হা হা করে হেসে উঠল সুগত। তার চোখের জল নড়ে উঠল। সেই বিস্ময়কর অশ্রু সহ্য হল না মালবীর। সে মুখ নামিয়ে নিল। চুপ করে বসে রইল কিছুক্ষণ।

—সিঁড়ির তলায় দরজার মুখে ওইভাবে শুয়ে আছেন কেন? সহসা প্রশ্ন করে মালবী।

—ভাবেন, মা এসে দরজার মুখটায় দাঁড়াবে। মাকে বাবা হ্যালুসিনেট করেন। স্পষ্ট দেখতে পান। চোখের সামনে রক্ত মাংসে, লাবণ্যে, হুবহু মায়ের মতো দাঁড়ায়, বাবা ডাকবা মাত্র, মিলিয়ে যায়।

—কী বলছ সুগত!

—বাবা এখন পুরোপুরি পাগল হয়ে গেছেন। একটু একটু করে বাবাকে পাগল হতে দেখেছি আমি। এই সব খেলনা, দুধের বোতল বাবাই সাজিয়ে রাখেন। মা হঠাৎ চলে গেল, এই যে খেলনা, দুধের বোতল, সব রইল, আমার জন্যে। মা যেন ছেলেকে ফেলে পাশের ঘরে গেছে, এক্ষুনি এসে পড়বে। কারণ আমি তো মাকে খুঁজব, খেতে চাইব। এই যে শিশুর চার পাশ জুড়ে এত চিহ্ন, এই দৃশ্য সহ্য করতে করতে ধীরে ধীরে বাবা পাগল হয়েছেন। আমিও শিশুই থেকে গেছি। খেলনা ছাড়া আমার ঘুম হয় না। তুমি এসেছ, তুমি আর আমি খেলনা ভাইবোন। তাই না? দাও, আমার সেই গোলাপটা!

—তুমি গাইবে!

—কেন গাইব না। তবে জ্বরের গায়ে গাইলে, মাথার ভেতরটা দপদপ করে চমকায় আর নিজের স্বর ভালো করে চেনা যায় না। সুর খাঁ খাঁ করে শূন্যের দিকে উঠে যায়, আকাশে কী যেন হাতড়ে বেড়ায়! বলতে বলতে সুগত হঠাৎ নিজের খালি গা সম্পর্কে সচেতন হয়ে ওঠে। দু' হাত আড়াআড়ি ইংরেজি 'এক্স'-এর মতো করে দু' কাঁধ আঁকড়ে ধরে। বুক ঢাকবার চেষ্টা।

সুগতর ত্বক বিশেষ সুন্দর। মাখনের মতো নরম গা, কাঁচা সোনার মতো ফর্সা। এই ত্বক মানুষের চোখে পড়বেই। বুকে গোলাপি চক্র বুকের বোঁটাকে ঘিরে। ঠিক এই রং কোথাও দেখেছে মালবী। কার শরীর যেন এই রকম। সুগতর মায়ের গায়ের রং কি এইরকম ছিল?

—এখন থাক সুগত। তুমি একবারই গাইবে, আমিও তোমাকে একবারই গোলাপ দেব। তুমি তো কারও দিকে একবারের বেশি হাত পাত না। তারপর তাকে ভুলে যাও। আমি চাইব, তুমি গাইতে চেয়েও গেয়ে উঠবে না। আমিও গোপনে গোলাপটা সঙ্গে করে

ফিরে যাব। দেওয়া হবে না।

—এই পর্যন্তই সুন্দর মালবী। নইলে পাগল হতে হয়। বলে, চৌকি ছেড়ে নেমে দড়িতে ঝোলানো গেঞ্জিটা গায়ে পরে ফেলে সুগত। তারপর বলে—আমার ধারণা, আমার মাথার ভেতরটা বাবার মতো অপরিণত এবং যাকে বলে কাঁচা। একটু পাগল ধরনের। তুমি যে বললে, 'গোপন গোলাপ', তাইতেই ভারি আনন্দ হল। বাবার আনন্দ কিসে জানো? ইসে....

থামল সুগত। উপরের দিকে মুখ তুলে দম নিল। চোখ বন্ধ করল। মাথার ভিতরে তার নিশ্চয় কিছু হচ্ছে। অসহায় স্নায়ু চমকে উঠে কাঁপছে। সে বোধহয় জলের ভিতর দিয়ে কিনারাহীন কোনও একদিকে হেঁটে যাচ্ছে। নাক অবধি জল এবং স্রোত।

—বাবার আনন্দ খেলনায়, যখন আমি খেলি। এই বলে মালবীর সামনে খেলার বিবরণ পেশ করতে থাকে সুগত।

বাবাকে চান করিয়ে চুল আঁচড়ে দেয় সুগত। খাবার বেড়ে দেয়। তারপর অন্তত আধঘণ্টা ডাইনিং-এর মেঝেয় খেলনা নিয়ে বসে যায় সে। বাবা চেয়ারে বসে ছেলেকে খেলতে দেখেন। মাঝে মাঝে হাততালি দিয়ে উৎসাহ দেন।

—তোমার মাকে মনে পড়ে না সুগত?

—না। মনে কী পড়বে। তখন তো আমার মুখে কথাই ফোটেনি, মা যখন ছেড়ে গেল আমাকে। আধো আধো বলতে পারি। খেলনা পেলে হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করি। খেলনা গড়িয়ে পড়ে। মোটরগাড়ি উল্টে যায়। ভল্লুক, খরগোশ কাত হয়ে পড়ে। তখনও পিস্তল ছুঁড়তে শিখিনি। মা বলে গেল, তুমি খেলা করো সুগত, আমি আসছি।

—তুমি তাহলে মাকে স্বপ্নে দেখতে পাও কী করে?

—পাই। কারণ কী, যে ছেলে একা খেলতে জানে, সে খেলতে খেলতে মাকে মনের মধ্যে গড়ে নিতে পারে।

—তোমার মায়ের ছবি নেই কোনও?

—না। মা সব নিয়ে গেছে। ছবি, বাবাকে লেখা প্রেমপত্র। বাবা ছিলেন মায়ের বাবার কম্পাউন্ডার। মা ডাক্তারি পড়তে পড়তে কম্পাউন্ডারের সঙ্গে ভেগে পড়ে, বিয়ে করে আড়াই বছর ঘর করে। বাচ্চা জন্মায়। বাচ্চাকে খেলনা আর দুধের বোতল ধরিয়ে দিয়ে আবার ফিরে যায়, তাকে ডেকে নিল একজন বিবাহিত ডাক্তার। সেই ডাক্তার তার নার্স-স্ত্রীকে ডিভোর্স করে দিল। মাকে বিয়ে করল। মা মন দিয়ে ডাক্তারি পড়ল। পাশ করল। বাবা একদিন আমাকে বললেন, তোমার মা ডাক্তার হয়েছেন সুগত। শিশুর ডাক্তার। কী ভালো হল বলো তো? তারপর বাবা টিটাগড়ের ওদিকে শ্রমিক এলাকায় প্রাইমারি স্কুলে চাকরি জোগাড় করলেন, সবচেয়ে অদ্ভুত, বাবা আর বিয়ে করলেন না।

—তারপর? তুমি কীভাবে মানুষ হলে?

—ভালোই মানুষ হয়েছি। এটা ঠাকুরদার বাড়ি। এখানে আমার এক বিধবা নিঃসন্তান পিসিকে জুটিয়ে আনা হল। বাবা তাঁকে বললেন, সুগতকে খেলনা দিও পদ্মমণি,

কাঁদবে না। এই বলে বাবা স্কুল চলে যেতেন। আসলে পদ্মমণি দূর সম্পর্কের পিসি, দক্ষিণের একটা স্টেশনে সবজি বেচত। তাকে বাবা জোগাড় করে এনেছিলেন।

—তারপর?

—পদ্মমণি দু-চার বছর চুপচাপ কাটিয়ে একদিন দুম করে বাবাকে বলল, এখানে আর প্রাণটা তিষ্ঠোতে চায় না দিবাকর। মাথার ভেতরটা খালি ভোঁ ভোঁ করে। তুমি বরং একটা বিয়ে করো, আমি আমার লাইনে ফিরে যাই। খেলনা নিয়ে থাকা, খালি খেলনা, ঘরে তো আর কিছু নাই। একটা মানুষ আসে না। কুটুম নাই, বান্ধব নাই। আমার তো পাঁচটা মেয়েমরদের গায়ের গন্ধ চাই, না হলে বাঁচি না যে। মানুষের নেশা আমার, পথের নেশা। ইস্টিশনের নেশা। এই বলে পদ্মমণি আর রইল না।

—তুমি তখন কত বড় হয়েছ?

—পাঠশালায় ভর্তির বয়েস হয়েছে। বাবার সঙ্গে বাবারই স্কুলে গেলাম। পাশ করলাম। হাইস্কুলে ভর্তি হয়ে বাবাকে একদিন বললাম, আমার খেলতে ভাল লাগে বাবা, তুমি ভেব না। বাবা তাঁর স্কুলে, আমি আমার স্কুলে। বাবা ফেরার আগেই আমি বাড়ি ফিরতাম। বাবা মাঝে মাঝেই আমার জন্য নতুন খেলনা আনতেন।

—তারপর?

—আর কী জানতে চাও মালবী।! পদ্মমণির নেশা মানুষে, আমার নেশা খেলনায়। আমার খেলনা-মা চলে গেছে তার খেলনা-পুরুষের সঙ্গে। শিশুর ডাক্তার। দৈনিক খবরের পৃষ্ঠায় শিশুর যত্ন বিষয়ে পরামর্শ দেয় নিয়মিত। পড়ো না? মায়ের নাম আছে।

—কি নাম তোমার মায়ের?

—বলছি। তার আগে শোনো। বাবা হঠাৎ একদিন আমাকে বললেন, আমার অসুখটা বেড়ে যাচ্ছে সুগত। মনের ডাক্তার দেখাতে হবে। পথ ভুলে যাই। নাম মনে থাকে না। মানুষের মুখ বিস্মৃত হই। শুধালাম, কাকে দেখাবে? বাবা বললেন, খুব ভালো ডাক্তার। এস কে চ্যাটার্জি।

—আমার বাবা! বলে চেয়ার ছেড়ে অদ্ভুত কাতরতায় উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে মালবী। তার মাথাটা ঘুরে ওঠে। উঠে দাঁড়িয়ে কপালে হাত চেপে ধরে চোখ বুজে আবার বসে পড়ে চেয়ারে। সে সুগতর দিকে চোখ খুলে অনেকক্ষণ চাইতে পারে না। কেবল সে এক সময় বিড়বিড় করে বলতে থাকে—তোমার গায়ের রং তোমার মায়ের মতো সুগত। সেম টু সেম। একই ত্বক, একই বর্ণ, একই উজ্জ্বলতা।

—হ্যাঁ, আমার বাবা আমার মাকে আজও হ্যালুসিনেট করে। চাক্ষুষ করে। ডাকে, এসো বাণীব্রতা ছেলেকে দেখে যাও। হি ইজ প্লেয়িং উইথ হিজ পাপেটস্ অ্যান্ড ডলস। টিটাগড়ি মেহনতি হিন্দিতে বলে, ইয়ে সব খিলৌনা হ্যায়, হ্যাথোঁসে তালিয়াঁ দেতে হ্যাঁয়, ঘণ্টী বাজাতা হ্যায়, সিটি লাগাকর ইয়ে রেলগাড়ি কঁহা কঁহা ঘুমতি ফিরতি, দেখো ডক্টর, কিস তরহা বচ্চেকো কেয়ার লেনা চাহিয়ে। বাণীব্রতা তোমার হাজব্যান্ড আমাকে বলে,

ভুলে যাও দিবাকর, যে তোমাকে ওই রকম করল, তাকে ভুলে যাওয়াই তো উচিত। এই একটি কথা তোমার বাবার মুখে সহস্রবার আমি শুনেছি মালবী। তোমার বাবা খালি বলত, ভুলে যাও দিবাকর। ধমক দিয়ে বলত, কেন পারো না। ভুলতে। কেন পারো না?

—তোমার গায়ের রং মিসেস চ্যাটার্জির মতো সুগত। তুমি তোমার মাকে দেখবে?

—না। আমরা আশা করে আছি, মা একদিন আমাদের কাছে আসবে। ভাবি, বাবা কেন হাসপাতালে এস কে চ্যাটার্জির কাছে দিনের পর দিন চিকিৎসার জন্য গেছেন? কী হত তাতে। পাগল বাবা তবু যেতেন আমাকে সঙ্গে করে। বলতেন, আমি ভাল হব সুগত। ডক্টর চ্যাটার্জি নামকরা ডাক্তার। আমার বাবার মন আমি কখনও বুঝতে পারিনি। চ্যাটার্জি তার পেশেন্টকে কী করে ধমকাত, কী পীড়ন করত, আমি ছাড়া কেউ তো জানে না। অত পীড়ন বাবা সইতেন কেন জানো?

—কেন?

—একটি কথাই ডাক্তারের কাছে জানতে চাইতেন দিবাকর মজুমদার। পীড়িত হতে হতে, ধমক খেতে খেতে শেষ পর্যন্ত ক্ষুদ্র জিজ্ঞাসা মুখ দিয়ে বার হত, বাণীব্রতা কেমন আছে। চক্ষু বিস্ফারিত, উত্তেজিত, খুনে দৃষ্টি, ঠান্ডা গলায় ডাক্তার জবাব দিত, ভালো আছে। ব্যস, বাবা খুশি হয়ে আমাকে বলতেন, তোমার মা ভালো আছে সুগত। চলো, এবার আমরা যাই। এই একটা ছোট বাক্য শোনার জন্য বাবা কী অকথ্য নির্যাতন সয়েছেন। পাগল হতে হতেও মানুষটি একটি কুশল জানবার জন্য হাসপাতাল গিয়েছেন। তুমি কি শুনছ মালবী? চোখ খোলো!

মালবী এবার মনের প্রবল চেষ্টায় চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠল। চোখ খুলে সুগতকে দেখল। এবং প্রশ্ন করল—তোমার প্রিয় খেলনার নাম কী সুগত?

—তুমি আমাকে দেবে?

—হ্যাঁ।

—তাহলে দিও।

—নাম বলো।

—বাণীব্রতা।

—মালবীর চোখ ক্ষীণ অশ্রুর ভিতরে ধক্ করে জ্বলে উঠল। অপলক চেয়ে রইল সুগতর মুখে। তারপর শীতলতম স্বরে বলল—তাই হবে। বলে দরজা পেরিয়ে সিঁড়িতে চলে এসে চুপচাপ নামতে থাকল মালবী। তলায় নেমে পাগলের পায়ের কাছে এসে দু হাত সুন্দর ভঙ্গিতে জড়ো করল এবং নমস্কার জানাল। পায়ের কাছে রেখে দিল একটি লাল গোলাপ।

মালবী ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল এবং বাইরে বার হয়ে যাওয়ার জন্য পা বাড়াল। সুগত সিঁড়ির উপর এসে দাঁড়িয়েছে, নেমেও এসেছে কয়েকটি ধাপ। হঠাৎ ধরা গলায় বলে উঠল—তোমার বাবার ওষুধ খুব কড়া ছিল মালবী। বাবা দিনের পর দিন বিশ্বাস করে

খেয়ে গিয়েছেন। বিষ না ওষুধ, আমরা বুঝতে পারিনি। চ্যাটার্জির হাতে ইঞ্জেকশন দেখলে গরিব স্কুল মাস্টার তীব্র ভয়ে চিৎকার করতেন, কী ভয় মাগো।

দরজার কাছে চলে এসে ঘুরে দাঁড়াল মালবী। সে বলে উঠল অন্য কথা, বলল—ডক্টর মিসেস বি. বি. চ্যাটার্জি হামেশা বলে, একটা মেয়ে জীবনে একবার ভুল করে। ভুল শোধরাবার রাস্তা থাকলে সেই রাস্তায় তাকে যেতে হবে। সব আগে তার কেরিয়ার। এ যার হল না, তার কিছুই হল না।

—এই দাঁতাল কেরিয়ার কিন্তু অন্যকে কাটে মালবী। বাণীব্রতা মিথ্যুক। তুমি তাকে বলো, আমরাও বেঁচে আছি। ঠিক আছে, আর একবার তাকে ভুল করতে বলো। একদিন, একবার। তুমি কথা দিলে মালবী। একবার শুধু তার সঙ্গে খেলা করব, আমরা কাউকে বলব না, সে এসেছিল। তার কেরিয়ারে একটু আঁচ লাগবে না, তার সন্তান কথা দিচ্ছে। একটি পাগল, বাণীব্রতার জন্য অপেক্ষা করছে মালবী।

—কই এসেছে, কই, বাণী, এসেছ তুমি। খোকা তুমি খেলা করো। খেলনাগুলো আনো, সাজাও। মা এসেছে, মা এসেছে খোকা। বলে বলে দিবাকর দরজার কাছে দাঁড়ানো মালবীকে পিছন দিক থেকে দেখতে থাকলেন। উঠে বসেছেন দিবাকর মজুমদার।

ভয় পেয়ে সুগত দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে নীচে নেমে আসে। বলে—বাবা এই করে ডাকতে ডাকতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। বলতে বলতে ঘরের ভিতর থেকে অনেকগুলো খেলনা নিয়ে ডাইনিং কাম ড্রয়িং-এ চলে আসে। বাবার সামনে খেলতে শুরু করে।

সুগত বলে ওঠে—মা ট্রেনে করে দার্জিলিং যাচ্ছে বাবা। দেখ, দেখ। এটা ট্রয়ট্রেন। আর এটা এয়ারবাস, এটায় করে মা আমেরিকা ঘুরে এল। মা এই কারে করে দমদমে রুগি দেখতে যাচ্ছে। দেখ, এটার ব্যাকে কাচে লাল অক্ষরে লেখা ডক্টর, ইংরেজিতে লাল অক্ষরে।

—গাড়িটাকে পার্ক করতে দাও সুগত। তোমার মাকে নামতে দাও। বলে ওঠেন দিবাকর।

—হ্যাঁ দিই। তুমি চলে যাও মালবী। আমরা এখন খেলা করব, বাবা আর আমি।

—কে ওটা? বাণীব্রতা নয়? বলে ওঠেন চরম বিস্মিত কম্পাউন্ডার এবং টিটাগড়ের টিচার। মালবী ফুঁপিয়ে ঈষৎ উচ্চকিত কেঁদে উঠে বাড়ির বাইরে ছুটে চলে যায়।

রাস্তায় নেমে মালবীর নিজেকে অত্যন্ত একা মনে হল। তার সম্বল বলতে একটি অশ্রুত গান আর একটি গোপন গোলাপ। এই দুটি দামি সামগ্রীর শুভদৃষ্টিই তার জীবন। কী রকম বোকা বোকা লাগে নিজেকে। দুটি পাগল নিভৃত গৃহে আশ্চর্য খেলনা নিয়ে খেলা করে। এই বিশাল দেশটার সঙ্গে ওই গোলাপ-গান-গৃহকোণের কোনও সম্বন্ধ নেই। অজস্র খেলনায় সেজে আছে পৃথিবী, কিন্তু ওই গৃহকোণের মতো করে তারা কেউ খেলতে জানে না।

আমি কিন্তু কথা দিয়েছি। কিন্তু কেন দিলাম? বাণীব্রতা কেবল একবারই ভুল

করে। আর তো করে না। কেন সে অন্তত একবার সুগতর কাছে যেতে চাইবে? তবু কি যায় না মানুষ কখনও? একটি ভুল দর্পণে দ্বিতীয় বার এক-নিমেষে ছায়া কি পড়ে না কখনও?—তোমাকে আমি মা বলে ডাকব মিসেস চ্যাটার্জি, যা কতকাল ডাকিনি। তুমি একবার চলো। মনে মনে বলে উঠল মালবী। মনের ভেতর থেকেই উত্তর এল—মা বলে ডাকবার জন্য হাজারটা মুখ মুখিয়ে আছে মালবী। গরিব দেশ, শুধু মা ডাকতেই ভালোবাসে।

কিন্তু এ তো মালবীর মনে জেগে ওঠা কথাই নয়, এমনটিই তো বলে বাণীব্রতা। মা ডাকে মেয়ে-ভোলানো অনেক হয়েছে এই দেশে। ঢের হয়েছে, এবার মেয়েরা নিজেদের সবখানি বুঝে নেবে।

আমি তো কিছুই বুঝলাম না। শুনে বাণীব্রতা বলল—আমিও তোমার মতো বুঝতে চাইনি। বয়েসের দোষ। এখন বুঝি....

—না থাক। আমি তো বুঝব না মিসেস চ্যাটার্জি। তুমি যা সাজিয়ে রেখে চলে এসেছ, সেখানে একবার যেতে হবে তোমাকে।

—অসম্ভব।

সারাটা দিন কোথায় কোথায় ঘুরে বেড়াল মালবী। সারাদিন বাণীব্রতার সঙ্গে কথা বলে গেল। রাত্রে ফিরে বাবার সঙ্গে দেখা। খাওয়ার টেবিলে। মালবীর আচমকা প্রশ্ন—তোমার চিকিৎসায় কতজন আজ পর্যন্ত সুস্থ হয়েছে বাবা?

—অনেক।

—কতজন অসুস্থ হয়েছে?

—তার মানে!

—তুমি দিবাকরকে চিনতে?

—কে দিবাকর?

—দিবাকর মজুমদার। বলে মুখে গ্রাস তুলতে থাকা বাণীব্রতার দিকে তেরছে চকিতে চাইল মালবী। এবং বলে উঠল—কম্পাউন্ডার।

বাণীব্রতার মুখ এবং হাত মুহূর্তে ছবির মতো থেমে গেল। বাবা এস. কে. চ্যাটার্জি স্ত্রীকে দেখে নিয়ে কড়া গলায় বললেন—আমরা কোনও কম্পাউন্ডারকে চিনি না মালবী।

—আমি চিনি। তুমিও কি চেনো না মা? বলে অনেক দিন পর বাণীব্রতাকে 'মা' ডাকল মালবী।

—মা!

—বিস্ময়ের কী আছে! তোমাকে আগে ছেলেবেলায় মা ডেকেছি মিসেস চ্যাটার্জি। হঠাৎ মনে হল, মা ডাকলে তুমি খুশিই হও। কারণ কী, তোমাকে শিশুরা মা ডাকে। তাই না?

—মা হওয়া অত সহজ নয় মালবী। অনেক মেহনত করতে হয়। আমার দিনরাতের খাটুনি তুমি জানো? তুমি আমাকে ব্যঙ্গ কর। আমি তোমার ঠাট্টার যোগ্য? হও-

না, মা হয়ে দেখাও একবার।

—সে তো খুবই সহজ মিসেস মজুমদার। কারও হাত ধরে বেরিয়ে পড়লেই তো হল! শোনো, আমি সুগতকে বিয়ে করছি।

—না। বাঘের মতো গর্জে উঠলেন এস. কে.।

—না কেন? সরল গলায় প্রশ্ন করে মালবী।

থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে খাবার টেবিল ছেড়ে এঁটো হাতে উঠে দাঁড়িয়ে বাণীব্রতা বলল—ভাইবোনে বিয়ে?

—হ্যাঁ। আমরা আদিম ভাইবোন। সুগত বলেছে। আমাদের বিয়ে সবচেয়ে খাঁটি হবে মা। কিন্তু আমার যে একটা দাদা আছে, তা তো কখনও বলনি?

—ভুল। মিথ্যা। এ হতে পারে না। বলে খাড়া হয়ে দাঁড়ালেন এস. কে.।

—কিসের মিথ্যা? কার ভুল? কেন? গলার স্বর খাদে রেখেই বলে ওঠে মালবী।

—তুমি যা জানো না, তুমি তা বোঝার চেষ্টা কোরো না। শুধু শুনে রাখো, এ বিয়ে হতে পারে না। বলে উঠলেন ডক্টর মিস্টার চ্যাটার্জি। বাণীব্রতা দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে মেঝেয় টলে পড়ে গিয়ে চৈতন্য হারালেন।

বাণীব্রতার তারপর কী যেন হয়ে গেল। কোমর যেন তার ভেঙে গেছে। আপন মনে কী যেন সে বিড়বিড় করে। হঠাৎ কোথা থেকে যেন শিশুর কান্না শুনতে পায়। বলে ওঠে—কে কাঁদে! আহ্, থামাও না বাচ্চাটাকে! তোমরা কেমন মা, বাচ্চা কাঁদলে চুপ করাতে পারো না।

এক রাতে মালবী অনুভব করে তার নীল মশারির বাইরে কে যেন চোরের মতো দাঁড়িয়ে। নীল ধূসর আলোয় বাণীব্রতার মুখটা যেন পুড়ে গেছে। মশারির মধ্যে উঠে বসে মালবী। তখনই ডুকরে ওঠে বাণীব্রতা এবং মশারি তুলে ভিতরে ঢুকে পড়ে বলে—তোমাকে একটা ইঞ্জেকশন দিতে হবে মালবী, তোমার ঘুম হচ্ছে না। আমার ভীষণ কান্না পাচ্ছে। বলে সিরিঞ্জটা মালবীকে দেখাল বাণীব্রতা। শুধাল—দেব?

হিংস্র সরীসৃপের মতো গলায় হিসহিস শব্দ করছিল আলোয় পোড়া বাণীব্রতা। তীব্র ভয়ে সিঁটিয়ে পড়ে মালবী এবং প্রাণের আতঙ্কে মশারি ঠেলে বাইরে উৎক্ষিপ্তের মুদ্রায় বেরিয়ে আসে। দ্রুত ঢুকে পড়ে অন্য একটি ঘরে। রাত তখন বারোটার বেশি। পোশাক বদলে ফেলে বাইরের পোশাকে বার হয়ে আসে মালবী। টাকা নেয় সঙ্গে। চুপচাপ চলে আসে নীচে। বাড়ির কাজের মাসিকে ডেকে তুলে দরজা খোলে। বলে—আমি চলে যাচ্ছি মীনা।

—কোথায়?

মীনাকে জবাব দেবার আগেই মালবী দেখতে পায় বাবা আর বাণীব্রতা নীচে নেমে এসেছে। দু'জনের শরীরেই রাতের গাউন। সে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারছিল না, শিশু-চিকিৎসকের হাতে সত্যিই কোনও ইঞ্জেকশন ছিল। যেন সে নীল ধূসর জিরো ওয়াটের আলোয় ভুল কিছু দেখেছে ঘুম জড়ানো চোখে। বাণীব্রতার চোখে কোনও

পাপের চিহ্ন নেই। হতে পারে ভুল, একটু আগে যা ঘটেছে, তা সত্য নয়। কিন্তু এখানে আর থাকা যায় না। বারম্বার মনে হচ্ছিল, ভুলই দেখেছে মালবী।

—আমি যাচ্ছি বাবা! মা, আমি যাচ্ছি। বলে উঠল মালবী। বলে পা বাড়াতে গিয়ে চমকে উঠল সে। তার পায়ের কাছে দু'হাত জড়ো করে প্রার্থনার ভঙ্গিতে ছুটে এসে বসে পড়েছে বাণীব্রতা। আকুল গলায় বলে উঠল—তুমি আমাকে সঙ্গে নেবে মালবী? আমি যাব। সঙ্গে নাও।

—না মিসেস চ্যাটার্জি, সে আর হয় না। কথা দিয়ে যে কথা রাখে, তার নাম বাণীব্রতা। তুমি সে নও। আমি কথা দিয়েছি বাবা, আমাকে যেতে হবে। সুগতকে ধন্যবাদ, ভাগ্যিস সে আমাকে জাগিয়ে রেখেছিল। আমি ঠিক বুঝলাম না, তোমার হাতে কী ছিল ওটা? কেন? আর কী চাও ডাক্তারের বউ? পথ ছাড়ো। যেতে দাও। বলে বাণীব্রতাকে ডিঙিয়ে আসে মালবী।

গাউনের ভিতর থেকে একটা গিফট-সেট বার করে বাণীব্রতা। সম্মুখে এগিয়ে ধরে বলে—সুগতকে দিও তবে।

—কী এটা?

—খেলনা মাগো!

কী মনে হল, সেটটা, যা দেখতে কলমসেটের মতো, সেটা হাতে করে নেয় মালবী। বাইরে এসে পাড়ার ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে ডেকে তোলে।

রাত দু'টোয় সুগতদের বাড়ি পৌঁছে যায় মালবী। কলিং বেল বাজতেই সুগত জেগে ওঠে।

—কে?

—আমি বাণীব্রতা। কথা রেখেছি সুগত। আমি এসেছি।

দরজা খুলে দেওয়া মাত্র সুগতর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রচণ্ড আবেগে মালবী। ক্ষুধার্ত হৃদয়ে সুগতর বুকে মিশে যেতে চায়। সুগতর মুখ দিয়েও বার হয়ে আসে, 'মা!'

এভাবে, যে কোনও নারীই হতে পারে বাণীব্রতা, আজও। সে অবিশ্বাস্য রক্তমাংসে পুরুষের নির্মল আকাঙ্ক্ষায় মিশে যায় রাত্রির গভীরে।

মালবী সুগতকে বলল—আমার চেয়ে ভালো খেলনা তুমি পাবে না সুগত। আমি কখনও দোকানে বিকোই না।

ওরা দেড়তলায় উঠে আসে। আলো জ্বেলে দেয়। কলম সেটটা বার করে সুগতর সামনে রাখে মালবী।

—কী এটা?

—তোমার মা দিয়েছে তোমাকে। খেলনা।

সুগত আশ্চর্য হয়ে সেটা খুলে ফেলে। ভিতর থেকে বার হয়ে আসে একটি খেলনা সিরিঞ্জ, সেটা হাতে করে ডক্টর মিসেস বি. বি. চ্যাটার্জি জিরো ওয়াটের নীল ধূসর আলোয় মালবীকে ইঞ্জেকশন করার একটি চমৎকার খেলা খেলেছে দু'ঘণ্টা আগে। সেটি

হাতে করে খুব মনোযোগের সঙ্গে নাড়াচাড়া করছিল সুগত।

মালবী সহসা বলল—ওটা তুমি কী করবে? কী খেলবে? কার সঙ্গে? তোমার সবচেয়ে খারাপ খেলনাটির নাম কী সুগত?

সুগত চমকে উঠে জবাব দিল—খেলনা সিরিঞ্জ। বাবা ভয় পাবে মালবী।

ভয়ে সুগতর মুখ শুকিয়ে গিয়েছে। সেই মুখের দিকে চেয়ে মালবী সুগতকে বুকের ভিতরে টেনে নিয়ে—ভয় কিসের সুগত! বলে উঠল। সুগতর চোখ দু'টি নিঃশব্দে ভিজে উঠল।

রক্ত সরস্বতী

ড্রেসিং টেবিলের মস্ত আয়নাটায় নববধূর ছায়া পড়েছে। সালঙ্কারা রোকেয়া নিজেরই ছায়ার দিকে চেয়ে আছে। বেনারসি শাড়ির ঘোমটা কাঁধের উপর খসে পড়েছে। তার ভীষণ কান্না পাচ্ছে।

গলায়, কানে, হাতে সোনার জিনিসগুলো ঝলমল করছে। নাকে কোনও অলঙ্কার নেই। কারণ রোকেয়ার নাক কখনও ফোঁড়ানো হয়নি। রোকেয়া নাক ফুঁড়িয়ে অর্থাৎ নাকের পাতায় ছ্যাঁদা করে নাকছাবি পরার কথা ভাবতে পারে না। সে জানে তার নাসিকার গড়ন অত্যন্ত সুন্দর।

বিয়ের দিন ধার্য হওয়ার পর অনেকে নাকে ছিদ্র করতে বলেছে। মা পর্যন্ত চাপ দিয়েছে। রোকেয়া কিছুতেই রাজি হয়নি। বলেছে—কান দুটো করেছ-করেছ, নাকটা আস্ত রাখো মা। আমার ভাললাগে না। কেমন বোকা বোকা লাগে।

—কে বলেছে বোকা বোকা লাগে! হিরের একটা নাকছাবি যদি পরা যায়। সারা মুখটা আলো হয়ে থাকে। যৌতুকের তালিকায় হিরের নাকছাবির ডিমান্ড করেছে ওরা। সবই যখন খতিয়ে খতিয়ে নিচ্ছে, যদি দেখে নাকে তোর ফুটোই নেই, তাহলে কী ভাববে বল তো!

—যাইই ভাবুক, আমি কিন্তু পারব না মা। এই ব্যাপারে তুমি আর জিদ করবে না বলে দিচ্ছি। কোনও জিনিসেরই জেদাজেদি ভালো নয়।

—যৌতুকের ব্যাপার। দিতেই তো হবে। কিন্তু কোথা থেকে দিই, হাত তো খালি হয়ে গেল।

—না, দেবে না। পাবে কোথায় যে দেবে। সবই তো দিলে।

—তোর এক ভাসুর পাকা দেখার দিন বলে গেছে, মেয়ের নাকে ফুটো নেই কেন, একটা ফুটো করে দেবেন। তারপর যৌতুকের লিস্টিতে হিরের নাকছাবির ডিমান্ড করেছে।

মায়ের বলা কথাগুলো মনে পড়ামাত্র রোকেয়ার ভেতরে এক ধরনের অসহায় ঘৃণা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছিল। চোখে জল এসে পড়ছিল। তার কেবলই মনে হচ্ছিল, শরীরটা তো আমার, এই সুন্দর নাকটা কি আমার নয়? ফুটো করার হুকুম অন্যে দেবে কেন? কথাটা যখন ওইভাবে দাবি হিসেবে ওঠে এবং আসল লক্ষ্য হিরে, তখন কী কুৎসিত লাগে!

রোকেয়ার এই মুহূর্তে মনে হচ্ছিল, সৈয়দ আব্দুল মান্নান নামে যে লোকটা তার বর হয়েছে, সে না জানি কী! এখনই ঘরের মধ্যে এসে পড়বে, বাইরে সবকিছু শান্ত হয়ে

এসেছে। বউভাতের লোকজন বিদেয় হয়ে গেছে, রাতও হয়েছে। এভাবে সেজেগুজে সে কি স্বামীর অপেক্ষা করছে। মনে হচ্ছে, মানুষটা তার সঙ্গে দেহমিলনের জন্য ছটফট করছে, অত্যন্ত কামার্ত চোরা চাউনি দিচ্ছিল বারবার।

লোকটা ঢুকল। রোকেয়ার মনে হল, এত যারা যৌতুক নেয়, তাদের খুব একটা সম্ভ্রম করার দরকার নেই। এই খাট, ওই ড্রেসিং টেবিল, বিছানার চাদর, বালিশ, ওই আলমারি, এই তোশক—সবই দিয়েছে মা। এই বিছানায় সহবাস করতে একটুও কি ভাললাগবে! মনে কি হবে না কেন এই সব এবং কেমন করে এই সব ঘটে? পুরুষের সঙ্গে যৌনমিলন কি এতই আক্রা?

লোকটা ঢুকেছে বলে মাথার ঘোমটা টেনে দেয় রোকেয়া এবং ভাবে, না টানলেও চলত। মানুষটা মাঝারি উচ্চতার একহারা গড়ন, শ্যামলাই বলা যায়। ছোট এবং চাপা নাক, চোখ দুটো ক্ষুদ্রাকার। তুলনায় চোয়াল ভারী, কপাল বড়। মাথার চুল পাতলা। জেবুন্নিসা উচ্চবিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক। চল্লিশ ছুঁই ছুঁই বয়েস। কণ্ঠস্বর মিহি। ওই গলায় স্কুলশাসন করে কী করে কে জানে!

এই লোক এতদিন নারীসংসর্গ করেনি। তিনবার এম. এ. পাশ করেছে। খুবই নাকি বিদ্যোৎসাহী এবং শিক্ষাব্রতী। কী একটা শিক্ষক সংগঠনের জেলা সেক্রেটারি। দেখে মানুষটাকে স্বভাবগম্ভীর স্বল্পভাষী বলে মনে হয়।

মান্নান বলেন—ঝামেলা কি একটা! এত কাজ, আরামে বিয়েটাও করা যায় না। বউভাতের আসরেও ছাত্র-প্রমোশনের আব্দার! ছিঃ! ঘেন্না ধরে গেল! যাক গে। তোমাকে একা বসে থাকতে হল। আমি খুবই দুঃখিত রোকেয়া। বলে বউয়ের মাথার ঘোমটা ফেলে দেয় মান্নান। এবং বলে ওঠে—তোমার নাক খালি কেন! পরোনি?

—কী?

—হিরের নাকছাবি! না, না। এমন তো কথা ছিল না।

কথাটা বেশ অসহিষ্ণুর মতো বলে ওঠে মান্নান। রোকেয়া ঈষৎ চমকে উঠে স্বামীর মুখের দিকে অবাক হয়ে এক ঝলক দেখে মুখ নামিয়ে বলে—আমার এক হবু ভাসুর নাকে ফুটো করতে বলেছিলেন বটে, কিন্তু কিছুতেই ইচ্ছে করল না।

—এটা তো ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপার নয় রোকেয়া এটা যে দস্তুর!

—মানে!

—মানে আর কি! সুন্দর নাকে নাকছাবি থাকবে না, ছিদ্র থাকবে না, এটা নিয়ম নয়। তোমাকে মানাচ্ছে না রোকেয়া। আমি চাই তোমার নাকে ফুটো হোক, হিরের জিনিস আসুক। লোকে কী বলছে, শুনেছ?

—না।

—নাকে ফুটোই নেই, থাকলে তো পরবে!

—ঠিকই বলেছে।

—আরে বাবা, তা তো নয়। এটা ঠাট্টা। তোমার গায়ে লাগল না!

—না, আমি কিছু শুনিনি। শুনলেও বুঝতে পারিনি।

—বুঝতে পারোনি। প্রকাশ্যে সবাই বলাবলি করছিল। আমি লজ্জিতভাবে বলেছি, বাপমায়ের একমাত্র আদুরে সন্তান, তা-ও মেয়ে, ছেলেমানুষ, নাক ফোঁড়াতে ভীষণ ভয়। তবে হ্যাঁ, ছেঁদা একটা দরকার পরে করে নেওয়া যাবে। নাকছাবি রয়েছে, ছিদ্র হলে পর দেখতে পাবেন। আনা-নেওয়া হবে তো! পরে সবই হবে। একটা ছিদ্র বইতো নয়! যন্ত্রণা একটু হয়ই। আপনার মা-মাসি, আপনারা মাসি-পিসি, সাহস দিয়ে বোঝান মেয়েকে।

—না।

—না মানে! তুমি তখন থেকে খালি না না করছ। কেন?

—আমি নাক ফোঁড়াতে পারব না মাস্টারমশাই।

—কেন?

—অনেক যন্ত্রণা হবে।

—আমি সবাইকে তাহলে ঠিকই বলেছি। কনে ভয় পাচ্ছে বলে করেনি। তবে যন্ত্রণা বেশি নয়। ওটা অমূলক ভয় বোকেয়া।

রোকেরা এবার চুপচাপ কিছুক্ষণ মাথা নিচু করেই বসে রইল। মান্নান আচমকা বউকে বুকের দিকে টানে। বউ নিজেকে আলতো করে ছাড়িয়ে নেয়। এবং কোনও কথা না বলে শরীরের সমস্ত অলঙ্কার খুলে ফেলতে থাকে। শাড়িও খুলে ফেলে। বদলে অন্য একখানি হালকা সাদা ফুলছাপ শাড়ি এবং সাদা ব্লাউজ পরে নেয়। তার হাত খালি, গলা খালি, কান খালি। যখন তার কোথাও অলঙ্কারের চিহ্ন নেই, তখন আয়নায় নিজেকে দেখে রোকেয়া। এই আমিই আসল। নিজেকে পছন্দ করার ভঙ্গিতে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে সে এবং বলে, আমি এই রকমই নিরাভরণ সুন্দর থাকতে চেয়েছিলাম। এই আমাকে দেখে কবীর বলত, তুমি আমার সরস্বতী, তোমাকে ফুলের অলঙ্কার ছাড়া কিছুই মানায় না।

—কে বলত?

—কবীর।

—একসঙ্গে পড়তে তোমরা?

—হ্যাঁ।

—ইউনিভারসিটিতে!

—হ্যাঁ।

—শুনেছি!

রোকেয়া এবার হিহি করে অদ্ভুত হেসে উঠে বলে—তা-ও শুনেছেন? সব শুনেও....

—না, সব শুনিনি। শুনেছি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছেলের সঙ্গে....পরে শুনলাম, ছেলেটা বন্ধু, অন্য কিছু নয়। সবাই বলল, বন্ধু হতেই পারে। তার বেশি না হলেই হল!

যাক গে!

—এই পোশাকটাই প্রিয় ছিল কবীরের। ও বলেছিল, যেদিন তুমি মাথায় সিঁদুর পরবে, সেদিন তোমার নাম দেব রাঙা সরস্বতী। ও ছিল ভীষণ রোমান্টিক। আচ্ছা, এই অঞ্চলে তো সিঁথিতে সিঁদুর চলে? চলে না?

—না। কপালে টিপ দিতে পার। সিঁথিতে দেবে না। আমরা অভিজাত মুসলিম। সিঁথি রাঙানো সহবত নেই। ধর্মেও নেই। রাঢ়ের এ দিকটার ওইসব আচার নিম্নবর্গে দেখা যায়। কবীর কোথাকার ছেলে?

—রাঢ়ের ছেলে কিনা জানি না। নয় বোধহয়। তবে নিম্নবর্গের নিশ্চয়। আমি অবশ্য কখনও ওর দারিদ্র সম্পর্কে জানতে চাইনি। ও সরস্বতীর উপমা দিলে বাধা দিইনি। রাঙা সরস্বতী শুনে মনটা কেমন ভরে গিয়েছিল। আচ্ছা, আপনি আমাকে একটু পরিয়ে দেবেন?

—কী?

—সিঁদুর! বলে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে টান দেন রোকেয়া। একটা ক্ষুদ্র লাল কৌটো বার করে মুখটা খোলে। তারপর সম্মুখে খুব কাছে এগিয়ে আসে।

মান্নান বলে—রাঢ়ের মেয়েরা পলাটলা পরে, শাঁখা নেয়। লোহা তো নেয়ই। এইসব নারী আচার মাস্টারমশাই। হিন্দু-মুসলমান কথা নয়। সিঁথিটা কেমন আমার মরা, বাসি-বাসি লাগছে। পরিয়ে দিন। দিন না!

—না রোকয়া।

—কেন?

—অভিজাত ঘরে সত্যিই এই সব চলে না। তুমি ওই সব রেখে নগ্ন হও এবং মনে রাখবে হিরের নাকছাবি আমার চাই। নাকের ছিদ্র আমার চাই। খোলো, কাপড় খুলে ফেল।

—আপনি তাহলে পরাবেন না?

—না। তুমি অযথা নাটক করছ কেন? আচ্ছা, কবীরের পদবি কী?

—সিকদার। ওহো বুঝেছি। কিন্তু আমি বলব না, ওর কী জাত! তবে শুনে রাখুন, মুসলমানও সরস্বতী বোঝে এবং এই দেবীকে সৌন্দর্যের আর বিদ্যার প্রতীক মনে করে। আমি তো স্কুলের দেবীপূজায় প্রণাম করতাম। কই কিচ্ছু হয়নি আমার, বিদ্যা আমার ভালোই হয়েছে। আমি অবশ্য নামাজ জানি। দিন, পরিয়ে দিন।

—তুমি আমাকে অপমান করছ রোকেয়া।

—তাই বুঝি? দেখুন মাস্টারমশাই, নাকে ফুটো করার যন্ত্রণা অনেক। আপনি কাউকে বাধ্য করতে পারেন না।

—অমূলক ভয় পাচ্ছ।

—না। আমি পারব না। আপনি হিরে পাবেন না। আমি সিঁদুর পরবই। দিন, পরিয়ে দিন।

রোকেয়ার এই ধরনের অদ্ভুত আব্দারে মান্নান মনে মনে তেতে ওঠে। মেয়েটা সঙ্গে করে সিঁদুর কৌটো এনেছে। পলা-শাঁখাও ওই ড্রয়ারে থাকতে পারে। ঢাকনা খোলা কৌটোটা আঙুলে ধরে প্রার্থনার ভঙ্গিতে সামনে এগিয়ে ধরেছে এবং কনেটি ইংলিশ খাটের উপর বাঁ হাতটা ছড়িয়ে মেঝেতে উবু হয়ে বসেছে।

—কৌটোর মুখ বন্ধ করে দাও। চোখের সামনে আদিখ্যেতা করো না।

—দেবেন না?

—না। এই বাড়িতে ওই সব চলবে না।

—ঠিক আছে, তাহলে আমি নিজে নিজেই পরব। বলে আয়নার দিকে ঘুরে সিঁথিতে সিঁদুর চড়িয়ে দেয় রোকেয়া। এত আচমকা ঘটনাটা ঘটায় যে, বিহ্বল মান্নানের বাক্যস্ফূর্তি হয় না।

—খুব জেদ ! গলার খাদে অল্পক্ষণ পরে বলে ওঠে মান্নান।

—বটে তো! বলে আয়নায় নিজেকে সুন্দর করে দেখে রোকেয়া। বারবার দেখে।

আরও কিছুটা সময় চুপ করে থেকে হঠাৎ মান্নান মন্তব্য করে—মেয়েরা সাদা পোশাক পরলে মুর্দা-মুর্দা লাগে।

—মুর্দা?

—মড়া যাকে বলে তাই। এই লব্‌জ তোমার শোনা নেই? লাল পরলে জিন্দা, সাদা পরলে মুর্দা। ওই পোশাকে আমি তোমার সঙ্গে 'সেক্স' করতে পারব না। তুমি নিজে হাতে খুলে ফেলে দাও, আমাকে ছুঁতে বলো না।

—কবীর আর আপনি কত আলাদা! শিশিরভেজা টগরফুল দেখলে ও ভীষণ খুশি হত। শ্বেতপদ্ম ভালোবাসত। রজনীগন্ধা উপহার দিত। শ্বেতকরবী আনত। সব ওর সাদা। ও বলত প্রিয় নারীর মধ্যে একটুখানি দেবীভাব থাকবে, প্রেম আর পূজা একসঙ্গে হবে।

—তাই নাকি! তুমি তা হলে দেবী! তাহলে তুমি এই ফ্যামিলিতে এলে কেন?

আয়না থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে কৌটোটা ড্রয়ারে রেখে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে রোকেয়া বলল—আমি ইচ্ছে করে আসিনি, আমাকে জোর করে এখানে পাঠানো হয়েছে।

—এই বাড়িতে দেবীকে কিন্তু ঝিয়ের কাজও করতে হবে রোকেয়া। নাক ফোঁড়াতে হবে। মায়ের কাছে গিয়ে হিরে চেয়ে আনবে। সাদা বলতে হিরে, আমি আর অন্য কিছু বুঝি না, নাও, নগ্ন হও।

কথায় দাঁড়ি দিয়ে স্বামীটা স্ত্রীর দিকে কটমট করে চাইল। স্ত্রী কিন্তু নিজেকে এখনও স্ত্রী বলে ভাবতে পারছিল না। বরং সে ভাবছিল, কোনওভাবে রাতটা এখানে কাটিয়ে ভোরবেলা পালাবে।

—কবীর বলেছিল.....

—কী বলেছিল?

—না, কবীরকে আমি কথা দিয়েছি....

—কী কথা?

দেওয়ালের কাছে সরে গেল রোকেয়া। দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে হেলান দিল। তারপর দুহাতে মুখ ঢেকে ফেলে ফুঁপিয়ে উঠে বলল—আপনাকে বলা যায় না!

—যায় না যখন, বারবার তা হলে কবীরের কথা তুলছ কেন?

—ভেবেছিলাম আপনি বুঝবেন, আপনি ট্রিপল এম এ।

—আমি হেডমাস্টার। মাথা। আমি অন্যের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য করতে পারি না। কবীরের কথা মুখে করবে না আর। সিঁদুর মুছে ফেলো। এবং আমি বেশি কথা পছন্দ করি না। আমার সামনে সাদাপোশাক পরবে না কখনও। শুনছ, নাকি?

—কাঁদছে! হায়, কাঁদছে! বলে মুখের উপর থেকে হাত সরায় রোকেয়া।

—কে কাঁদছে?

—শুনতে পাচ্ছেন না! একটা কুকুর কাঁদছে।

—ও কিছু নয়।

—কিছু নয়! ভারী আশ্চর্য হল রোকেয়া। অবাক গলায় শুধালো—কুকুর কাঁদলে আপনারা কিছু মনে করেন না?

—না।

—এভাবে কাঁদছে কেন? ওকে একটু দেখুন।

—আরে আশ্চর্য তো! কুকুর কাঁদবে না! খাবার নিয়ে মারামারি করে ছেঁচা খেয়েছে, ঘা দগ্ধালে কাঁদবে বইকি। সারারাত কাঁদবে। ওই কান্নার মধ্যেই আমাদের কাজ সারতে হবে।

আধ মিনিট চুপ করে থেকে রোকেয়া প্রার্থনার সুরে বলল—ওর কান্নাটা আপনি থামিয়ে দিন, প্লিজ্।

—হবে না।

—আমারও ঘুম হবে না। ইস্ কী কান্না! এত করুণ করে কাঁদে! ওর কষ্ট হচ্ছে মাস্টার মশাই। আপনি দেখুন।

—না। কঠোর গলায় বলে উঠল মান্নান।

দেয়াল ছেড়ে জানালার কাছে এল রোকেয়া।

—খবরদার খুলবে না।

—এখানেই আছে মনে হচ্ছে।

—থাক।

—আপনি কী নিষ্ঠুর! একবার দেখতেও দেবেন না।

—না।

—আবার দেয়ালের কাছে ফিরে এল রোকেয়া। একটা পা ভেঙে দেয়ালের পিছনে ঠেকিয়ে এক পায়ে খাড়া হয়ে রইল। কুকুরটা ডুকরে ডুকরে কাঁদছে।

হঠাৎ দুম করে রোকেয়া বলল—কবীর কুকুর ভালোবাসত। রাস্তার কুকুরকে খেতে দিত। পকেটে করে খাবার নিয়ে ফিরত।

—এখন সে নিজেই কুকুর হয়ে কাঁদতে বসেছে।

—মাস্টারমশাই!

—হ্যাঁ রোকেয়া ঠিকই বলছি আমি। কুকুর কাঁদবে, আমাদেরও কাজ, মানে সেক্স করে যেতে হবে। এটাই নিয়ম। এসো, আমার আর ধৈর্য নেই। বলে মান্নান নিজের জামাকাপড় খুলতে শুরু করে।

—আমি পারব না। অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে বলে ওঠে রোকেয়া। এবং দুহাতে মুখ ঢাকে।

—নচ্ছার মেয়ে! নখরামি করো না। ফল ভালো হবে না। আগে জানলে....

—আপনি সব জানতেন। মুখের উপর থেকে হাত সরিয়ে বলে ওঠে রোকেয়া।

—কী জানতাম! আরে, একটা হিন্দু ছেলের সঙ্গে মাখামাখি আছে—এ আমি জানব কী করে!

—জানলে কী করতেন?

—করতাম না।

—এখন তো জানলেন। শুনুন, আমি কবীরকে কথা দিয়েছি, ফুটো করে নাকের সৌন্দর্য নষ্ট করতে পারব না। ও শুধু একটি কথাই বলত, নাকটা ছ্যাঁদা কোরো না সরস্বতী।

—তা আর হয় না!

—কেন হয় না।

—আরে এখানে দেবী টেবী চলে না। এটা ধার্মিক মুসলমানের ঘর। আচ্ছা, ওই সিকদার তোমাকে ছুঁয়েছে?

—এই নাকটার উপর আলতো করে চাপ দিত আঙুলগুলোর, ভীষণ ভালো লাগত আমার।

—আর?

—আর কিছু নয়।

—এ কথা স্বামীকে বলতে নেই।

—সব কথা স্বামীকে বলতে বলেছে কবীর। আহ্ কাঁদছে গো বেচারি।

—হ্যাঁ, সিকদার কাঁদছে বটে। বলে হাহা করে হেসে ওঠে স্বামী। এবং খাট ছেড়ে লাফিয়ে নেমে আসে।

রোকেয়া এবার ভয় পেয়ে ওঠে। ঊর্ধ্বাঙ্গে ভোঁদড়ের মতো উলঙ্গ হয়ে গেছে লোকটা। পরনের প্যান্ট খুলব খুলব করছে।

রোকেয়ার সহসা মনে হল, কুকুরটা মানুষের মতো করেই কাঁদছে। গলায় কুঁইকুঁই করাটা ডুকরানো ছাড়া কিছু নয়। তারপর টানা আর্তনাদ খাড়া করে তুলছে আকাশে।

মহাকাশ ভেদ করে চলে যাচ্ছে আহত প্রাণের হাহাকার। এ কিছুতেই সহ্য করা যায় না। কবীর হলে এই অবস্থায় কিছুতেই উলঙ্গ হতে পারত না।

—সহবাসেরও একটা পবিত্র চেহারা আছে মাস্টারমশাই। বোধ করি আছে।

—কবীর বলেছে?

—না, কেউ বলেনি। আমিই বলছি। কুকুরটাকে খেতে দিলে থামবে না?

—না। ওর ঘা থেঁতলে গেছে।

—ওষুধ দেব। আপনি দরজা খুলুন। আমি দেখতে চাই জীবটাকে।

—বাজে কথা রাখো রোকেয়া। ওকে কাঁদতে দাও।

—না!

—আবার না!

দেয়ালের সঙ্গে স্ত্রীকে দুহাতে চেপে ধরল মান্নান। স্ত্রীর নরম গলায় কামড় দিল আচমকা, দাঁত খেঁকিয়ে বলল—আর কোনও না বলবে না, তা হলে মারব। খ্যা-খ্যা-খ্যা-খ্যা।

—শুনুন, সত্যিই বলছি আমি পারব না। আমার ভয় করছে। আমাকে একবার অন্তত জীবটাকে দেখতে দিন।

শাড়ি টান মেরে খুলে দিল স্বামী। জামা টান মেরে ছিঁড়ে ফেলে দিল। ব্রা পর্যন্ত টানের চোটে গা থেকে খসিয়ে দিল। তারপর বলল—পাশের ঘরে চলো। ওখানে কান্না পৌঁছবে না। চলো। বলে বুক দিয়ে ঠেলতে ঠেলতে পাশের ঘরে রোকেয়াকে এনে ফেলে মান্নান।

ঘরটা অপরিচ্ছন্ন। ভ্যাপসা গন্ধ। ঘরে একটা মিটমিটে বালবের আলো জ্বলছে, পাখা নেই। একটা চৌকিতে মাদুর পাতা। মনে হল, বাড়ির কাজের লোকেরা ব্যবহার করে। ঘটনা ঘটল উলটো। কুকুরটা এবার ঘরের দরজার ওপাশে উঠে এসে কাতরাতে লাগল। তার মানে, স্বামী তাকে আরও তীব্র কান্নার কাছে ঠেলে এনেছে। কুকুরটা দরজার কাঠ আঁচড়াচ্ছে টের পাওয়া যায়।

—হিরে আমার চাই। বলে গাঢ় গলায় লোকটা রোকেয়ার কান চেটে দেয়।

রোকেয়া নিরাকুল বেদনায় বলে ওঠে ভেজাস্বরে—না।

—আমার ছিদ্র চাই।

—না।

—আবার!

—আমাকে আমার মায়ের দেওয়া খাটে নিয়ে চলুন মাস্টারমশাই। আমার ভয় করছে। মা! আমাকে বাঁচাও মা! বলে ফেটে কেঁদে উঠল নববধূ।

বউয়ের এই ধরনের বেখাপ্পা কান্নায় স্বামী কী মনে করে বলে ওঠে, 'ও আচ্ছা!' বলে শাশুড়ির খাটে টেনে আনে তাকে। ধাক্কা দিয়ে উলঙ্গ স্ত্রীকে ফেলে দেয় এবং বলে, কালই সকালে বাড়ির মেয়েরা তোমার নাক ফুঁড়িয়ে দেবে। অষ্টমঙ্গলায় আমার হিরে চাই

রোকেয়া! আমার ইজ্জতের কথা তোমাকে সবার আগে ভাবতে হবে।

—মা আপনাকে অনেক দিয়েছে মাস্টারমশাই! বলে উপুড় থেকে কাত হয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে বলে ওঠে রোকেয়া। এবং বলে, আমাদের আর নেই। তাছাড়া, আবার বলছি, কিছুতেই আমি পারব না।

—তাহলে এখনই হবে, এই মুহূর্তে ব্যবস্থা করতে হয়। শোনো দেবী, আমি সাম্প্রদায়িক নই, কিন্তু আমিও আবার বলছি, কবীরের কথা তুলবে না, আমি প্রতিদ্বন্দ্বিতা একদম সহ্য করতে পারি না। আমি ট্রিপল এম এ। এই দিগরে একমাত্র ট্রিপল। স্কুল আমাকে পায়ে সেধে চাকরি দিয়েছে। কমিটি আমায় হাতে ধরে হেডমাস্টার করেছে। তোমার ছোটমামা আমার কাছে এসে অনুরোধ করাতে, তেনার ভগ্নীকে উদ্ধার করেছি। অতএব নাকছাবি পরতে এবং মায়ের কাছ থেকে হিরে আনতে তুমি বাধ্য। বলে স্ত্রীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল হেডমাস্টার। নিষ্ঠুরের মতো ছিন্নভিন্ন করবে ভাবল। কিন্তু রোকেয়ার দেহ শক্ত হয়ে গেল। স্ত্রীর দিক থেকে কোনও সাড়া না পেয়ে কানে একটা ঠাস করে চড় বসাল মাস্টারমশাই।

চড় খেয়ে পাগলের মতো হিহি করে হেসে উঠল রোকেয়া। দু' হাঁটু শক্ত করে জুড়ে রাখল। কিছুতেই নিজেকে খুলতে চাইল না।

—এ অন্যায় রোকেয়া। তুমি মুসলমানের বিবি। এই অবস্থায় আসমানের ফিরিস্তা পর্যন্ত অসন্তুষ্ট হচ্ছে। তারা অশ্রুপাত করছে। নিজেকে গুটিয়ে রেখো না প্লিজ! বলে রোকেয়ার গায়ে মান্নান নরম করে হাত দেবার চেষ্টা করে।

রোকেয়া ফের দমভর হেসে ফেলে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে,—দরজায় আঁচড়াচ্ছে স্যার! কাঁদছে।

—কে?

—ফিরিস্তা। ওই ফিরিস্তাকে টালিগঞ্জ মেট্রো রেলে লাইনের মধ্যে ধরতে গিয়েছিল কবীর। আমি ওকে বলেছিলাম, আকাশে একটি জহুরা নামে নক্ষত্র আছে। ও, জানত না।

—তো? অ্যাই শোনো, কুকুরের সঙ্গে ফিরিস্তার তুলনা করবে না।

—আমি নক্ষত্রের কথা বলছি মাস্টারমশাই। ওটা আসলে রূপাজীবা। কবীর বেশ্যাকে রূপাজীবা বলত সম্মান করে।

—কুকুর আসলে অপবিত্র জীব।

—মোটেও না।

—চোপ!

—না, ট্রিপল এম.এ.। ধমক দিলে তুমি আমাকে কখনও পাবে না! তোমার ধর্মে যৌতুক হারাম। আসমানের ফিরিস্তা তোমার দুর্গতি দেখে লজ্জায় মরে যাচ্ছে। কবীর তোমার মতো কাপুরুষ ছিল না। তাকে আমিই জহুরা নক্ষত্র চিনিয়েছিলাম। বলেছিলাম ওই নক্ষত্রটা আরব মরুভূমির আকাশে প্রথম উঠেছিল।

—জানি।

—মরুভূমির পথে একটা কুকুর তৃষ্ণায় কেতরে পড়ে মরে যাচ্ছিল। তাকে দেখতে পেয়েছিল জহুরা।

—রূপজীবা কথাটা ভারি সুন্দর। আমার ঠিক মনে ছিল না।

—না স্যার। ওটা আপনার জন নয়। ওই শব্দটা স্পেশাল।

—আর ন্যাকামি কোরো না রোকেয়া।

—আপনার লাগল মাস্টারমশাই!

—তোমাকে আমি খুন করে ফেলব। কাজের সময় গল্প শোনাতে বসেছে। এই রাতটা অ্যারাবিয়ান নাইট নয় শাহারজাদি। গল্পে তুমি পার পাবে না।

—হ্যাঁ বাদশা। কাল সকালে আমার দণ্ড হবে। তার আগে গল্পটা আপনাকে শুনতে হবে যে। আমি পোশাকটা পরে নিই। কেমন?

—নাহ।

—গল্প করলে শরীর জাগবে আমার, প্লিজ। শান্ত হও। পায়ে পড়ি, অমন কোরো না! বলে খাটে উঠে বসে দুহাতে মুখ ঢেকে আবার ফুঁপিয়ে উঠল রোকেয়া।

—তুমি কী করে জানলে তোমার শরীর জাগবে! আগে এমন হয়েছে বুঝি! বলে দুটি চোখ বিস্ফারিত করে রূপসী স্ত্রী নগ্ন অপূর্বাকে দেখতে থাকে স্বামী।

কান্না এ কথায় কাঠ হয়ে থেমে যায় রোকেয়ার। দু' দণ্ড সে দু হাতে মুখ ঢেকেই বসে থাকে। তারপর চকিতে দু' হাত সরিয়ে দগদগে দৃষ্টিতে স্বামীকে মেপে নিয়ে বলে—তুমি তখন ব্যবস্থা করবে বললে, কী ব্যবস্থা তোমার?

—বড় ছুঁচ আছে তাকে, আমিই ব্যবস্থা করতে পারি, এখনই। চাও নাকি? বলে সুঘ্রাণমদির পুষ্পিত স্ত্রীবক্ষে লোভার্ত চোখে চেয়ে থাকে ট্রিপল এম এ.।

—তাইই করো মাস্টারমশাই! বলে কাতর প্রার্থনাই যেন করে বউ।

—মশাই নয়, সাহেব বলো, সাহেব। বলে চোখে নেশা ধরায়, বাদশা!

—আমি অসতী স্ত্রীলোক! কী ভাবছ তুমি? তো জহুরা রূপাজীবা। কী করল! সে দেখল কুকুরটা বাঁচবে না। এখনই ব্যবস্থা দরকার! সে একটা কূপের কাছে ছুটে গেল। জল আছে বটে, কিন্তু নিতান্ত নীচে। তখন সে আমার মতো নগ্ন হয়ে শাড়ির দড়ি পাকিয়ে পায়ের পাদুকা সেই শাড়ির দড়িতে বেঁধে নীচে নামিয়ে দিল। জুতোয় করে জল তুলে এনে কুকুরটাকে খাওয়াল। বেঁচে গেল কুকুরটা। সেই কুকুরটাই কাঁদছে নেকবান। আমাকে দেখতে দাও।

—না। গ্রামের সঙ্গে কুকুরটার ওই কান্নার চিরসম্বন্ধ খুকি! তোমার নাক আমি সত্যিই ফোঁড়াব সতী।

—আরবি লব্‌জে কথা বলুন মাস্টার সাহেব। সতী-অসতী বলা কেন। আমি নেক আউরত। কবীর আমাকে সতী ডাকলে খুশি হতাম। ও ডাকত রাঙা সরস্বতী। ও দেখল কুকুরের একটা বাচ্চা পাতালের রেলপাতের কারেন্টের মধ্যে চলে যাচ্ছে। কবীর

ভেবেছিল অতি সন্তর্পণে কুকুরটাকে বাঁচাতে পারবে। তার পা কি পিছলে গিয়েছিল, সে কি বোঝেনি কোথায় মৃত্যু ঘাপটি মেরে বইছে? যখন সে কুকুরটাকে স্পর্শ করতে পারল তখন কি বাচ্চাটার ইলেকট্রোকিউশন হয়ে গেছে! ফলে কবীরও জ্বলে গেল। হায় খুদা! কেন আমি তাকে অমন করে জহুরা নক্ষত্রের কথা বলতাম। জানি, ও ভীষণ কুকুর ভালোবাসত। আকাশে নক্ষত্র খোঁজে যে-মানুষ তাকে তোমরা চেনো না, আমি কুকুরটাকে খালি একটু জল দেব মাস্টার সাহেব।

বলতে বলতে খাট ছেড়ে নেমে মেঝেয় পাশের ঘরে ছড়িয়ে ফেলা গায়ের সমস্ত পোশাক বুকে তুলে নেয় অশ্রু-সরস্বতী।

অগত্যা দরজা খুলে দেওয়া হয়। কিন্তু কান্নায় বিদীর্ণ কুকুরটাকে কোথাও দেখা যায় না। ভয়ে সে পালিয়ে কোথাও লুকিয়ে পড়েছে।

—নেই। .

—চলে গেছে।

—খুঁজে দেখুন।

—সম্ভব নয়, তুমি পাগলামি করছ রোকেয়া। ওই তো আকাশ, কোথায় তোমার নক্ষত্র? জহুরা নক্ষত্র কোথায়?

জ্যোৎস্নাবিহীন নক্ষত্রখচিত রাত্রি হাওয়ায় কাঁপছে। কবীরকে বারবার মনে পড়ছে ওই আকাশের দিকে চেয়ে, দরজা খোলা মাত্র আকাশ লাফিয়ে যেন হাতের মুঠোয় ধরা দিতে এসে থমকে দাঁড়িয়েছে চোখের উপর। মনে হচ্ছে আকাশ জুড়ে অগুনতি হিরের টুকরো জ্বলছে।

—আমাদের আর কিছুই নেই, মা নিজেকে নিঃস্ব করে সমস্ত দিয়েছে। এখন আমি আকাশের কাছে হাত পেতে দাঁড়িয়ে রয়েছি। এসো জহুরা, এসো কবীর। আমার মুখ আলো করো।

এ কথা বিড়বিড় করে বলতে বলতে কাব্য-সম্ভবা রাত্রির দুঃখিনী পরিণীতা আকাশের কোথাও আশ্রয় পেল না। একটি নক্ষত্রও তার হাতের মুঠোয় নেমে এসে ধরা দিল না। সে আকাশে হাত বাড়িয়ে কেবল বলে উঠল—তুমি কি আকাশে কোথাও কেঁদে ফিরছ কবীর! তোমার এই হতভাগ্য রাঙা সরস্বতীকে সঙ্গে নিলে না কেন? তুমি কত সহজে আকাশে চলে গেছ। আমার কী হবে একবারও ভাবলে না। এক টুকরো হিরের আলো আমাকে দাও কবীর! আমি মোনাজাত করি মা জহুরা! হায় খুদা! তোমার ফিরিস্তারা যেন আমার জন্য অশ্রুপাত করে সারারাত। তাদের চোখের জলেই কি হিরে ছড়ায় আকাশ!

আপন মনে বকতে বকতে মায়ের দেওয়া খাটে ফিরে এল কনে। তারপর কাপড়-পোশাক খুলে চিত হয়ে পড়ে নিঃশব্দে অশ্রু ঝরাতে ঝরাতে খাটে বরের দ্বারা ধর্ষিত হল।

নাকে বর্বর দাঁতে কামড় খেল রোকেয়া। তার স্নায়ুকোষে যন্ত্রণার নক্ষত্র চমকাতে লাগল, চোখে দেখা দিল দুধপথের ধোঁয়া।

কুকুরটা আবার ফিরে এসেছিল দরজায়। ডেকে কেঁদেছিল। ধর্ষিত হতে হতে সেই কান্না শুনেছিল রোকেয়া। ভারতবর্ষের মায়েরা মেয়ের জন্য এইরকম চমৎকার খাট বরাত দেয় কেন? ভেবেছিল রোকেয়া, কুকুরের কান্নার ভিতর সেই প্রশ্নের জবাব মেলেনি।

তখন রোকেয়া ভেবেছিল, কুকুরটা আসলে কিংবদন্তির সারমেয়, এ কথা না ভাবার কারণ তো ছিল না, কারণ সে সাহিত্যে এমন কুকুরের কথা পড়েছে।

—যুধিষ্ঠিরের কুকুরটা কাঁদে হেডমাস্টার!

—চুপ। বাজে কথা।

—কবীর বলত....

—ফের!!!

কবীরের নাম এসে পড়ায় নাকে কামড় খায় রোকেয়া! বুকে দাঁত বসে।

—খুবই বিধর্মের কথা শেখাত ছোকরা।

—ধর্মের কুকুর স্যার!

—আর শেখাবে না আমাকে। নোংরা মেয়ে!

—আমাকে রেহায় দিন মান্নান।

—আমার নাম ধরে ডাকলে!

—কেন?

—স্বামীর নাম মুখে করে না বিবিরা, জানো না!

—সরি! ছেড়ে দাও আমাকে।

—শরীর জাগে না কেন অসতী!

—ছিঃ মান্নান। মায়ের খাটে বড় কষ্ট জনাব।

—ব্যঙ্গ হচ্ছে!

—না হুজুর, কষ্ট হচ্ছে। ছেড়ে দাও।

—আমার হুকুম। ভোরে নাক ফুঁড়বে তুমি।

—আমি চলে যাব।

ভোররাতের দিকে কুকুরের কান্না থেমেছিল। ধর্ষিতার ঘুম এসেছিল। ভোরে সূর্য উঠলে জেগে গেল রোকেয়া। জানলা খুলে সূর্যের বর্শার আঘাত খেল। নাকটা টনটন করছে। বুকে ব্যথা। গোপন প্রত্যঙ্গ জ্বালা। এরই নাম তবে বিবাহ।

হেডমাস্টার সূর্যোদয়ের আগে উঠে স্নান সেরে নামাজ পড়েছে। মাথায় এখনও টুপি। কপালে সিজদার পবিত্র ধুলা।

—তোমার দেরিতে ওঠা অভ্যাস বুঝি! ফজরের নামাজটা তা হলে কোনও দিনই ধরতে পারবে না। স্বামীর এ কথার কোনওই জবাব দিল না রোকেয়া। সে এগিয়ে গেল ওদিকের দরজার দিকে, যেখানে কুকুরটা কেঁদে ডুকরে আঁচড়ে চলেছিল দোরের কাঠ।

মান্নান বলল—ওটা আর নেই।

চমকে উঠল রোকেয়া। অস্ফুট জানতে চাই—কেন, কী হয়েছে?

—মরে গেছে। ধর্মের কুকুর আর নেই কবীরের লেডিলভ। আরে, অমন করে তাকাচ্ছ কেন! ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে। আহা! নাকটা টকটক করছে। যাও গোসলে যাও। নাক-ফুড়ুনি হাজাম আসছে। পিঁড়িতে বসে কাজ হবে। ভয় নেই। হাজাম পুরুষ নয়, ও পাড়ার নানি, মেয়েমানুষ। ফুটুস করে ফুঁড়িয়ে দিয়ে চলে যাবে। রাতে মায়া হল, না হলে আমিই করতাম। আচ্ছা, কবীর নাকে হাত চেপে ছুঁয়ে দিয়ে কী বলত?

—ও কথা থাক মান্নান! বলে বাথরুমে ঢুকে পড়ল রোকেয়া। এখানেই প্রাতঃকৃত্যের সমস্ত এবং স্নান সম্ভব, বৃহৎ ব্যবস্থা।

স্নান করতে করতে আয়নায় চাইল রোকেয়া। বুকে দাঁতের দাগ। নাকের ডগা এখনও রক্তাক্ত। ডালিমের মতো রং। বুকে হাত দিয়ে কাতরে উঠল এবং নাকের ডগা আঙুলে ছুঁয়ে 'মা, মাগো!' বলে কেঁদে উঠল রোকেয়া।

—কবীর! তুমিও পুরুষই ছিলে, কিন্তু কোথা থেকে অমন মন পেয়েছিলে? বলে আরও কাঁদল রোকেয়া। সে পালাবে ভাবছিল। 'এই নাকে ছ্যাঁদা হলে তোমাকে দেওয়া কথাটা মাটি হয় কবীর! আমি কি কথা রাখব না?' বলে ফুঁপিয়ে উঠল জলস্রোতের চালুনিতে। শাওয়ারে কান্নার প্রপাত চলেছে। এত অসহায় আমি! বলে আয়নায় আবার চাইল রোকেয়া।

মায়ের কাছে ফেরার জন্য একটা বাক্সমাত্র গুছিয়ে নিয়েছিল রোকেয়া। হাতের শাঁখা-পলা কিছু রাখেনি। একটি চুড়িও না। সিঁদুর তো দূরের কথা, কপালে একটা টিপ পর্যন্ত নেয়নি। হালকা ছাপঅলা সাদা সুতির শাড়ি এবং সাদা ব্লাউজ পরেছে, কানের দুল পর্যন্ত খাটের উপর রেখে দিয়েছে। গলায় মালা নেই। সবই এদের দিয়ে যাচ্ছে সে।

জানলার সামনে এসে বাইরে চেয়ে থমকে দাঁড়াল রোকেয়া। মৃত কুকুরটার ঠ্যাঙে দড়ি বেঁধে মোরামের লাল পথের উপর দিয়ে বাচ্চারা টেনে নিয়ে মাঠের দিকে চলেছে।

—ধর্মের মৃত্যু কি এভাবেই হয়, বিয়ের রাতে? কোনও গল্পেই কি বাঁদশা-স্বামীকে ভোলানো যায় না? ভোরের দণ্ডটা আমি আর নিতে পারব না মান্নান। আমি চলে যাচ্ছি। খোদা জানে, নারীও মানুষ। বলে বাক্সটা হাতে ঝুলিয়ে দ্রুত উঠোনে নেমে পড়ে রোকেয়া। উঠোন রোদে ঝলমল করছে।

মেয়েরা সব দলবেঁধে জুটে পড়েছে। ডালিমতলায় পিঁড়িপাতা।

—আসো বউমা!

—আসো নাতিন!

—আসো রোকেয়া!

—আসো রুকু!

—এ কি বউ, গা খালি কেন মা!

—কানপাশা দেও নাই? চন্দ্রহার পরো নাই?

—কলেজগার্ল সেজেছে বুবু! হাতে চুড়ি পর্যন্ত নাই।

—হাতে বাক্স কেন মা?

বাক্সটা একজন কেড়ে নিল। মেয়েরা তাকে আদরের শেকল পরাতে পরাতে ডালিমগাছের গোড়ায় পাতা পিঁড়িতে এক প্রকার জোর করেই বসিয়ে দিল।

—আমি পারব না। বন্দিনীর বিপন্ন শ্লথ গলায় বলে উঠল রোকেয়া।

সিঁড়ির পাশে জ্বলছে সরষে তেলের প্রদীপ। একটা তেলবাটির উপর চকচকে মস্ত সুঁচ।

নানি বাক্য এইরূপ ঃ আসো নাতিন জবাহ্ করি তোরে! 'পারব না' লব্জ আউরতের হদিসে নাই মা।

—আছে। আমরা পড়েছি।

—অ্যাই বিটি। পড়েছ বেশ করেছ, ইখানে ওই এলেমের কিতাব বন্ধ রাখতে হবে। মার কাছে দান চাইবা। হিরার নাকছাবি। কবুল? বলো, 'জ্বি—!'

—না শাশুড়ি মা। আমি পারব না। বলে শাশুড়ির দিকে কাকুতিভরা চোখ তুলল রোকেয়া। নানি সুচ গরম করে নিচ্ছে।

—আমি কবীরকে কথা দিয়েছিলাম মা! সুচ এগিয়ে এলে কঁকিয়ে উঠল বউ।

শাশুড়ি বললেন—এত কেন কবীর-কবীর করা! এতে মরদের মন তিতকে যায়।

—পায়ে পড়ি নানি।

—কবীর কে বাছা?

—বন্ধু।

—কোথাকার ছেলে?

—সালারের।

—মুর্শিদাবাদ সালার?

—হ্যাঁ।

—নাক পাতো মা।

—অমন কোরো না নানি। কবীর নাক-ফোঁড়ন চাইত না। আমাকে অসুন্দর দেখাবে জননী। নাকে ব্যথা মাগো!

—সালারের ছেলে?

—ঠাকুরপুকুরে ওদের কলকাতার বাড়ি। যাদবপুরে পড়ত। ওর বাবা আলিপুর কোর্টের উকিল।

—ভালো কথা। ভুলে যাও। বাবার নাম?

—শারাফত সিকদার। মা আমিনা বেগম।

—তা হলে তোমাকে....

—সরস্বতী ডাকত কেন?

—হ্যাঁ।

—কবীররা অমনই সুন্দরকে মূর্তিতে দেখে, প্রেমকে পূজা দেয়। তাতে ওদের

জাত যায় না মান্নানের মা। নানিকে হটাও। আমি পারব না। বলে ঠেলে উঠে দাঁড়াতে চাইল রোকেয়া।

তারপর ওকে বস্তার মতো ঠেসে পিঁড়িতে বসিয়ে দিল মেয়েরা। তখন কান্না চেপে বধ্য প্রাণীর মতো রোকেয়া কেবল বলে উঠতে পারল—হায় সোনার রসুল।

নাকের পাতায় তপ্ত সুচ ঢুকে গেল, যেন তা শিক্ষিতা সুন্দরী রোকেয়ার ফুসফুসে ঢুকে পড়ল। তার চোখে অশ্রুর নামে রক্তই পড়তে লাগল।

কবীর আমাকে ফুলের কাবিন দিতে চেয়েছিল।

হায় হিরার রসুল!

রোকেয়ার চোখ বিস্ফারিত হয়ে কাকে যেন খুঁজছিল আকাশে। তখন বাড়ির বাগানে একটি সাদা বকনার নাকের দড়ি ধরে গোয়ালের বাইরে টেনে আনছিল কেউ।

বকনাটা গলা ছেড়ে ডেকে উঠছিল—মা! মা! মা-আ-আ-আ।

রোকেয়া আরব্য রজনীর হাজার নিশীথের একটি রাতে স্বামীকে আশ্চর্য একটি গল্প শোনাতে চেয়েছিল। সে গল্প মান্নান শোনেনি। নাকে ঝলকে উঠেছিল সেই গল্প বলতে চাওয়া মেয়েটির—একটি বালা। নাকফোঁড়ের মুহূর্তে বারবার সে বলতে চেয়েছিল, আমার মায়ের আর কিছু নেই দেওয়ার মতো।

সেকথাও কেউ শোনেনি। বকনাটা ডেকেই চলেছিল।

মুখ নিচু করে অপমানিত যন্ত্রণায় পাথর হয়ে গিয়েছিল রোকেয়া।

নদীর ওপার কহে

যেন কে বা কারা মাথার মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়েছিল মেয়েদের ভালোবাসতে হয়। ভালো না বাসলে মেয়েদের বোঝা যায় না। কারা যেন ভাগ করে বুঝিয়েছে, যৌনতা আর প্রেম এক জিনিস না। যৌনতা হল প্রবৃত্তি, যা পশুরও আছে। কিন্তু যৌনক্ষম মানুষ মাত্রই প্রেমিক নয়। প্রেম তা হলে কী? যৌনতা ছাড়া কি প্রেম হয়? কেউ বলল হয়, কেউ বলল হয় না। ইদানিং বুঝতে পারি, প্রেমের চেয়ে যৌনতা অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং শক্তিশালী ব্যাপার। রতি ঝা যখন আমার সঙ্গে ডিভোর্সের মোকদ্দমা করল আদালতে, তখন আমার বিরুদ্ধে যত অভিযোগ এনেছিল, তার মধ্যে প্রধানতম ছিল, আমি যৌন-অক্ষম।

এই একটা অভিযোগ নাকি আদালত খুব খায়। আমাকে অবশ্য আদালতের চূড়ান্ত জেরা অবধি যেতে হল না। আমার সঙ্গে রতির আইনি বিচ্ছেদ হয়ে গেল। আসলে ওই আনীত অভিযোগটি ছিল সর্বৈব রতির বানানো। আমি ভাবতেই পারিনি, ওই রকম একটা অভিযোগ সে খাড়া করে তুলবে। এখন শোনা যাচ্ছে, ওর উকিল নাকি ওকে ওই ধরনের মোক্ষম একটি পরামর্শ দিয়েছিল। 'বলো যে, লোকটার পুরুষাঙ্গ জরাগ্রস্ত।'

এখন ভাবি, আদালত করলে ঠিকই করত। কারণ, যৌনক্ষমতা আছে কি নেই, তা মেয়েটার মুখ থেকে শুনলেই চলে, তার উপর কথা নেই। প্রেম সম্বন্ধে আদালতের আগ্রহ নেই, ওই সামগ্রী কাব্যের বিষয়। ডাক্তাররাও মানুষের যৌনক্ষমতার পরীক্ষা নেয়, প্রেমের পরীক্ষা নেওয়ার কৌশল তাদের অনায়ত্ত। অবশ্য যৌনক্ষমতার সাচ্চা পরীক্ষা আদৌ কি সম্ভব? যাই হোক, এ প্রসঙ্গ আদালতে তোলবার আগেই, এই অভিযোগ আমার কানে রতির তরফ থেকে কায়দা করে পৌঁছে দেওয়া হয়েছিল। ফলে লজ্জাবশে আমি তার কাছে আত্মসমর্পণ করি এবং আপসে মামলার নিষ্পত্তি প্রার্থনা করি।

কী করে বুঝলাম না, আমার ওই অক্ষমতার কথা আত্মীয়-পরিবারে, চেনাজানা মহলে, বন্ধু-মণ্ডলে রাষ্ট্র হয়ে গেল। ব্যাপারটা গোপন করতে চেয়েছিলাম, হল না।

আমার এক দূর সম্পর্কের বউদি হঠাৎ একদিন মুখের উপর ফস করে বলে বসল—তোমাদের নাকি ওই জিনিসটা হত না! কী গো, সত্যি নাকি?

বললাম—সেই রকমই তো শুনলাম।

বউদি বলল—তার মানে হত? রতি মিথ্যা মামলা সাজিয়েছে? ইস্, মানুষ যে কী?

আমি মুখ নিচু করে বললাম—সবাই দেখছি এই ব্যাপারে খুব প্রশ্ন করতে চাইছে।

—এটা যে ভাইটাল ভাই। পুরুষের পুরুষত্ব না থাকলে চলে! ওটার জন্যেই সংসার। শুনেই আমি ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে চলে এলাম।

একদিন ছোট মাসি হঠাৎই শুধালো—তুই কি আর বিয়ে করবি সুনন্দ? কী ঠিক করলি?

আমি হেসে ফেলে বললাম—এটা একটা ভাইটাল কোশ্চেন ছোট মাসি। আমার কি উচিত হবে আর?

—কেন নয়? তুমিই ভেবে দেখো ঠিক করে। তুমিই বুঝবে আর তো কেউ বুঝবে না।

—কেউ যা বুঝবে না, আমি তা বোঝাতে যাব কেন?

—তুমি বোধহয় ভুল বুঝলে!

—না, ঠিক আছে। বলে দ্রুত অন্যত্র সরে চলে এলাম। দেখলাম, মাসির চোখ দু'টি কেমন বিষণ্ণ হয়ে গেল। সরে এলাম, কিন্তু কোথায় যাব, কার কাছে যাব? যার কাছেই যাই, এই একটা প্রশ্ন সে শেষ পর্যন্ত তুলবে। এর কারণ বোধহয় এইই তাহলে যে, রতির অভিযোগের মধ্যে সত্য আছে এবং রতিকে আদালতই নয়, তার বাইরের সমস্ত সংসার বিশ্বাস করেছে। আমিও জানি, রতির মিথ্যা বলার কোনও অভ্যাস ছিল না।

রতি মিথ্যা বলত না। শুনেছি, ছোটখাটো-খুচরো মিথ্যা বলাটা মেয়েদের আর্ট। মেয়েদের সুন্দরমুখ মিথ্যা বলবেই। বন্ধু পিনাকী আমাকে জ্ঞান দিয়ে বলেছিল, সুন্দর মুখের মেয়েগুলোর কথার আদ্দেকটা ফেলে দিবি, নিবি না। কারণ ওরা মিথ্যা বলার একটা বাড়তি সুখ উপভোগ করে, সেইটে ওদের নেশা।

এই নেশা রতির ছিল না। সুন্দরমুখ অথচ মিথ্যা বলে না, এমন দুর্লভ রমণী সংসারে আছে, ভাবলেই একটা আশ্চর্য আশ্বাস তয়ের হয়। মনে হয় পৃথিবী একটা পরমাশ্চর্য সুন্দর জায়গা।

—তোর বউ মিথ্যা বলে না, এটা একটা গুজব। অত সুন্দর মুখ মিথ্যা বলতে বাধ্য। খুবই খুচরো মিথ্যা এমন করে কথার মধ্যে মেশাবে শিবের বাবাও ধরতে পারবে না। কিন্তু সেই মিথ্যার ধার আছে, যেখানে কেটে বসবার তা বসে যাবে।

—কী রকম?

—পরে তোকে উদাহরণ দিয়ে বোঝাব।

পিনাকী আর উদাহরণ দেয়নি। ওর ব্যাঙ্কের চাকরি, বদলি হয়ে উত্তরবঙ্গে গেল। অতএব দৃষ্টান্ত স্থগিত রইল। শুনছি সে কলকাতায় ফিরবে। কিন্তু তার আগেই কেটে যা বসার তা হৃৎপিণ্ডের গভীরে চাকুর মতো চলে গেছে।

আমার একটি অদ্ভুত বিশ্বাসশক্তি আছে এবং তা হল, আমি যার উপর নির্ভর করেছি, মনে করি, সে মিথ্যা বলতে পারে না। আমি অদ্ভুত এই ধারণাকে খুব গূঢ়চিত্তে আঁকড়ে ধরেছিলাম। বিশ্বাস করে ঠকা ভালো, এটা আমার কাছে কথার কথা ছিল না।

রতি বলেছিল—তুমি খুব সরল। খুব বেশি সোজা। তোমার রহস্য কম।

—তুমি রহস্য ভালোবাস?

—না।

—তাহলে তো মিটে গেল।

—সমস্যা কী হয়েছে যে মিটে যাওয়ার কথা বলছ? তবে হ্যাঁ, রহস্যময় পুরুষের একটা অন্য স্বাদ আছে।

—সেটা আর এ জীবনে পাওয়া হল না তোমার!

—আমি কি তাই বললাম?

—ও, আচ্ছা! তা বলোনি?

—একদমই নয়।

এই পর্যন্তই হল। কথা আর এগোতে দিল না রতি। অন্য ঘরে চলে গেল। এখন বুঝতে পারছি, আমি খুব সাদামাটা মানুষ। রতি ওই সেদিনই সত্যকে চেপে মিথ্যা বলেছিল, ধরতে পারিনি। কোনও এক রহস্যময় পুরুষকে কল্পনা করত রতি। তার উপর আমার অতিরিক্ত নির্ভরতা হয়তো সে পছন্দই করত না। রহস্যময় পুরুষ তার একটি গোপন প্রবল সত্তাকে মেয়েদের কাছে সম্পূর্ণ লুকিয়ে রাখে। তার মনোজগতের গভীরে নারীকে পৌঁছতে দেয় না। শুধু রহস্য নয়, রহস্য-গভীর হয় তারা। কী করে হয়, কেমন করে হব আমি? আমি তো পারব না। আমি বোধহয় স্ত্রীর আঁচলধরা মানুষ ছিলাম। সব কথা স্ত্রীকে উজাড় করে বলতে চাইতাম।

—আমি সবই বলে ফেলি। তোমার বুঝি খারাপ লাগে রতি?

—না। বলবেই তো!

—সত্যি বলছ?

—আমি মিথ্যা বলি না। তুমি বলবে, আমি শুনব। তবে বলবার কথা একটু সাজিয়ে নিতে হয়। সব না বললেও আমি ঠিক বুঝে নেব। কথার মধ্যে একটুখানি 'গ্যাপ' রাখলে মানুষকে 'ফিল' করার সুবিধা হয়। কথার মধ্যে সব সময়ই একটা না-বলা অংশ রাখতে হয়, তাতে কথারও আকর্ষণ বাড়ে। নাও, বলো কী বলবে?

সেদিন থমকে গেলাম আমি। আমার মনটাই যেন কেমন মরে গেল। আমার কথার না-বলা অংশ কোথায় রেখেছি আমি? কোথাও না। আমার কথায় ড্যাশ নেই, সেমিকোলন নেই, কমাও খুবই কম, সর্বোপরি নেই ডট্‌স্‌। আমার প্রতিটি বাক্য দাঁড়িতে দাঁড়ায়। এই স্পষ্টতা, এই সারল্য, এ কি খারাপ? রতিকে কেমন করে বোঝাব আমার ওই সিধে কেতাটি?

আমার বাক্য দাঁড়িতে দাঁড়ায়। আমি ইন্টেলেকচুয়াল নই। কী হবে আমার? আমার বাক্যের স্বাদ পায় না রতি। অথচ সে বলে, 'তুমি বলবে, আমি শুনব।' অর্থাৎ শুনব, কিন্তু ভেতরে নেব না। রতি মানিয়ে নেওয়ার ভান করত, তার বাক্যে ছিল তলবর্তী তীক্ষ্ণ সত্য, অঙ্গরাগে মিথ্যার অভ্র মাখানো, ধরতে পারিনি। একদিন সহবাসে মনে হল, রতির শরীরটা পানসে লাগছে, পুরুষাঙ্গ উৎসাহ হারিয়েছে, ওটা নিজেরই মধ্যে গুটিয়ে আসছে।

—কী হল!

—আমি ঠিক বুঝতে পারছি না।

—তাহলে ছেড়ে দাও। তুমি ঠিক মতো পারলেই বা কবে! নাও, অনেক হয়েছে! শোনো, শুয়ে পড়।

—না।

—না মানে! বলে বিছানায় ফুঁসে উঠে বসল রতি। তার চোখের দৃষ্টি দগদগ করছে। আমার কেমন ভয় করল, তবু বললাম—ইট ইজ অ্যা সিমপ্যাথেটিক গেম, রতি। ওভাবে চোখ পাকাচ্ছ কেন?

—বেশ তো। শুয়ে পড়ো। সুরকে নরম করল রতি। তারপর বলল—সারারাত, আমাকে আর জ্বালাতন করবে না।

—আমি কোথায় যাব তাহলে?

—অদ্ভুত! আমি সেটা বলব কী করে!

—তুমিই তো বলবে।

—দ্যাখো, ন্যাকামো কোরো না। ভাললাগে না। তোমার অ্যাবিলিটি সামান্য, অথচ গোঁয়ার্তুমি হাণ্ড্রেড পার্সেন্ট। একে বলে মুখহীন পিপাসা, জল চাইছ, অথচ খাবে কী করে জানো না!

—মিথ্যা!

—আমি মিথ্যা বলি না সুনন্দ। তুমি নিজেকে বোঝার চেষ্টা করো। আমাকে ঘুমাতে দাও। সকালে অনেক কাজ আছে।

—আমি কিন্তু ফোর্স করব।

—করেই দেখো না। আমিও তৈরিই আছি।

—মানে!

—গায়ে একবার হাত দাও, তা হলেই বুঝবে!

—এই তো দিলাম, কী করবে! করো, কী করবে! বলে এক হাতে রতির একটি বাহুর নগ্ন ঊর্ধ্বভাগ শক্ত করে চেপে ধরতেই অভাবিত প্রতিক্রিয়া ঘটাল সে। আমাকে একটা চড় মেরে বলল—যা হট্! একেবারে ভিখিরি। মানুষের বিরক্তিও বোঝে না। যাও, নেমে যাও খাট থেকে। যাও বলছি, নইলে আবার মারব!

মার খেয়ে আমি তখন জন্তুর মতো এবং খাটের উপর চার হাতপায়ে বাচ্চার মতো হামা দিলাম। আসলে পাগল হয়ে গেছি। বুঝতে পারছি না, মাথার মধ্যে কী একটা বজ্রের মতো জ্বলে উঠে পুড়ে গেল। পোড়া ধোঁয়ায় ভরে গেল মাথা। আমার পুরুষাঙ্গ ভীতত্রস্ত কুকুরের লেজের মতো কোথায় ঢুকে গেছে। আত্মায় জড়িয়ে গেছে দুর্মোচনীয় নিরাকার আশ্চর্য ভয়।

আমি খাটের কিনারা ধরে বাঘের মতো রতিকে ঘিরে পাক দিলাম। একবার, দু'বার, তিনবার। বললাম—আমার নাম প্রদক্ষিণ রায়। তুমি বনদেবী, কেমন? তোমাকে

ঘিরেই আমার সব। কী গো, চেনো নাকি! কাঁচাখেকো মোল্লার ঠেঁস, ওই দিকে সিংহিপোতা, তারপর সাগরদ্বীপ। সব ভুল। ঐক্য, বাক্য, মাণিক্য। কামিনী। কাঞ্চন। সব ভুল। আম পিছল, কাম দিঘল। তোমার নাম কামিত্রী। তুমি কামের কূপ, অতল ইঁদারা, গায়ে সিঁড়ি নাই, একবার নামলে আর ওঠা যায় না। দড়ি নাই, দড়া নাই। তোমার কেশপাশে জড়িয়ে মরব একদিন। যখন তুমি ঘুমিয়ে থাকবে। অতঃপর আজ থেকে আমার বাক্য জটিল হল রতি। পেন্নাম হই কামরূপ কামিক্ষ্যা দেবী, প্রেতযোনি, থুঃ! বলে রতির মুখে থুথু দিয়ে বাঘের মতো নামলাম খাটের নীচে মেঝেতে। তারপর মায়ের ঘরে চললাম হামা টেনে। ঘুমন্ত দৃষ্টিহীন মায়ের বুকে মাথা রেখে বললাম—আমাকে তুই ফিরিয়া নে মা। সেই ভ্রূণে, ভ্রূণের অতীতে, অন্ধকারে রেখে দে মা। বলেই আমার কান্না পেয়ে গেল।

ভোরে ব্রেকফাস্টের টেবিলে রতির মুখের দিকে আর চাইতে পারলাম না। ভয় করছিল। প্লেটটা আমার দিকে আস্তে করে ঠেলে দিল সে। অর্থাৎ আমি যেন ভালো করে খাই। দেখলাম, খাবারে রতির মাথার চুল জড়ানো। চুল দেখেই আমার বিবমিষার অনুভূতি হল। মনে হল, ইচ্ছে করেই চুলটাকে রতি খাবারে ভালো করে জড়িয়ে রেখেছে।

—কী হল! খাবে না?

কথার জবাব না দিয়ে টেবিল ছেড়ে উঠে পড়লাম। চিনে মাটির কেৎলি থেকে কাপে চায়ের লিকার ঢেলে নিলাম নিজে হাতে। দু'খানা বিস্কুট উঠিয়ে নিলাম অন্য প্লেট থেকে, নিয়ে চলে এলাম ছাদের ঘরটায়। এখানে আমি আঁকি। আঁকা ছাড়া আমার কোনও কাজ নেই। ছবি এঁকে কিছু রোজগার হয়। বলার মতো কিছু নয়। তবে হয়।

—খাবার ছেড়ে উঠে চলে এলে যে! এখানে আনব?

—না।

—এই অশান্তির কোনও মানে হয় না।

চুপ করে থাকলাম। আমি মনে মনে সত্যিই কোনও অশান্তি চাইছিলাম না। বললাম—তোমাকে আমার ভয় করে রতি। আমি তোমার সঙ্গে অশান্তি করে পারি?

—তাইই তো করছ! আমাকে ভয় কিসের তোমার? স্বামী-স্ত্রী একসঙ্গে থাকতে গেলে....

—দেখো, আমাদের আর বনিবনা হবে না। আমি অসমর্থ মানুষ, সেই অপরাধে তুমি আমাকে মেরেছ। একবার যখন হাত উঠেছে, বারবার উঠবে।

—তুমি আমার হাতে খাবে না?

—খাবারে চুল পড়লে খাব কী করে! তুমি তো কিছুই দ্যাখো না।

—চুল পড়েছে!

—আমিও মিথ্যা বলি না রতি ঝা।

—সামান্য চুল পড়েছে বলে....

রাস্তার পিচ আর ধুলো মাখা মাংস দক্ষিণ রায় খায় না। তোমার শরীরে বড্ড বেশি

চুল। বলে ফেলেই নিজে আমি কী ধরনের চমকে উঠলাম যেন। যেন বা এ আমার কথা নয়।

স্নানস্নিগ্ধ রূপমতী রতির চোখে একটা কিসের ধাক্কা লাগল। চোখ দুটি সরু করল। তারপর দ্রুত ছাদের এই ছোট ঘরের চৌকাঠ ছেড়ে নীচে নেমে চলে গেল। আমার মনে হল, এ ঘরে তার না ঢোকাই ভালো।

মায়ের চোখে দৃষ্টির আলো না থাকলেও, মা ছাদের এই ঘরটা পর্যন্ত আন্দাজে ঠাওর করে উঠে আসে। আমি চায়ে চুমুক দিতে দিতে সামনের দেয়ালে টাঙানো বড় ক্যানভাসে সম্পূর্ণ নগ্ন রতিকে দেখছিলাম। আমিই এঁকেছি। রতির উপর আমার আড়াইশো ন্যুড স্টাডি আছে। এই নগ্নপাঠে রতির কখনও কোনও আপত্তি দেখিনি। তার কোনও জড়তা নেই। এমন করে তাকে মেলে ধরেছি বলে সে মনে মনে খুশিই হয়েছে।

প্রথমে এ ঘরে ঢুকে বাইরের কেউ হকচকিয়ে যায়। এত বড় নগ্ন নারী তার চোখে দুঃসহ ধাক্কা দেয়। নারীর সমস্ত যৌনকেন্দ্রগুলি এখানে অত্যন্ত স্পষ্ট। স্পষ্ট হলেও নারীর সর্বাঙ্গে লিপ্ত শিল্পের মায়াবী আলো। সেই আলো বাস্তবের গায়ে এমন করে ফুটে আছে যে বাস্তবের জোরটা তাতে আরও বেড়েছে। রতির বুক দু'টি যেন অলৌকিক নন্দন-পুষ্প হয়ে দুধের সাদার মধ্যে ডুবে গেছে এবং রেখায়িত হয়েছে স্বর্ণাভা। স্তনের রেখা স্বর্ণাভ কিন্তু দুগ্ধফেনিভ আলোতে ডুবে গিয়ে ভাসছে, তাতে ফুটেছে গ্রিক সৌন্দর্য অথচ সেই বুক বাঙালি আড়াটিকে বিসর্জন দেয়নি। বুকে যত মায়াবী আলো পড়েছে, স্ত্রী-যৌনাঙ্গে তা অনেক সুপ্ত। ফলে এক্ষেত্রে বাস্তবের ধাক্কাটা বেশি করে পড়ে মনের উপর, বুক দু'টি তোমাকে নিয়ে যাবে এক স্নিগ্ধ শান্তির উপকূলে, বুকের বৃন্ত খয়েরি, দেখে বুঝবে এ নারী অনাঘ্রাতা। এ দুর্লভ, কিন্তু পৃথিবীর কোথাও আছে। সবচেয়ে বুঝবে তুমি রমণীর মুখ দেখে, ধীরে ধীরে, আরে ওই ছবিটা তো এ বাড়িতেই রক্তেমাংসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি তখন লজ্জা পাবে আরও বেশি এবং অস্বস্তি হবে অধিকতর। ভাববে, একটা মানুষ নিজ স্ত্রীকে নিয়ে এমনটাও করতে পারে! অথচ তুমি শিল্পীকে নির্লজ্জ বলতে পার না। তোমার লজ্জা পাওয়াটা সুনন্দ উপভোগ করে। রতিও আনন্দ পায়।

এই ছবিটার সামনে দাঁড়িয়ে রতি একদিন বলেছে—এই ছবিটার জন্যই কখনও তোমাকে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারব না। এটা প্রদর্শনীতে দিও না। কোনও কেউ টাকাঅলা লোক কিনে নিয়ে শোবার ঘরে টাঙাবে, সে ভারি খারাপ লাগবে আমার। এ ছবিটা আমি নই, আবার আমিই বটে। কী বলো?

আমি কিছুই বলিনি। চুপ করে শুনেছিলাম কেবল। সীমাহারা আনন্দে বুক ভরে গিয়েছিল, মুখ বুজে এসেছিল। রতিকে আঁকতে আঁকতে তার দেহের প্রতিটি বাঁক এবং ভাঁজের এবং ভঙ্গিমার ছন্দ তুলির মুখে আবিষ্কার করেছিলাম আমি। রঙ দিয়ে অলৌকিক উদ্ভাসে তাকে দিয়েছিলাম অশেষ মাধুর্য, বর্ণনীয়কে করেছিলাম বর্ণনার অতীত এবং ঊর্ধ্ববর্তী। সে বুঝতে শিখেছিল, তার সৌন্দর্য সামান্য নয়। সে দুর্লভ। তাইই নয় সে, বাস্তব নয় শুধু , সে শিল্পলব্ধ সুন্দরের মতোই রহস্যময়ী। তাকে সবখানি পাওয়া যায় না।

সরল বাক্যেই কখন একদিন রতিকে এই রহস্য-সুন্দরের অধরা উচ্চতায় ঠেলে তুলেছি নিজেই জানি না। সাহিত্যের ছাত্রী এবং কলেজ-শিক্ষিকা রতি তারপর থেকেই কথার মধ্যে বেশি করে রহস্য সঞ্চার করতে শুরু করে।

আমি বড় রোজগেরে প্রতিষ্ঠিত চিত্রকর নই। একদিন হঠাৎ রতি বলল—এর চেয়ে উৎকৃষ্ট তুমি আর পারবে না কখনও। এটাই তোমার প্রতিভার শেষ কথা। শুনে আমি আহত হয়েছিলাম। বুকটা কেঁপে উঠেছিল এই ভেবে যে, এইই আমার শেষ? মুখ পর্যন্ত শুকিয়ে উঠেছিল। বলতে পারিনি, প্রতিভা যদি প্রতিভাই হয়, তাহলে তার শেষ কেউ আগে থেকে দেখতে পায় না এবং তার সব রহস্য একটি অবজেক্টের বলার সাধ্য নেই। তোমাকে এঁকেই আমি ভুল করেছি। তোমাকে না আঁকলে, তোমার যে রহস্য অপার, তাকে কী করে বুঝতে তুমি? তুমি শিল্পীর আরোপিত সুন্দর সত্যকে এভাবে রক্তমাংসে আত্মসাৎ করলে কেন রতি? শিল্পের অহংকারটুকু তোমার নয়, ওটা আমারই উৎপাদন।

—একটি সরল মন এর চেয়ে আর কী আঁকবে? সারল্যের শ্রেষ্ঠ গুণ দিয়ে যা পারে মানুষ, তুমি তার চেয়ে বেশিই পেরেছ সুনন্দ। এত বড় প্রশংসা কেউ করুক না করুক, আমি তো করছি। নিশ্চয় তুমি খুশি? বলে নিজের কথারই আবেশে আমার সম্মুখে ডুবে রইল রতি ঝা। আমার হৃৎপিণ্ডকে কে যেন বাইরে উপড়ে এনে থালার উপর রেখে কাটতে লাগল।

বললাম—তোমাকে আমি বিশ্বাস করি রতি। তুমি তারিফ করলে আমার পরমায়ু বাড়ে।

—তুমি দেখছি সুন্দর করে বলতেও শিখেছ ধীরে ধীরে।

—হ্যাঁ। আমি আজকাল প্রশংসার জবাব দেবার সময় মানুষের তারিফ করতে পারি। নিজের কানেও সেটা ভালো লাগে।

—আমি কিন্তু চাইব, তুমি সরল থাকো।

—রহস্য বুঝি তোমার একার?

—তুমি নিজেকেই একবার এঁকে দেখো, তা হলেই ভালো বুঝবে। রাগ করলে?

—না। বলে নীচে কলিং বেলের আওয়াজ শুনে নেমে এলাম ঝড়ের মতো। সেই থেকেই আমার যৌনক্ষমতা লোপ পেতে থাকল! সহবাসের সময় রতিকে পানসে লাগতে লাগল, কেমন একটা দমবন্ধ ভাব হত। গোপন প্রত্যঙ্গ উত্থিত হয়েই এলিয়ে যেত। আমার ধারণা পুরুষ লিঙ্গেরও একটি মন আছে যা পশুর থাকে না।

আসলে অধিকাংশ মেয়ের ধারণা, পুরুষ মিলন মুহূর্তে পশু অবয়ব পায়। কাজটা পশুরই মতো। অথচ সহবাসে পুরুষকে নিজের ভিতরে নিয়ে একটি মেয়ে অনুভব করে না, মানুষ শুধু ক্ষুধার্ত নয়, তার চোখেমুখে অজস্র আনন্দের সুন্দর অভিব্যক্তি ফুটে উঠছে, পশুমুখ পাথরের মতো—মানুষ তা নয়। শুধু ক্ষুধার তৃপ্তি নয়, অসংখ্য অনুভব সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের। মানুষ এই মিলনকে নিবৃত্তির উপরে টেনে এনে শান্তির মতো গাঢ়

অনুভূতি লাভ করে।

আমাদের মিলনে কোনও শান্তি ছিল না। রতির চোখে ছিল বোধহয় পশু চিত্রকল্প, ব্যর্থকাম ভাঙা শিল্পের বিক্ষোভ। রোজই বলত—পারো না, আসো কেন?

—চেষ্টা তো করছি।

—বরং ছবি আঁকার চেষ্টা করো।

—এভাবে বলছ!

—হ্যাঁ, বলছি।

তারপর একরাতে রতি আমাকে মারল। আমারই দোষ। কেমন দোষ, আবার বলছি। রতি মাঝে মাঝে আঁকার ঘরে ছুটির দুপুরে এসে একান্তে নগ্ন হয়ে ছবিটার গায়ে দাঁড়িয়ে বলত—দেখো, আমিই কিনা!

আমি বলতাম—দাঁড়াও দেখি। ছবিতে এখনও খামতি আছে। প্রকৃতি তোমাকে এত দিয়েছে, আমি তার সামান্যই ফুটিয়েছি। দ্যাখো, ছবিটার মেয়েটা তোমাকে ঈর্ষা করছে।

এই কথা শুনে ছবির আড়াল থেকে মায়াবী অধরা সরস্বতী হেসে উঠে মন্তব্য করলেন—হতভাগ্য! আমি স্পষ্ট শুনতে পেলাম।

রতি বারবার বলতে লাগল—আমিও ঈর্ষা করি সুনন্দ।

এই কথাটা আসলে মিথ্যা। কিন্তু সত্য মনে করেই কতবার রতির কাছে গেছি। গিয়ে বুঝেছি, আমি শেষ হয়ে গেছি। রতির সমস্ত আঙ্গিক আমার এখন ভেঙে ফেলা উচিত। নইলে আমি বাঁচব না।

আমি যাঁকে আমার গুরু বলে জানতাম, যে-কোনও সঙ্কটে যাঁর কাছে ছুটে যাওয়ার অভ্যাস ছিল, সেই বিভাসদা একদিন আমার আঁকার ঘরে ছবিটা দেখতে এলেন। ছবির দিকে অনেকক্ষণ পরম বিস্ময়ে চেয়ে রইলেন। তারপর আমার দিকে খুব ধীরে ঘুরলেন। চেয়ারটায় বসলেন। চোখ থেকে চশমাটা নামিয়ে ছোট টেবিলটায় রাখলেন। দু'হাতে নিজের মুখটা চেপে ধরে বসেই রইলেন চুপচাপ।

ভয় ভয়ে আমি শুধালাম—খুব কি খারাপ হয়েছে বিভাসদা?

—খারাপ! পাগলটা বলে কী! বলে মুখ থেকে হাত সরালেন তিনি। সামান্য ঘাড় একদিকে হেলিয়ে কাত করে আমাকে দেখলেন। মৃদুস্বরে বললেন—এটা একটা বড় কাজ হয়েছে সুনন্দ। এরপর তোমাকে আমারই সমীহ করে চলতে হবে। তা-তোমার বউ কী বলছে?

—ও তো....

—হ্যাঁ, কী বলছে সে? খাতির-আত্তি করছে খুব?

—না, তা নয়। ও নিজের সঙ্গে তুলনা করে ভাবে....

—দ্যাখো ভাই, ভেবে কিছু হবে না। এ হচ্ছে 'তুলনাহীন' যাকে বলে তাই। আমিই ভেবে কূল পাচ্ছি না, ও তো সামান্য অবজেক্ট। কী আছে, আর কী হয়েছে!

—অমন বলবেন না, রতি রাগ করবে।

—না, না। বলতে কে যাচ্ছে! তবে এই একটা ছবির জন্য ওর তোমার কাছে সারাজীবন, হোল লাইফ, ঋণী থাকা উচিত। কেন জানো?

—কেন? আচ্ছা, আপনি ওকে বলবেন কথাটা!

—না থামো। এ বলার নয়! বোঝার ব্যাপার। একজন কেউ নতুন মানুষ এই ছবিটা দেখার পর ওকে যখন দেখবে, কী দেখবে? অন্তত হাজার গুণ সুন্দর দেখবে তাকে। রক্তমাংসের বিবি হয়ে উঠবে অধরা মাধুরি, তাকে মনে হবে কী গভীর এবং ব্যক্তিত্বময়ী। তার প্রতি মানুষের কামনা শতগুণ বেড়ে যাবে। মানুষ অলৌকিক প্রাণ নয়, কিন্তু এভাবে দৈবাৎ হয়ে ওঠে। এটা সামলাতে না পারলে সর্বনাশের ব্যাপার হয়ে যায়।

—ও উলঙ্গ হয়ে এখানে দাঁড়ায়।

—ভাল করে না। কারণ ছবির সৌন্দর্য সে শরীর দিয়ে সব সময় শোষণ করতে চাইছে।

—ঈর্ষা করে।

—বুঝেছি। এটা এক ধরনের জটিল আত্মপ্রক্ষেপ। এবং মোহ। ভেঙে দাও।

আমি প্রায় ডুকরে উঠলাম—পারব না বিভাসদা!

—তাহলে এটা অন্য কোথাও সরিয়ে দাও।

—কোথায় রাখব? জায়গা তো নেই।

—বিক্রি করে দাও।

—রতি তা হতে দেবে না। এটা এখানেই রাখতে হবে।

—ও আচ্ছা! তাহলে এটাকে একদিন 'কিল্' করে দাও।

—সেকী! আমি যে এর বেশি পারব না বিভাসদা। এটাই আমার শেষ।

—সেকী রে পাগল! কে বলল একথা?

—রতি। শুনেই গম্ভীর হয়ে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন বিভাস পাইন। কথাই বললেন না আর। চুপচাপ নীচে নেমে চলে গেলেন। তলায় সিঁড়ির মুখে ট্রেতে ঠান্ডা কালো কোল্ড ড্রিংক্স হাতে রতি, উপরে আসছিল, দুটি সাজানো ভর্তি গ্লাস। থমকে পড়েছে।

—আমি তো আপনার জন্যে....

—না থাক আমি কোল্ড খাই না। ডাব খাই।

—আনাচ্ছি।

—দেরি হয়ে যাবে। চলি।

—কেমন আঁকছে সুনন্দ?

—খুব খারাপ। আচ্ছা চলি ভাই।

আমি উপরে সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে সবই দেখলাম এবং শুনলাম। প্রথমে কিয়ৎক্ষণ বিমূঢ় তারপরই উপরে ট্রে নিয়ে ধেয়ে এল রতি, ছবির দিকে চেয়ে বলে উঠল—এর

চেয়ে ভালো হয় না। তুমি পারবেও না সুনন্দ। আমি বলছি তোমাকে। দেখে নিও। বিভাসদা তোমাকে ঈর্ষা করছে।

এ কথায় আমার আর সহ্য হল না। আহত বিস্ময়ে দাঁতে দাঁত চেপে বললাম—এই কথাটা তুমি ফিরিয়ে নাও রতি। বিভাসদা সম্পর্কে কোনও কটু কথা আমি একদম শুনতে রাজি নই।

—আমি কি খুব কিছু ভুল বলেছি?

—সবটাই ভুল! তুমি কিছুই জানো না। তোমাকে উনি মনের কথা বলেননি।

—তাহলে তো কথা ফেরানোর প্রশ্নই ওঠে না। আমার সঙ্গে মিথ্যা বলে লোকটা!

—লোকটা? বিভাসদা লোক?

—বাজে লোক!

মাথায় মুহূর্তে রক্ত চেপে গেল আমার। ডান হাতটা নিসপিস করে উঠল। একটি চড় উঠে গিয়ে পড়ল রতির গালে। মুখ দিয়ে বেরলো—সাবধান রতি। খুব সাবধান। বলে ফেলেই দেখলাম—রতি চোখে আশ্চর্য অবিশ্বাস। ফর্সা মুখ অপমানে, রক্তোচ্ছ্বাসে ভরে গেল। অলৌকিক সুন্দর ফুঁসে উঠে বিকৃত হয়ে গেল। নাকের পাটা ফুলে ফুলে উঠল। তার নিঃশ্বাস গরম হয়ে উঠল। সে রীতিমতো কাঁপছে। হাতের ট্রে কেঁপে যাচ্ছে।

—তোমাদের মতো অতি মাঝারি শিল্পীদের খুব অহংকার, তাই না?

—হ্যাঁ, অহংকার বইকি। তুমি আমার চোখে একটা অবজেক্ট মাত্র। তোমার মুখটা বিষয়মুখ, তার বেশি নয়। বিভাসদা ছবিটাকে 'কিল' করতে বলে গেলেন। আই উইল কিল্ ইট।

—তুমি তা কখনও পারবে না সুনন্দ। যদি আমাকে ছিঁড়ে ফেলো, তুলি দিয়ে কাটো, নোংরা করে ধ্বংস করো, সারাজীবন কষ্ট পাবে। ভালো কি বেসেছ কখনও? আমি ছিলাম, তাই তুমি পেরেছ।

—রতি আমার ভুল হয়েছে!

—আই অ্যাম নট ইওর অবজেক্ট অনলি। তোমার মনে রং দিয়েছে কে? কল্পনার গতি ধরিয়েছে কে? অতি মাঝারি ক্ষমতাকে উপরে ঠেলে তুলেছে কে? তুমি মারলে, তোমাকে ঘৃণা করার ক্ষমতা আমার আছে।

—রতি, প্লিজ।

—এর জবাব তুমি পাবে, যথা সময়ে। ইউ মাস্ট লুজ সামথিং, যদি এটাকে কিল করো।

নরম করেই বলেছিল রতি। এবং রাতে বিছানায় আমাকে মেরেছিল। এই-ই কি সেই জবাব? রাতে রতি আমাকে মারল। সকালে খাবারে চুল জড়িয়ে দিল।

আমি আর বুঝে পাচ্ছিলাম না, আমাকে কী করতে হবে। রতির সামনে আমার আর কোনও কথা আসতে চাইত না। অদ্ভুত ঠান্ডা ঠান্ডা লাগত নিজেকে। ওর গায়ের গন্ধে কেমন একটা বুক পুড়ে যাওয়ার অনুভূতি হত। কাছে এলেই বিষণ্ণতা ছুঁয়ে ধরত হৃদয়।

কথা বন্ধ হল। বিছানা আলাদা হয়ে গেল। ওই ঘটনার পর ছ' মাস মতো এ বাড়িতে ছিল রতি ঝা।

দৃষ্টিহীনা জননী আমার আঁকার ঘরের চৌকাঠ পর্যন্ত এসে বিচিত্র আক্ষেপে বলত—বউটা খালি কাঁদে সুনন্দ। আবার একটা নতুন ছেলের সঙ্গে ভাবও করে নিয়েছে। সঙ্গে করে বাড়িতে আনে। খেতে দেয়। হাসাহাসি করে। তুমি দ্যাখো না?

—দেখি।

—কিছুই কেন বলো না?

—কী বলব?

—তুমি ছেলেবেলায় প্রজাপতি এঁকে আমাকে দেখাতে। কত রং, কী সুন্দর! তারপর তুমি মেঘের সোনার রথ আঁকলে। কী রং, চোখের ভিতর দিয়ে মাথায় ঢুকে যেত।

—হ্যাঁ মা। সে সব তো এঁকেছি।

—ওই মেঘের রথ আর ওই রাঙা প্রজাপতি কেউ তো তোমাকে এসে বলেনি, আমায় কেন আঁকলে? মেয়েরাও প্রকৃতি, তাহলে এত প্রশ্ন করে কেন? তোমার সঙ্গে দর করে কেন?

—কেন মা?

—আকাশ কি তোমার মুখের কাছে ঝুঁকে পড়ে তলব করে, কেন আঁকলি ছোকরা! সমুদ্র, সেও তো কিছু বলে না।

—মানুষ কেন করে?

—কারণ সে ভাবে, তাকে আঁকলে, সে একদিন ফুরিয়ে যাবে।

—মা!

—হ্যাঁ খোকা। একটা সাঁওতাল মেয়ের ছবি আঁকো, সে খুশি হবে। দর করবে না। কেন জানো? ও হল সৎ প্রকৃতি। যে তোমাকে দেয়, অথচ জানতে দেয় না, সেইই তোমার আসল।

—আমি কী করব মা?

—রতিকে নিঃশেষ করো। বারবার আঁকো, এঁকে এঁকে শেষ করে দাও। তার কাছে তোমার শিল্পের প্রয়োজন ফুরালে, তখন তাকে জীবন থেকে সহজেই বাদ দিতে পারবে। কোনও মোহ রেখো না। তোমার বাবা তোমার চেয়ে খারাপ আঁকতেন না। তাঁর কাছে অনেক শিখেছি। ওই দ্যাখো, বউমা এল বুঝি, নীচে গলা পাওয়া যাচ্ছে। বলেই মা সিঁড়ির দিকে গেল।

মা রতিকে রীতিমতো ভয় পায়। এই মা এককালে নিজেও কিছু কিছু আঁকত, বাবার উৎসাহে। বাবা চিরকালের মতো চলে গেল, মা আর তুলি ধরল না, তারপর শেষে দৃষ্টি হারাল।

মায়ের কথা মতো আবার তাহলে গোড়া থেকে রতির নগ্নতাকে পড়া দরকার।

নীচে ওর গলা। ওর সঙ্গে কথা হয় না। কিন্তু এখন কথা বলেই ওকে রাজি করাতে হবে।

সেই ছেলেটাও নীচে এসেছে। সে এক রহস্যময় অনন্যস্বাদ যুবা। তার স্বাদ কী, আমি তো বুঝব না। প্রথম দিনেই রতি সুন্দর ছেলেটাকে ছাদের ঘরে নিয়ে গিয়ে ছবিটাকে দেখিয়ে এনেছিল, সেই ছবির দীপ্তি মুখে এবং সর্বাঙ্গে মেখে নীচে যখন নামল, মনে হল, ছবিটাকেও যেন সে ছাপিয়ে উঠেছে। এবং তৎক্ষণাৎ মনে হল, ছেলেটাকে রতি গিলে ফেলবে সহজেই। ছেলেটার চোখে নেশা ধরে গেছে। ওই নেশার মধ্যেই সেই যুবক আমাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখছিল। কথা বলবার জন্য মুখ ঈষৎ হাঁ করেছিল। তখনই আমি চোখ নামিয়ে নিলাম, মুখ কঠিন হয়ে উঠল। সরে এলাম। তা দেখে রতি নিজেই আলাপ করিয়ে দেবার জন্য এগিয়ে এসেছিল। আমি তাকেও কোনও সুযোগ না দিয়ে ছাদে চলে এলাম।

ওদের হাবেভাবে অব্যক্ত গাঢ়তা এসে পড়েছে, ওরা আজকাল বাইরে কোথাও সহবাসও হয়তো করে। রতির মুখে অপূর্ব চাপাসুখ লক্ষ করা যায়। স্বাস্থ্য বেশ ভালো দেখায়। ভরভর ভাব। একেই কি আমি খুন করতে চেয়েছি?

আজ হঠাৎ প্রশ্ন করলাম—তোমার নাম কি ভাই?

—অনঙ্গ।

—কী করো?

—কিছু না। খাইদাই থাকি। আমি এম. এল. সি.।

—এম. এল. সি?

—মেম্বার অফ লোকাল কমিটি। এম. এ.। হায়ার সেকেন্ড ক্লাস আছে।

—ও। তাহলে বেকার।

—না। বেকার কেন হব? পার্টি মাসোহারা দেয়। অল্পই। বাকি এখন যা লাগে আপনার ওয়াইফ দেখেন, মানে বউদি।

—কত দিচ্ছেন বউদি?

—রতি গত মাসে চারশো দিয়েছিল। পার্টি প্রোগ্রামে পটনা ঘুরে এলাম।

—ও।

রতি দিয়েছিল। চারশো টাকা। প্রথমে ওয়াইফ, পরে বউদি, শেষে রতি। কী অদ্ভুত সব জীবনের বিষয়বস্তু। লক্ষ করি, রতি ঝা মাথা নিচু করে খাটের কোণে বসে রয়েছে। মুখ তুলছে না।

ছেলেটা চলে গেলে আমি রতিকে ছাদে ডাকলাম। সূর্যাস্ত হচ্ছে। সে কেমন চুপচাপ। কোথাও একটা অপরাধের ছায়া নেমেছে তার চেহারায়। বললাম—কী ঠিক করলে?

—কিসের? বলে চমকে উঠে আমার দিকে তাকাল রতি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম—আমি আবার গোড়া থেকে শুরু করতে চাই।

—কী?

—ছবি। আবার তোমাকে আঁকব।

—হঠাৎ?

—মনে হল, তোমাকে ধরেই তোমাকে অতিক্রম করতে হবে।

—না হয় না। আর হয় না সুনন্দ। তোমার কাছে শুধু ছবি হব বলে আসিনি। তুমি বারবার আমাকে ব্যবহার করবে, আমি নগ্ন হব—তাই হয় নাকি! প্রত্যেকটা জিনিসেরই চরম মাত্রা থাকে। যা করবার করেছ, এখন নিজেকে বোঝবার চেষ্টা করো।

—আমি তোমাকে ভালোবাসি রতি।

—এই একটা কাঁচা কথা বলবার জন্যে এমন করে ছাদে ডাকলে! পাগল, তুমি পাগল হয়ে গেছ।

পাগল শুনেই আমার মাথার সত্যিই গোলমাল হয়ে গেল। দু'হাত দিয়ে অকস্মাৎ রতির গলা চেপে ধরলাম। ওকে খুন করবার ইচ্ছে হল। ও আমার হাতের মধ্যে ছটফট করে উঠল। বাঁচবার জন্য অদ্ভুত শব্দ করছিল মুখ দিয়ে। চোখ দু'টো ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছিল। ওর কঁকানির শব্দ পেয়ে মা উঠে এসেছে ছাদে। মা আমাকে নিরস্ত করার জন্য দু'হাতে টানছে। মা-ই শেষে ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেল। মাথা গিয়ে আছড়ে পড়ল প্রাচীরের ইঁটের কানায়।

মা আর্তনাদ করল—এ তুই কী করলি খোকা! চেয়ে দেখ এদিকে! শেষে মাতৃঘাতী হবি? শিল্পী কখনও এমন করে না খোকা! যে চায় না, তাকে তুমি জোর করে চাইছ কেন?

মা কথা বলছে, মায়ের কপালে রক্ত। আমি শিউরে উঠে রতিকে ছেড়ে দিলাম। মায়ের কাছে ছুটে এলাম।

মায়ের কপালে সামান্য পাতলা ব্যান্ডেজ হল। মায়ের খাটে আমি আর মা চুপচাপ বসে রইলাম বোকার মতো। অন্ধ মাকে খাইয়ে দিলাম, শুইয়ে পর্যন্ত দিলাম। তারপর বসে রইলাম একা। মনের মধ্যে কী হাতড়াচ্ছি আমি জানি না, কী হলে বাঁচব, তা-ও জানি না। নিজেকে আমার আজ চেনা হয়ে গেল, আমি খুন করতেও পারি। বাসনা উদগ্র অথচ অক্ষম মানুষ কি খুনি হয়?

গভীর রাতে রতির ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম। আমার ছায়া দেখেই আঁতকে উঠে বসল মেয়েটা। ভয়ে আমি পালিয়ে চলে এলাম। রতি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল। মা বলে উঠল—আর কেন যাচ্ছ সুনন্দ?

—তুমি জেগে আছো মা?

—তোমাকে পাহারা দিচ্ছি।

—আমি মাফ চাই। ওর কাছে।

—চেও। কিন্তু এখন নয়। ওকে শান্ত হতে দাও।

খুব ভোরে আবার রতির ঘরে এসে দেখলাম, সে বেচারি চলে গেছে। একটা চিরকুট মুখ বার করে আছে বালিশের তলায়। তাতে লেখা—আমাদের সম্বন্ধ শেষ হয়ে

গেছে, এরপর আর কোনও ধরনের যোগাযোগের চেষ্টা কোরো না। তোমার সঙ্গে অতএব একমাত্র আইনি বোঝাপড়াই সম্ভব। তুমি নিজের জন্য ডাক্তার দেখালে ভালো করবে।

—ইতি রতি ঝা।

দুই

আমি আর মা। অর্থাৎ সুনন্দ আর তার মা। দু'টি প্রাণীর খোরাক জোগাড় করতে হত শিল্পীকে। বিভিন্ন প্রদর্শনীতে ছবি দিত সুনন্দ। দু' একটি ছবি বিক্রি হত বটে, কিন্তু প্রদর্শনীর খরচা, আঁকা এবং ছবি বাঁধানো, ম্যাটাডোর ভাড়া এবং নানাবিধ আনুষঙ্গিক খরচ বাদে যা হাতে থাকত, তা সামান্যই। প্রদর্শিত চিত্রকলার সমালোচনা বার হত বিভিন্ন দৈনিক খবরের কাগজের পৃষ্ঠায় এবং সাহিত্য-শিল্প বিষয়ক পত্রপত্রিকায়। ভালোই আলোচনা। কিন্তু কখনও সুনন্দকে সত্যিকারের বড় মাপের কোনও প্রতিভা বলে কাগজগুলো লিখত না। সুনন্দ ক্রমশ অনুভব করতে শেখে, তার ক্ষমতা অতি সামান্য। তার ছবিতে বিভাস পাইনের প্রভাব নাকি দুর্লক্ষ্য ছিল না। সুনন্দ ভাবত, পাইনের প্রভাব মেনেই তো সে কাজ করতে চায়।

বিভাসদাই একদিন সুনন্দকে পথ বাতলানোর জন্য মৃদুমন্দ্র স্বরে কিছু কথা হঠাৎ-ই বলে যেতে লাগলেন—দ্যাখো সুনন্দ। তোমার পথ অন্য। তোমাকে বুঝতে হবে যৌনবোধহীন মানুষ সৌন্দর্য বুঝতে পারে না। রতি তোমাকে ঘা দিয়েছে। এই আঘাত থেকেই তুমি তোমার রসদ সংগ্রহ করে নেবে।

সুনন্দ বলল—রতি আমার বিরুদ্ধে কোর্টে মামলা করেছে বিভাসদা!

বিভাসদা বললেন—তোমার যা মন, তুমি পারবে না। তুমি আপস করো। মামলা মিটিয়ে নাও। তারপর তোমার সমস্ত অক্ষমতাকে শিল্পের মধ্যে প্রকাশ করো। অপমানই শিল্পের জননী। তোমার যা নেই বলে রতি তোমাকে দুষল, তুমি সেই 'নেই'-কে 'আছে' করে তোলো তোমার শিল্পে। তুমি বিশ্বাস করতে শেখো যে, যৌনশক্তিই শিল্পশক্তি।

—রতি আমাকে মিথ্যা দুষেছে বিভাসদা।

—মিথ্যাকে মিথ্যা প্রমাণ করার জন্য সহজ রাস্তা আছে। বিয়েশাদি করে সন্তান ফলানো। কিন্তু এই সাধারণ পথে যাবে কেন তুমি! যাবে না। জানি, এভাবে মেনে নেওয়া কঠিন। মানুষ কিন্তু পারে। শিল্পী অবশ্যই পারে। কীভাবে পারে?

—বলুন।

—যৌনবোধই মুগ্ধবোধ, সব মুগ্ধতার উৎস। তাই-ই মানুষকে কামনা করতে শেখায়, উৎসাহিত হতে শেখায়। যৌনতা হল মাটির সেই আঠার মতো, যা বালিকে মূর্তিতে ধরে রাখতে পারে। শুধু বালি দিয়ে মূর্তি হবে না ; মাটির আঠা লাগবে। একটি নগ্ন-নারী কত সুন্দর তুমি তা কী দিয়ে বুঝবে, যৌনতার দীপ্তি দিয়ে বুঝবে।

বলতে বলতে সামান্য একটু দম নিলেন বিভাস পাইন। তারপর সনন্দর মুখের

উপর জোরালো দৃষ্টির আলো ফেলে বললেন—সমস্ত শিল্প যৌনতার সূক্ষ্ম আলোয় জড়ানো। শিল্পী-মানস আসলে যৌন-মানস। জীবন হল সুস্থ সবল যৌনতার অন্বেষণ, এই পৃথিবীতে মানুষ আদম আর ইভের মতো সৎ যৌনতা খুঁজে বেড়ায়।

সুনন্দ বিড়বিড় করে আপন মনে বলল—রতি কিছু ভুল করেনি।

বিভাস বললেন—যৌন-দুরাচারকে শিল্পী ঘৃণা করে। এই ঘৃণাও শিল্পের বিষয়বস্তু। এই বিদ্বেষ এবং অন্বেষণ।

সুনন্দ চমকে উঠল। এবং শুনতে পেল, বিভাসদা বলছেন—নরনারীর আদিম একাগ্র যৌনতা আধুনিক প্রেমের চেয়ে মহৎ। মনে রাখবে, আদিম, সৎ, একাগ্র যৌনতার স্বাদ আধুনিক প্রেমের স্বেদ দিয়ে পূরণ করা যায় না। এই বিদ্বেষ এই ফাঁক এবং অনুসন্ধান তোমার বিষয় সুনন্দ। মুভ অন। আমি আছি।

—কিন্তু এ তো আপনার পথ নয় বিভাসদা!

—না। একদমই নয়। এ তোমারই পথ। কাগজগুলো যে বলছে তুমি পাইন-গ্রস্ত, এরপর আর বলবে না। যাও, মামলা মেটাও। পরে কথা হবে।

মামলা মেটানোর দিন সুনন্দ আবাক হয়ে লক্ষ করছিল, রতির সঙ্গে অনঙ্গও রয়েছে। উপস্থিত রয়েছে রতির বোন আরতি, রতির চেয়ে বয়সে অনেকটা ছোট, কলেজে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে। আরতি সুনন্দর দিকে কেমন ব্যথা জড়ানো দৃষ্টিতে প্রায় পলক না ফেলে চেয়ে রয়েছে। কথা বলতে পারছে না। সই সাবুদ হয়ে গেলে অনঙ্গ অদ্ভুত প্রস্তাব তোলে।

—আমি দায়িত্ব নিয়ে একটা কথা বলতে চাই, আপনাকে রাখতে হবে।

সুনন্দ হেসে ফেলে বলল—আমি দায়িত্ব নিয়েই শুনছি অনঙ্গ। বলো কী বলবে।

—ওই পিসটা আমাদের দিতে হবে।

—পিস?

—মানে ওই উলঙ্গ ছবিটা।

—কেন ভাই?

—ওটা আমাদের শোবার ঘরে থাকবে। আমরা সেট্‌ল করছি কিনা। ও জিনিস বাইরে থাকলে আমাদের পক্ষে অসুবিধা। আপনি দিয়ে দিন। আমরা এনজয় করি।

অনঙ্গর কথা শুনে আরতির ব্যথা জড়ানো দৃষ্টি আহত বিস্ময়ে চমকে উঠল। সুন্দর মুখটা মুহূর্তে শুকিয়ে কালো হয়ে গেল। সুনন্দ কিন্তু অবিচলিতভাবে একবার রতির নিচু করে রাখা মুখটা দেখল। মনে হল, তার সায় আছে।

অতএব সুনন্দ ঠান্ডা গলায় বলল—বেশ। একদিন গিয়ে নিয়ে এসো। আমি দিয়ে দেব। আচ্ছা, গুডবাই। বলে সুনন্দ উঠে দাঁড়িয়ে লক্ষ করল, আরতি ঘরে নেই। বাইরে বারান্দায় বেরিয়ে বাঁক নেবার সময় দেখল, আরতি বাঁকের আড়ালে দাঁড়িয়ে দেয়াল ধরে কাঁদছে।

—একী তুমি এখানে! অবাক হল সুনন্দ।

আরতি ধরা গলায় বলল—আপনি রাজি কেন হলেন সুনন্দদা! আইদার অনঙ্গ উইল ডেস্ট্রয় ইওর পেইন্টিং অর হি উইল সেল ইট। প্রচণ্ড মদ খায় অনঙ্গ। দিদির কাছে এখনই হাজার টাকা হাত-খর্চা নেয়। আউট অ্যান্ড আউট হি ইস আ স্কাউন্ড্রেল।

—তোমার দিদি চাইল তো!

—চাইলেই দিতে হবে!

—এই ছবিটা তোমার দিদির সেকেন্ড আইডেনটিটি।

—আর আপনার বুঝি কিছু নয়?

—তোমার দিদিই যত্ন করে রাখতে পারবে।

—তা দিয়ে আপনার কী হবে?

—তা তো জানি না আরতি। ওটা ধ্বংস হওয়াই তো ভালো। আমার কাছে থাকলে, আমি ওটা পুড়িয়ে দিতাম।

—মন থেকে বলছেন?

—হ্যাঁ, বলছি।

—তাহলে ওটা আমাকেই দিন না কেন!

—তুমি কী করবে?

—আমি রাখব।

—কেন?

—বা রে! সবাই কি ফেলে দেয় নাকি!

সুনন্দ চমকে উঠে দ্রুত বাঁক পেরিয়ে হাঁটতে লাগল। বাড়ি ফিরে মনে মনে একেবারেই ভেঙে পড়ল।

মাকে সুনন্দ একদিন বলল—তোমাকে মা ভালো করে খেতে দিতেও পারি না। টেলিফোনের কানেকশন কেটে দিয়েছে এক্সচেঞ্জ। বউ থাকলে খাওয়ার সুখ থাকত। তাই বলে পায়ে ধরে রতিকে ডাকলে সে কি আসত? আমি তো জানি, সবাই বেশ মজা পাচ্ছে। ছোটমাসি পর্যন্ত কী সব বলে গেল....দ্যাখো, যার রোজগার নেই, সে নপুংসক মা। আমি লজ্জা কেন করছি! কাজের মেয়েটাও চলে গেল। রাখতে তো পারতাম না, মাইনে দেব কোত্থেকে!

অনঙ্গ এল। সঙ্গে আরতি কেন এসেছে? অনঙ্গ ছবিটা সিঁড়ি দিয়ে নামাতে নামাতে বলল—বেশ ওজন আছে দাদা! আপনার মতো মানুষ এ জিনিস চোখের সামনে রেখে কী করত? জ্বালা করত বুকটা, তাই না?

—তুমি থামো অনঙ্গ। নিয়ে যাচ্ছ যাও। কথা বোলো না। বলে সুনন্দ নীচে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ল। মা আর ছেলে পাশাপাশি মূক হয়ে বসে রইল খাটে। সুনন্দর যৌবনকেই যেন ডাকাতি করে নিয়ে চলে গেল অনঙ্গ।

বেশ খানিক সময় বয়ে গেছে মোটামুটি নিঃশব্দে। হঠাৎ দরজা ঠেলে আরতি মুখ বাড়াল। ভয়ে কেমন আঁতকে উঠল সুনন্দ। 'কে' বলে চমকালো। তা দেখে আরতির

চোখে জল এসে পড়তে চাইছিল। ও ঢুকে এল ভিতরে।

মায়ের কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল—তুমি রান্না করবে না মাসি?

—আমাদের সব বাড়ন্ত ভেবো না আরতি। আছে। দু'জন মাত্র লোক। ঠিক দু' মুঠো জুটে যাবে। কথা হচ্ছে, বিভাস আমাদের দেখাশুনা করছে। আমরা মরব না। আচ্ছা, এসো তুমি। বলে উঠলেন দৃষ্টিহীনা মা।

আরতি বলল—আমি এসেছিলাম অনঙ্গকে বিশ্বাস করি না বলে। ও যদি আরও কিছু নিয়ে যায়!

সুনন্দ বলল—কী আর নেবে? আমার ছবি তো বিক্রি হয় না, যাক্ না নিয়ে। পারলে তুমিও নিয়ে যাও। আমি তোমার দিদির কোনও কিছুই আর সহ্য করতে পারি না। সমস্ত ছাই হোক।

মাথা নিচু করে দরজার কাছে চলে এল আরতি ঝা। থেমে পড়ে বলল—আমিও তাহলে নিয়ে যাচ্ছি সুনন্দদা। হাতের কাছে যা পাব, সব নেব।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, যাও। নিশ্চিহ্ন করো, রেখো না কিছু। পুড়িয়ে দিও। আমি তো পারলাম না। বলে দু' হাতে মুখ ঢেকে ফেলল সুনন্দ।

বিভাস পাইন সব শুনে বললেন—আমি তোমাকে সেই কবে ছবিটা 'কিল' করে দিতে বলেছিলাম। ওটাকে ছিঁড়লে পারতে, ছেঁড়ার আনন্দ আছে। হত কী, বিদ্বেষ জাগত, তাই থেকে জন্মাত তোমার ছবির নতুন ভাষা।

—কোথাও তা নিশ্চয় পুড়ছে বিভাসদা।

—বেশ, তাহলে এবার শুরু করো।

রাত্রে মায়ের খাটে প্রদক্ষিণ করলাম বাঘের মতো। মাকে খাটের মাঝখানে রাখলাম। পাক দিতে দিতে বললাম—মা তোকে আমি ঘৃণা করি মা। জন্মজরায় যৌবন দে বনদেবী, আমাকে দেখবার চোখ দে, আমি ঘৃণার বিদ্যুৎ ভক্ষণ করি, তোর গর্ভকে ছিঁড়ে ফেলে একবার সৎ-উৎসে মুখ দেখি মা!

মায়ের বার্ধক্যের লোল আন্দোলিত হল অন্ধ দেহে। মা হাউমাউ করে কেঁদে ফেলল। ভোরে ক্যানভাসে তুলির পোঁচ পড়ল। ছবি আঁকা হলে বিভাসদা দেখে বললেন—এই মুখটা তো রতির। এ কেন?

এই মুখ আর সরতে চাইল না। বিভাসদা বললেন—নতুন মেয়ে আনো, নতুন মুখ আনো।

—কোথায় পাব?

—সস্তায় মডেল ভাড়া করো। নাগরিক মধ্যবিত্তের ত্বককে, আদিবাসী করুণ স্বচ্ছ বিশ্বস্ত চামড়া দিয়ে ঢেকে দাও। বেশ্যার পায়ে মাথা রাখো, গো টু দি ব্রথেল।

বেশ্যার মুখে, আদিবাসী মুখে রতিই আভাস হেনে ঝিকিয়ে উঠল।

বিভাস পাইন বললেন—বেশ, উল্টো দিক থেকে ভাব এবার। সমস্ত অনাদৃত মুখে রতির মুখকে তুমি ভেঙে দিচ্ছ। বিদ্বেষের এটাও একটা আঙ্গিক।

—কী কষ্ট বিভাসদা! আমি যে পারছি না! আমি জানি, আমি কী করছি! শুনে বিভাসদা গম্ভীর হয়ে গেলেন।

তবু খানিকটা নাম হয়ে গেল সুনন্দর। সমালোচকরা লিখলেন, সুনন্দর ছবিতে নূতন ভাষা, তাঁর নিজস্ব কণ্ঠস্বরের আভাস এই প্রথম। সুনন্দর ছবির একটুখানি বাজার তৈরি হল। এই রকম একটি দিনে আরতি এক দুপুরে তার দিদির বাড়ি গিয়ে দেখল, বাড়ির বাইরের ঝুলন্ত বড় তালাটি ভাঙা। আশ্চর্য হয়ে ভিতরে ঢুকে দেখল, অনঙ্গ সেই নগ্ন ছবিটা দেওয়াল থেকে পেড়ে নামাচ্ছে। দিদি বাড়ি নেই।

—এ তুমি কী করছ অনঙ্গ?

—দেখছ না ডাকাতি করছি!

—তালা ভেঙেছো!

— ভাঙব না?

—তুমি কী করতে চাও? কী করবে, ছবিটা কোথায় নিয়ে যাবে?

—এ জিনিসের দাম উঠেছে শুনলাম। বাজারে ঝেড়ে দেব মাল। তোমার দিদি তো আর দেখে না আমাকে। এক মাড়োয়ারি কিনবে বলেছে। পেইন্টিঙের ট্রেডার।

—রাখো।

—কেন রাখব? কী দিচ্ছে এটা আমাকে? এতে সুখ নেই আরতি। এ শরীর নিবে গেছে। দেখে দেখে হদ্দ হয়ে গেছি। এটায় যা আছে, তোমার দিদির বডিতে তাই আছে নাকি! স্রেফ ধাপ্পা।

—নেই?

—না।

—কত দাম দেবে বলেছে?

—কে? ওই মাড়োয়ারি? আগে দেখাই তো!

—কত চাও তুমি?

—কেন, তুমি দেবে নাকি!

—আগে, বলো, কত চাও?

—তুমি নিলে সস্তায় হবে। দশ হাজার।

—তাইই পাবে।

আরতি তার বিয়ের জন্য জমানো সোনার অলংকারের দু'একটি চুপচাপ বেচে দিল। ছবিটাকে তারপর এক নিঃশব্দ দুপুরে সুনন্দর ছাদের ঘরে পৌঁছে দিয়ে এল। একটা ছোট চিরকুট লিখে ছবিটার তলায় কাঠের বর্ডারে আঠা দিয়ে সেঁটে দিল। লিখল—'আপনি এখন পোড়াতে পারেন।'

সুনন্দ বাড়ি ছিল না। বিভাসদার ওখান থেকে ফিরতে ফিরতে ভাবছিল, রতির নগ্নপাঠগুলি ট্রাঙ্কে আছে। ওইগুলি পোড়ালে কি মন থেকে রতি মুছে যাবে? যাবে না? নাকি নগ্নতার বাস্তব, যা পাঠের মধ্যে প্রথম দিকে অনেক প্রকট ছিল, যা একটু একটু করে

বিমূর্ত মোহাবরণে তীব্র হয়ে উঠছিল, সেই অনুকৃত মাংসল বাস্তব থেকে আবার জেগে উঠতে চাইবে রতি? দু'শো-আড়াইশো ন্যুড, সেও তো অসম্ভব তৃষ্ণা, ক্রমান্বয়ে দেহের বিভঙ্গ, যাতে রোমকূপ পর্যন্ত স্পষ্টতা চেয়েছে, নারীর প্রধান যৌনাঙ্গ, যা একটি সৎ ত্রিভুজ, নগ্নিকার অনুশীলনেপেয়েছে আশ্চর্যপ্রত্যক্ষ শক্তি—এর সামনে দাঁড়ালে সুনন্দর অতৃপ্ত অক্ষম বাসনা কি সহস্র আগ্নেয়গিরি জ্বালিয়ে তুলবে? আমার ছবি অনঙ্গর দেওয়ালে পর্নগ্রাফির কাজ দেয়, রতির আসঙ্গ লিপ্সা ঘন করে তোলে। এ যে কী অসহায় ঈর্ষা! ধীরে ধীরে এই ঈর্ষা মানুষকে পাগল করে। আজ যদি রতি আমাকে বিচ্ছেদের পর প্রত্যেক আঁচড়ে, রঙের সামান্য ইশারায় ডাকে, আমি উদ্ভ্রান্তের নেশায় ছুটে যাব। আবার ছুটে যাব?

বাড়িতে পা দিয়েই মায়ের গলায় শুনতে হল—আরতি এসেছিল সুনন্দ। দুপুরে। তোকে বলিনি, মেয়েটা মাঝে মাঝেই আসে। তুই নেই জেনেই আসে। বোধহয় মোড়ের দোকানে খোঁজ নিয়ে চলে আসে।

—কেন আসে?

মা চুপ করে আছে দেখে সুনন্দ বলে—আরতি ছেলে মানুষ। বয়েস কম, রতি আর আমার ডিভোর্স সহ্য করতে পারেনি।

মা বলল—দুপুরে এসে ঘরগুলো ঝাঁট দেয়। বিছানাপত্তর গোছগাছ করে। রান্না পর্যন্ত করে দেয়। তারপর বলে, 'আমাকে তোমার কাজের মেয়ে করবে মাসি! পেটভাতায় খেটে দেব।'

—পাগল!

—এই রকম পাগল মেয়েই ভালো। আচ্ছা, আরতি দেখতে কেমন বল তো সুনন্দ?

—কেন বলো তো?

—না না। তোকে এমনিই শুধোচ্ছি।

—তুমি কেমন দেখলে?

—এড়িয়ে যাওয়ার জন্য তুই অন্ধকে ঠাট্টা করছিস!

—তুমি ভুল পথে এগোচ্ছ মা! রতি বলেছে, আমার হচ্ছে, মুখহীন পিপাসা, জল আছে, অথচ কেমন করে খেতে হবে জানি না। তুমি বরং আরতিকে একথা বলে দিও। ও আসছে, ও তাহলে আর আসবে না। বলে ছাদের উপরে চলে যায় সুনন্দ।

আঁকার ঘরটায় শেকল তোলা। তালা লাগানো নেই। তার মনে হচ্ছে, সে তালা দিয়েছিল। কেউ কি ঢুকেছিল ঘরে? ভিতরে ঢুকেই বিস্ময়-বিমূঢ় এবং স্তব্ধ হয়ে পড়ে সুনন্দ। দেওয়াল জুড়ে নগ্ন রতি। এই ছবিটাকে ছেড়ে কোথাও তুমি যেতে চাওনি রতি। অথচ কত সহজেই না চলে গেছ!

পাগলের মতো নীচে নামে সুনন্দ। মাকে কোনও কথা না বলে বাড়ির কাছের একটি টেলিফোনের দোকানে আসে। পয়সা দিয়ে এখানে টেলিফোন করা যায়। কাচের ঘরটায় ঢুকে পড়ে। এখানে এখন একটিও খদ্দের নেই।—হ্যালো আরতি! তুমি এ ছবি

কীভাবে আমার এখানে আনলে!

—কিনলাম। গহনা বেচে।

—কেন? উত্তর দাও।

—আমি লিখে রেখে এসেছি, দেখে নিন। তাছাড়া....

—তাছাড়া কী....

—ওই ছবি নিয়ে অনঙ্গর সঙ্গে দিদির খুব মন কষাকষি হত। দিদি আমাকে বলেছে, ও আর পারছে না। অনঙ্গ প্রথমে বিশ্বাস করলেও, পরে বলত, আপনি ইমপোটেন্ট নন। তার মানে, দিদির ভার্জিনিটি আপনিই নষ্ট করেছেন। দিদি অনঙ্গকে বলেছিল, আপনাদের সহবাস হয়নি। অনঙ্গ এখন দিদিকে বলছে, 'তুমি মিথ্যুক'। অতএব ওদের সম্বন্ধ বিষাক্ত হয়ে গেছে। অনঙ্গ ছবিটা এক ব্যবসায়ীর কাছে বেচে দিচ্ছিল।

—তুমি তাই কিনে নিলে?

—আমারও মনে হল, এই ছবিটার ছাই হওয়াই নিয়তি। এ আপনার হাতে পুড়ে যাক।

—অসম্ভব। বলে কাচের ঘরে জ্বলন্ত আর্তনাদ করল সুনন্দ। তারপর নিজেই অবাক হল। এবং কেঁদে ফেলল।

ওপারের কণ্ঠস্বর বলল—কেন অসম্ভব? আপনি তো তাইই চাইছিলেন। এতেই আপনার মুক্তি।

—নাহ্। তুমি ছেলেমানুষ, আমাকে ভুল বুঝেছ। আমাকে বিভাসদাও বুঝতে পারেনি আরতি। এ কেমন মন আমার! বলে কান্নাকে দমাতে চায় সুনন্দ। পারে না।

—আমি ঠিকই বুঝেছি আপনাকে। আমি অনাঘ্রাতা, এখনও আমি মিথ্যা বলতে শিখিনি সুনন্দদা। আমি আর দিদি, একই মাতৃগর্ভ থেকে এসেছি, আমাদের ত্বক একই রকম। মন আলাদা। আমাকে আঁকুন। আমাকে দিয়ে দিদিকে ঢেকে দিন আপনি। আমি আসব?

—না। আসবে না। অনঙ্গকে বলে দাও, আমি রতির প্রথম আঘ্রাণ, আমিই সব। ও কেউ নয়।

—আপনি পুড়িয়ে দিন।

—না, পারব না। এই একটা ছবি চিরকাল আমার কাছে থাকবে।

—কী হবে ওতে? কী আছে? আমি ওর চেয়ে অনেক সুন্দর সুনন্দদা।

—ওই ছবিটাকে আরও উন্নত করব আমি। আমি যত জরাগ্রস্ত হব, ওই ছবি ততই যৌবনে পৌঁছবে। আরও যৌবন, আরও প্রাণ, আরও লাবণ্য। এই ছবিই আমার আশ্রয় হবে আরতি। এই ছবির চেয়ে সৎ কিছুই আর হবে না।

ওপারের কণ্ঠস্বর এবার একটু একটু করে ফুঁপিয়ে উঠল।

—তুমি কেঁদো না। তুমি সুখি হও। সুনন্দ একথা বলা মাত্র ফোঁপানি আরও বেড়ে উঠল।

—আমি তোমাকে ভালোবাসি সুনন্দদা।

—এই গলায় এমনি করে রতিও একদিন....

—আমি ভালোবাসি সুনন্দ। আমাকে আসতে দাও।

———তা হয় না।

—রতি পাগল হয়ে গেছে সুনন্দ। তুমি ওকে চিনতেই পারবে না। একবার তাহলে তাকে ডাক।

—না।

—কেন?

—আরতি, এবার আমি ছেড়ে দিচ্ছি! তুমি অবুঝ। আমার জীবনটাকে তোমার বোঝার কথাই নয়। তুমি ছেলেমানুষ। তোমার ত্বক, তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার শুদ্ধতা—সবই একদিন রতিরও ছিল।

টেলিফোনের ওপারে একটি গাঢ় কামনা তীব্র দমনে কাঁপছিল, অনেকটাই যেন রতির প্রথম প্রেম। আশ্চর্য হল সুনন্দ, তার শরীরে কামনা ভরে উঠল, সমস্ত ত্বক সজাগ হল, সর্বাঙ্গে ছুটে বেড়াতে লাগল অপূর্ব মাদক অনুভূতি। মনে হল, একবার ডেকে নেয় আরতিকে। অদ্ভুতভাবে কাঁপছে লোকাল ফোন, ফোনের কাচঘর। কান পেতে থাকতে থাকতে আমি সুনন্দ, শুনতে পেলাম, একটি পাগল মেয়ের অকূল দিকহারা, বুক বিদীর্ণ করে ওঠা হাসি, যেন পৃথিবীর সমস্ত টেলিফোন বুথের কাচ ভেঙে পড়ছে।

সহসা শিহরিত হলাম। এবং চিৎকার করে উঠলাম—কে তুমি? এতক্ষণ কথা বললে কে তুমি? হ্যালো, তুমি কে? প্লিজ কথা বলো, তুমি কে? হ্যালো, হ্যালো....

টেলিফোন দিল না উত্তর।

আমার মতো একটা লোক

ডাক্তার বসুরায় একজন সাইকিয়াট্রিস্ট। আনন্দীকে দেখেই উনি চিনতে পারলেন। ডক্টর মিত্রের বাড়িতে অন্তত দু'দিন উজ্জ্বল শ্যামা ছিপছিপে গড়নের এই মেয়েটিকেই নিশ্চয় তিনি দেখে থাকবেন। শ্যামবর্ণ দীর্ঘাঙ্গ মেয়েটির নাম যে আনন্দী সে কথাও তাঁর সহজে মনে পড়ল। আনন্দী নামটাই কিছু অদ্ভুত ঠেকে। তাছাড়া মেয়েটি ডক্টর মিত্রের ভাগ্নী এবং এই মুহূর্তে যে কথা ভাবতে বসুরায়ের খানিকটা লজ্জা করছিল, তা হল, ডাঃ এম. এস. মিত্র আচমকা অবাক করে দিয়ে একটা সচকিত প্রস্তাব প্রায় অসংকোচে উত্থাপন করেছিলেন ; রীতিমতো অপ্রস্তুত হওয়ার জোগাড় হয়েছিল সেদিন। সিদ্ধার্থ বসুরায় প্রথমে কী জবাব দেবেন ভেবে পাননি।

আনন্দী তার এক পুরুষবন্ধুকে সঙ্গে করে চেম্বারে ঢুকে এসেছে। এখানে আসার আগে সে টেলিফোনে কোনও ধরনের সংযোগ করেনি। এসে নাম লিখিয়ে অপেক্ষা করেছে। তার মানে আনন্দী ডক্টর মনোসুধা মিত্রের বাড়িতে বসুরায়কে দেখে থাকলেও মনে রাখেনি এবং মনোসুধার সঙ্গে সিদ্ধার্থর সম্বন্ধ বিষয়ে আনন্দীর কোনও ধারণা নেই।

মনোসুধা বলেছিলেন—মা-মরা মেয়ে, বুঝলে সিদ্ধার্থ, আমার কাছেই মানুষ হচ্ছে, ওর বাবা, আমার বোনটার মৃত্যুর পর, হঠাৎ একদিন দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করল। একটা নার্সকে বিয়ে করে চক্রধরপুরের একটা হাসপাতালে চলে গেল। সেই থেকে বাবা দূরে দূরেই রইল। ওয়েস্ট বেঙ্গলে ফেরার জন্য সেই মানুষটা চেষ্টাই করেনি। তুমি মনের ডাক্তার, তুমিই হয়তো বুঝবে, মেয়েকে এইভাবে দূরে রেখে সুকান্ত বোধহয় আমার বোনটাকে ভুলতে চেয়েছে। আনন্দী মায়ারই মতো দেখতে হয়েছে কিনা।

—ওহ্, একেবারেই মায়ের মতো বলছেন? প্রশ্ন করেছিলেন সিদ্ধার্থ।

—অবিকল। আমি তো ভাবি, মায়াই আমার সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আলাপ করবে? ডাকব?

—না, না, থাক।

—মায়া দুর্ঘটনায় মারা যায়, তোমার স্ত্রীর মতো। সিদ্ধার্থ, তোমাকে আমি আঘাত দিলাম কি!

সিদ্ধার্থর মনে পড়ছে তিনি কী বলেছিলেন। তাঁর চোখের সামনে মনের ভিতর যেন এক লক্ষ স্টোভ বিস্ফোরিত হয়ে ঝলসে উঠেছিল। সেই বিস্ফোরণ মানুষ সহ্য করতে পারে না।

সিদ্ধার্থ কেন যেন একটি আশ্চর্য বাক্য স্ফুরিত করেছিলেন—রমা আনন্দীর

বয়সেই মারা গেল তো, ওই বকম ছিপছিপে, শ্যামবর্ণ, বোধহয় মায়া আর রমা একই বকম ছিল কাকাবাবু!

—কী বলছ সিদ্ধার্থ!

—আপনার কষ্ট আমি বুঝি কাকাবাবু!

—তোমাকে আঘাত দিলাম! তুমি আনন্দীর সঙ্গে কথা বলবে?

—না, না!। আমাদের মধ্যে ওকে আবার কেন?

—ওই যে বললে, মায়া আর রমা একই রকম ছিল। অথচ তুমি আর সুকান্ত কত আলাদা!

—সে তো হয়ই, দু'জন মানুষ কিছুতেই এক রকম নয়, কাকাবাবু! আমরা এক করে দেখতে ভালোবাসি।

—বুঝেছি! বলে মুখটাকে বিরস করে তুললেন ডা. এম. এস. মিত্র। ডাক্তার বসুরায় সোফা ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠেছিলেন। ডাঃ মিত্র সমুখে উঠে দাঁড়ানো সিদ্ধার্থর মুখে চোখ রেখে বললেন—তুমি কিছুতেই রমাব সঙ্গে কাউকে এক হতে দেবে না। ভালোবাসা কি মানুষকে এতটাই কঠিন করে তোলে! মাযাকে বমার কাছাকাছি এনেই মুহূর্তে তুমি দুবে ঠেলে ফেলে দিলে।

—মায়াকে নয় আনন্দীকে কাকাবাবু!

—ওহ্ ইয়েস। দেয়ারস্ ইউনিক ওযাননেস বিটুইন টু—মা আর মেয়ে। বলে সোফা ছেড়ে চকিতে প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়ালেন ডাক্তার মিত্র এবং বলে উঠলেন—আনন্দী তোমার অযোগ্য হত না সিদ্ধার্থ। আমার প্রোপোজাল ভেবে দেখো। আনন্দী আর রমা।

চমকে উঠে থম মেরে রইলেন সিদ্ধার্থ। কী বলবেন ভেবে না পেয়ে বললেন—কী বলছেন! আমার তো বয়েস হয়েছে!

—নিজেকে বুড়ো ভাবাটা তোমার বাতিক। কত বয়স তোমার?

—আটচল্লিশ।

—সেটা কোনও বাধাই নয়। আচ্ছা বেশ, আমি আনন্দীকে জানতে চাইব। ও যদি রাজি থাকে, মানে করাতে পারি, তুমি তাহলে না করবে না।

—প্লিজ কাকাবাবু, আপনি কাউকে জোর করবেন না। রমার উপর জোর করেছিলাম বলেই বোধহয় ওকে হারিয়েছি। ও বিয়ের জন্য আরও কিছুটা সময় চেয়েছিল। আমি চাপ দিই, আমি শুনিনি। শুনলে স্টোভ বার্স্ট করত না। আমার কথাটা ভেবে দেখবেন।

সিদ্ধার্থ বুঝতে পারেন, তিনি কিছুটা পুরনো ধরনের মানুষ। নিজেকে বুড়ো ভাবতে ভালোবাসেন। অথচ রোগ সারাতে তাঁকে মনের অনেক জটিলতা আজকের সংকটের সঙ্গে মিলিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে হয়। আগে যেমন নরনারীর প্রেম ছিল সহজ উপলব্ধির বিষয়। তারা জানত, কে কাকে কেন ভালোবাসে, ভালোবাসা সেদিন ছিল একটা মস্ত

ব্যাপার। কাউকে জীবনে না পেয়ে পাগল হত মানুষ। আজকাল ঠিক উলটো ঘটনা দেখা যাচ্ছে, কাউকে জীবনে পেয়ে একটা ছেলে বা মেয়ে পাগল হয়ে যাচ্ছে। প্রেম বুঝলেই ইদানিং চলে না, অপ্রেম নামে এক ধরনের পদার্থ প্রেমের সঙ্গে থাকে, সেটাকেও বুঝে উঠতে হয়।

সম্মুখের দুটি ছেলেমেয়ের কে রোগী বোঝা যাচ্ছে না। আনন্দী যদি কোনও বিপাকে পড়ে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, এ মেয়ে রমা নয়। কারণ রমার কোনও মনের অসুখ ছিল না।

—আমার এই বন্ধুটাকে একবার দেখবেন ডাক্তারবাবু! আমি আনন্দী আর ও হল অভিনব। ওর রাত্রে একদম ঘুম হয় না, দিনদিন কেমন শুকিয়ে যাচ্ছে। পড়াশুনা করতে পারছে না। ঘুমের মধ্যে প্রত্যেক রাতে ভয়ংকর সব স্বপ্ন দেখে। মাঝে মাঝে অকারণ উত্তেজিত হয়ে পড়ে। উত্তেজনা চরমে পৌছলে জ্ঞান হারিয়ে ফেলে। তখন মনে হয়, ও বোধহয় বেঁচে নেই। আমি তো একদিন ভয়ে চিৎকার করে কেঁদে ফেলেছিলাম।

—দাঁত-কপাটি লাগে?

—আজ্ঞে এই দেখুন।

আনন্দী তার ডান হাতের তর্জনী দেখাল। তর্জনীটা দাঁতে স্পষ্ট করে কাটা। আঙুলটা অন্য আঙুলগুলির তুলনায় শুকিয়ে সরু হয়েছে কি? তাই অমন করে দেখাচ্ছে?

আনন্দী ঈষৎ ভেজা গলায় বলল—অভি আঙুলটা দাঁতে পিষে শেষ করে দিত ডাক্তারবাবু। এখন শুকিয়ে যাচ্ছে।

—আঙুলটার জন্য ডাক্তার দেখিয়েছ?

—না।

—কেন দেখাওনি?

—ভেবেছি এমনিই ভালো হয়ে যাবে। এখন দেখছি আঙুলটা শেষ হয়ে গেল।

—না, যায়নি। আচ্ছা, যদি যায়ই, তোমার কি খুব কষ্ট হবে?

—আচ্ছা ডাক্তারবাবু, মানুষের কি বিষ আছে?

—আছে।

—ডাক্তারের গলায় নিশ্চিত 'আছে' শুনে আনন্দীর চোখ বড়বড় হয়ে ওঠে। সিদ্ধার্থ হঠাৎ অভিনবকে প্রশ্ন করে ওঠেন—আচ্ছা অভিনব, সত্য করে বলো। আনন্দীর আঙুলের স্বাদ কেমন?

অভিনব অদ্ভুত বর্ণনা করল—আমি গাঁয়ের ছেলে, তাই বলছি। ঠিক বোঝাতে পারব না, তবে স্বাদ বলছেন যখন, তাহলে বলি, খেজুরের মেথির মতো, মানে মৌজ যে-রকম আর কী, খেজুর গাছের মগজ খেয়েছেন কখনও? আশ্চর্য ঘ্রাণ আর নরম।

—মেথির গন্ধটা ঠিক কেমন?

—অদ্ভুত।

—মেয়েদের শরীরে এই ধরনের কাছাকাছি কোনও গন্ধ থাকে?

—কোনও কোনও দুর্লভ কিশোরী মেয়ের হয় বোধহয়। কারও বা আমকুশির মতো হতে পারে। তবে মৌজের গন্ধ মানে মেথিঘ্রাণ আসে আরও কিছুটা ডাঁটো হলে।

—তুমি কবিতা লেখো?

—আপনি কী করে জানলেন?

—ওই যে দুর্লভ মেথিঘ্রাণ, এ রকম ভাষা তো সচরাচর দেখি না। আমি এককালে লিখতাম। তোমার বই আছে?

—হ্যাঁ।

—নিয়মিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়....

—ছাপা হয়।

—ওহ্, তাহলে তুমি....

ডাক্তারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে আনন্দী বলে উঠল—ওর বেশ নামডাক আছে ড়াক্তারবাবু।

সিদ্ধার্থ সামান্য হেসে বললেন—সে তো বুঝতেই পারছি। ঠিক আছে, অভিনব, তুমি তাহলে তোমার বই আমাকে পড়তে দিও।

—আজ্ঞে দেব।

—আচ্ছা, তুমি কি জানো অভিনব, লেখক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃগী রোগ ছিল? উনি অনেক সময় লেখার কাজ করতে করতে অজ্ঞান হয়ে যেতেন। সেই ভয়ে তিনি হাতের কাছে একটা ঘণ্টা রাখতেন। অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছেন বুঝে বেল টিপে আওয়াজ দিতেন। বাড়ির লোক ছুটে আসত। কিন্তু তোমাকে আমি ঘণ্টা বাজিয়ে লোক ডাকবার কথা বলি না। তোমাকে বলি....বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইলেন ডাক্তার সিদ্ধার্থ। দৃষ্টি নামিয়ে টেবিলের উপর রাখলেন।

আনন্দী সভয়ে জানতে চাইল—অভির কি তাহলে মৃগীই ডাক্তারবাবু?

—এক ধরনের মৃগীই তো বটে। আচ্ছা অভিনব, তোমার বাবা কী করেন?

—মাড়োয়ারির গদিতে খাতা লেখেন।

—কোথায়?

—হরিদেবপুরের একটা দোকানে।

—মা কী করেন?

—মা। সেলাইয়ের কাজ।

—ভাইবোন?

—ওরা মানুষ হবে না। ভাইটা সাইকেল সারাইয়ের দোকানে মিস্ত্রি। পড়াশুনায় মন ছিল না। ফেল করত। নিজেই কাজ জোগাড় করে নিয়েছে। বোনের কথাটা আনন্দীর সামনে বলব না।

—বলবে না?

—আপনাকে আলাদা করে বলতে চাই।

—তোমরা তো বন্ধু। একসঙ্গে পড়ো?

—হ্যাঁ, ইউনিভারসিটিতে। আর তিনচার মাস আমাদের দেখা হবে। সামনেই পরীক্ষা। পাশ করলে হয় স্লেট-নেট অথবা স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় বসা, নতুবা কিছুই না। বেকার। নম্বর তো লাগবে। সবই খুব অনিশ্চিত। তবে হ্যাঁ, কবিতা থাকবে। কবিতা আমাকে ছেড়ে যাবে না।

—শুধু কবিতা দিয়ে কি মানুষের চলে অভিনব? আমি ঠিক জানি না।

—চলে ডাক্তারবাবু। কারও কারও দিব্যি চলে যায়। আমার কিছু বন্ধু আছে, তারা কবিতা আর টিউশন করে। হোল লাইফ বেকার। কারও কাছে কিছু চাইতেও জানে না। বলে মাথা নিচু করল অভিনব।

মাথা নিচু করে কোনও এক অজ্ঞাত অপরাধে অভিনব কিছুক্ষণ চুপ করে রইল। অভিনেতা অমিতাভ বচ্চনের মতো লম্বাটে মুখ, খাদালো চোখে তন্ময় দৃষ্টি, শরীরের ধাঁচাটা করুণভাবে বলিষ্ঠ। মুখে খোঁচাখোঁচা দাড়ি, কখনও বোধহয় যত্ন করে চুল আঁচড়ায় না। পরনে সরু ফাঁন্দার জিনস প্যান্ট, যেন নীল ধুলো মাখানো, গায়ে বেনিয়ান জ্যাকেট টাইপের জামা, কাঁধে ঝোলানো সুতির ব্যাগ, পায়ে শস্তা চটি, কব্জি খালি, ঘড়ি নেই।

আচমকা মুখ তুলে অভিনব বলে উঠল—আমার বোনটা কিন্তু বোবা। গরিবের বোবা মেয়ে, বিয়ে হবে না। নাই-ই বা হত, কিন্তু হল অন্য ব্যাপার। বিয়ে না হলেও বোনটার গর্ভ হয়ে গেল। বোবা তো, বলতে পারল না কী করে তার সর্বনাশ হয়েছে। গোপনে আমরা অ্যাবরশন করালাম, মানে আমাকেই করাতে হল। সেই অশান্তি কী সাংঘাতিক!

—তারপর?

—তারপর বিন্দু কোথায় চলে গেল, আমরা জানি না। বোনটা হয়তো মারা পড়েছে বা রূপাজীবা হয়েছে। ও নেই, কিন্তু পাড়ায় ওর বদনাম আছে, হাওয়ায় কিছুদিন আমরা কান পাততে পারিনি।

—রূপাজীবা কী?

—সাধু বাংলা, মানে বেপাড়ার মেয়ে। আমি মনে মনে ওর দোষ কাটাবার জন্য রূপাজীবা বলি। শব্দ বা অক্ষরই তো আমাকে বাঁচিয়ে রাখে! শব্দের সাধুতা দিয়ে আমি পতিতাকেও সম্মান করতে পারি। আমার বোবা বোন সুন্দরী ছিল। আমার এক গহরা দোস্ত পেইন্টার প্রণয়কে বিন্দুর উপর ন্যুড স্টাডি করতে বলেছিলাম। ভয়ে বেচারি পালিয়ে বেঁচেছে। হাহাহা। দেখুন ডাক্তারবাবু, আমার সঙ্গে কারও মিলবে না। আমাকে আনন্দীও নানাভাবে ভয় করে। সবই বলে ফেললাম, আলাদা করে আপনাকে বলার কিছু নেই। বলে থামল অভিনব।

ডাক্তার সিদ্ধার্থ অপলক বিস্ময়ে অভিনবকে চেয়ে চেয়ে দেখছিলেন। আনন্দীর চোখেমুখে স্তম্ভিত আবেগ যেন দিশে পাচ্ছে না, গলায় চাপা উত্তাপ ছড়িয়ে বলে ওঠে—এই সব কথা আমাকে তো বলনি কখনও?

অভিনব বলল, বলিনি। লিখেছি।

—কোথায়?

—উত্তরবঙ্গের একটি লিটলম্যাগে আড়াল রেখে লিখেছি। বিন্দুর নাম সেখানে তাপসী। চিত্রকরের নাম ধীমান।

—গদ্য?

—না, কাব্যনাট্য।

—কই আমাকে দাওনি তো?

—না।

—কেন?

চুপ করে রইল অভিনব। সিদ্ধার্থ প্রশ্ন করলেন—মনে করতে পারো, কবে হঠাৎ অজ্ঞান হয়ে পড়লে? বিন্দু চলে যাওয়ার পর?

—হ্যাঁ, হঠাৎ-ই একদিন। বিন্দু এক রাতে স্বপ্নে এসে বলে গেল, দাদা, তোকে আমি আমার রোগটা দিয়ে গেলাম, তুই নে। যখন দম পাবি না, বুঝবি, আমি তোর মধ্যে এসেছি। একমাত্র আমার স্বপ্নে বিন্দু কথা বলতে পারে এবং খুবই বিষণ্ণ লাগে, যখন বুঝি আনন্দীর গলায় তাপসী কথা বলে যাচ্ছে। কারণ তো একটাই, বিন্দুর নিজের কণ্ঠস্বর ছিল না। চৈতন্য হারাতে পারলে আমি আরাম বোধ করি ডাক্তারবাবু!

—ও, আচ্ছা!

সালোয়ার-কামিজ পরা আনন্দী বুকের কাছের উড়নি ঠিক করতে করতে বিমূঢ় ভঙ্গিতে দুই চোখ কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ করে ফেলে। এই সমস্ত কথা এতদিন তাকে ঘুণাক্ষরেও বলেনি অভিনব।

—তোমার কাব্যনাট্যের নাম কী? দু'চোখ বন্ধ রেখেই জানতে চাইল আনন্দী।

—ওই অসহায় বোবা মুখে আমি আনন্দীর কণ্ঠস্বর শুনব ভাবিনি। কেন এমন হল? অবচেতনে কী আছে আমার? আমি তো ঘুমাতে পারি না। বলতে বলতে মুখমণ্ডলে ঘাম দেখা দেয় অভিনবর।

—অক্ষর তোমাকে রক্ষা করবে অভিনব। বললেন সিদ্ধার্থ। একথা শুনে শব্দ করে হেসে উঠল অভিনব।

এবং হাসতে হাসতে বলল—আপনি ঘাবড়ে গেছেন ডাক্তারবাবু, নইলে আমারই কথা আমাকে ফিরিয়ে দিতেন না, ওষুধ দিতেন।

—না, না, তা নয়। বলে উঠলেন ডাক্তার বসুরায়।

ডাক্তারের কথা অভিনব কানেই নিল না মন দিয়ে, দেওয়ালের ক্যালেন্ডারের ছবির দিকে চেয়ে রইল হতবাক বিস্ময়ে। আশ্চর্য কোনও চিত্রকর ছবিটা এঁকেছেন। মানবদেহের শারীরিক বিবর্তন দেখানো হয়েছে তাতে। বাঁ দিক থেকে ডান দিকে গতিমান আগুপিছু সারি বেঁধে একটি মানবপঙ্‌ক্তি রচনা করেছেন শিল্পী। প্রথম লোকটা একেবারেই

জানোয়ার। দাঁড়াতেই শেখেনি। হাত-পা গঠনগতভাবে প্রায় সমানাকৃতির, সারা গায়ে জন্তুরই লোম। মানুষ প্রজাতি তার গোড়ায় এই রকম জন্তুই ছিল, চোয়াল, হাত পা, সমস্ত গঠন পুরো বৃহৎ বানরাকৃতির এবং হিংস্রও। দ্বিতীয় লোকটা একটুখানি দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে হাস্যকরভাবে। তৃতীয় লোকটা কোমর আরও খানিকটা সিধে করে দাঁড়িয়েছে। চতুর্থটা দাঁড়িয়ে উঠে সামনে একখানা পা বাড়ানোর চেষ্টা করেছে, কিন্তু তত সামাল দিতে পারছে না। পঞ্চম লোকটা চতুর্থের তুলনায় সমর্থ এবং তার দেহে লোম কমে এসেছে, চোয়াল আর তত জান্তব নয় ঠিক, কিন্তু তাকে মানুষ বলতেও বাধে, ফের মানুষও মনে হয়।

একটু একটু করে পা ফেলে এগোচ্ছে ওরা। এগোচ্ছে, যেন সভ্যতাই এগোচ্ছে। ডান দিকের শেষ মানুষটা এখনকার আমরা, যেন ভালো করে চুল আঁচড়াইনি এবং উলঙ্গ অবস্থায় বেশ দৃঢ় পায়ে কোথায় যেন ছুটে চলেছি। ঠিক তার আগের মানুষটাকে হিন্দি সিনেমার চোয়াড়ে ভিলেন বলা যায়, চোখেমুখে জন্তুর ছাপ প্রসাধনের মতো মেখে রয়েছে, মুখের লাবণ্যে মানুষ সম্পূর্ণ হয়নি—অথচ এমন বৃহৎ কাঠামোর বলশালী জন্তু ঘেঁষা মানুষ সংসারে দেখা যায়।

সহসা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিনব ক্যালেন্ডারের কাছে চলে গেল। ডানদিকের শেষ লোকটার আগে যে লোক, তার গায়ে আঙুল ঠেকিয়ে বলল—এর নাম ঘুরে বাগ, এ হচ্ছে পঞ্চায়েতের বোড়ে। এর যৌনাঙ্গ হ্রেষাপূর্ণ এবং বিষাক্ত। একে দেখুন, এ একদিন আমাদের বাড়ি এল, এই অশ্বপুরুষ মায়ের কাছে জল আর মার্কিন থানের আন্ডারওয়্যার চাইল। এবং সবার সামনেই বিন্দুর তর্জনী থেকে আদর করে খুলে নিয়ে একটা নরম শাঁখার গোল সরু আংটি তার কড়ে আঙুলে ঢোকাতে গিয়ে মট করে ভেঙে ফেলে হাসতে লাগল। এই ঘটনার মানে কী?

—তুমি এবার আস্তে আস্তে চেয়ারে এসে বস অভিনব। আমি বুঝতে পারছি। বললেন সিদ্ধার্থ।

চিত্রের উপর থেকে আঙুল তুলে নেয় অভিনব। ডাক্তারের সম্মুখে চেয়ারে এসে বসতে বসতে বলে—আমি যদি গ্রাসরুটে অ্যাকটিভ পার্টি করতাম বিন্দুর গর্ভ হত না। সুন্দরী বোবা মেয়ে কিছুতেই বাঁচে না। কিন্তু পার্টি না করে আমি অন্তত চারজন লুম্পেন ক্যাডারকে চাদর গায়ে চাদরের ভিতর ধারালো রামদা লুকিয়ে পিছনে থেকে ঘোলা জ্যোৎস্নায় অনুসরণ করেছি। তখন অন্তত একমাস উম্মত্ত ছিলাম। ওই অবস্থায় আমি একটা কাব্যনাট্য লিখি। নাম দিই, বোবা ধর্ষণ। উত্তরবঙ্গে 'পাহাড়ি' নামে একটা কাঁচা পত্রিকা, সেটি ছেপেছে আনন্দী। বলে কঠিন দৃষ্টিতে আনন্দীর মুখের দিকে চাইল অভিনব। সেই দৃষ্টি সইতে না পেরে চোখ টেনে নিল আনন্দী।

—তারপর আর কী করেছ? প্রশ্ন করেন বসুরায়।

—আর? বলে একদণ্ড থামল অভিনব। তারপর বলল—আর কিছু না। 'সীমান্ত দেশ' পত্রিকার সম্পাদক দীপাঞ্জন একদিন ওই বোড়ে মোগাম্বকে সঙ্গে করে এসে

ভ্যালভেলে গলায় বলল, কী ভয়াবহ, কী ব্যাপক তুই লিখেছিস অভি! এটাকে বই কর, তোর জন্যে পুরস্কারের ব্যবস্থা হচ্ছে। আমি বললাম, মানে! দীপাঞ্জন বলল, সরকারি পুরস্কার। ঘুরে বাগ মাথা নাড়তে লাগল। অর্থাৎ হ্যা হ্যা করে গেল সারাক্ষণ। ঘুরে মোগাম্ব চলে যাওয়ার পর চাপা গলায় দীপাঞ্জন শুধালো, কী রে কী ভাবছিস? তবে ভাই একটা কথা। বলে উঠল 'সীমান্ত দেশ'। কী, না, আমি যেন কারও নামে যত্রতত্র বিষোদগার না করি, তাতে পার্টির হেলথ্ নষ্ট হচ্ছে। শোন, বিন্দুর খোঁজ চালাচ্ছে পার্টি, তুই বইটা ছাপা, তোর কপাল চকচক করছে।

—তুমি কী বললে? এবার প্রশ্ন করল আনন্দী।

—বললাম, আমি কপাল বা তেল দিয়ে লিখি না দীপাঞ্জন, আমি হাত এবং কালি দিয়ে লিখি। এবং এটা অপমানজনক যে 'বোবা-ধর্ষণ' সরকারি পুরস্কার পাবে। ওটা কখনও বই হবে না। বলে ওকে আমি রামদা দেখিয়ে বললাম, থুঃ।

হঠাৎ করে আনন্দী কঁকিয়ে কেঁদে উঠল এবং কাঁপা গলায় বলল—ওকে আপনি ভালো করে দেখুন ডাক্তারবাবু। আনন্দী ভেঙে পড়েছে। পাগলের মতো ওড়নায় মুখ ঢেকে ফোঁপাচ্ছে।

সিদ্ধার্থ বসুরায় প্যাড টেনে প্রেসক্রিপশন লেখার সময় বললেন—ঘোড়ার ডাককে হ্রেষা বলে তাই না? ঘোড়ার ডাক বিশ্রি। সমস্ত অঙ্গপ্রতঙ্গ কাঁপিয়ে ডাক দেয়।

—আজ্ঞে যন্ত্রের মতো ঘষটায়।

—তোমার কথাগুলো বেশ শক্ত অভিনব। আচ্ছা তোমার পুরো নামটা কী?

—লিখুন অভিনব ভাস্কর। আমি ছুতোর জাতি, ছোট জাত। আনন্দী কিন্তু চক্রবর্তী। আমি একদিন ওর পিঠের জামায় আলতো করে অদৃশ্য অক্ষরে আমার নাম লিখি। ও বুঝতে পেরে বিরক্ত হয় এবং বলে, এই সব ঠিক করছ না অভি, আমরা বন্ধু মনে রেখো। পরে আমি পাগল হয়ে একদিন ওর আঙুল কামড়ে ধরি।

যেন চাবুক খেয়ে চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ে আনন্দী। তার চোখের জল মুহূর্তে শুকিয়ে ওঠে, দৃষ্টি অপমানে আর রাগে জ্বলে ওঠে। সে কাঁপতে শুরু করে। চাপা গলায় বলে—এত জটিল মন আমি কখনও দেখিনি ডাক্তারবাবু। আমি জাত মানি না। আমি ওকে যা সেদিন ক্ষুব্ধ হয়ে বলেছিলাম, তাতে তো জাতের কথা ছিল না।

—ছিল। বলে ওঠে অভিনব।

চরম বিস্ময় প্রকাশ করে আনন্দী এবং বলে—

ছিল!

—হ্যাঁ, কোনও দিনই তুমি ওভাবে আমার পিঠে লিখবে না। তোমার সঙ্গে আমার কথা ছিল বন্ধুত্বের, প্রেমের নয়। বন্ধুত্বের জন্য পদবি কি জরুরি? ঠিক করে বল অভি, আমি কি তোর সত্যিই বন্ধু নই?

—না।

—নাহ্! কী বলছিস তুই?

—তোর কণ্ঠস্বরটা আমার স্বপ্নে বোবা বিন্দুর জন্য দরকার ছিল আনন্দী। আমি মূলত বন্ধুত্ব বুঝি না।

—ওহ্ আজ এই কথা! বলে মুখে উড়নি চাপা দিয়ে আনন্দী কান্না চেপে ডাক্তারের চেম্বার ছেড়ে ঘাড় নিচু করে বাইরে চলে যায়।

অভিনব প্রেসক্রিপশন হাতে নিতে নিতে বলে—ধন্যবাদ ডাক্তারবাবু। আপনাকে কত দিতে হবে?

—একশো টাকা। কিন্তু তোমার কাছে আছে তো? বেশ দাও, আনন্দীর কাছে নিশ্চয় তুমি পাবে। শোন ভাই ভাস্কর, তোমার ব্যাধি সারবার নয়। কাব্যরোগ আরোগ্য হয় না এবং ওই জিনিস সারাতে নেই, তুমি ভাই কামনা তাড়িত। মৃগী সেই কামেরই অভিক্ষেপ। যাও। এসো এখন।

সিদ্ধার্থ বসুরায় যেন অভিনবর আত্মাকে পিষে চেম্বারের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। ঘৃণায় প্রেসক্রিপশনটা চোখের সামনে মেলে ধরে দেখতেও ইচ্ছে করল না। আশ্চর্য ব্যর্থ মনে হল নিজেকে। আসলে তার ভাষাই নিশ্চয় দুর্বোধ্য, মানুষকে বিদ্ধ করে না—মানুষ কাব্যের মতো তাকেও উপহাস করে আনন্দ পায়। 'হ্রেষাপূর্ণ যৌনাঙ্গ' কথাটি নিশ্চয় ডাক্তারের কানে হাস্যকর ঠেকেছে। 'বোবা-ধর্ষণ' কাব্যনাট্যের নাম নিশ্চয়ই কারও মনে করুণার উদ্রেক ঘটায় না। তার হাতের রামদা-ও বিশ্বাসযোগ্য নয়। অথচ এই সবই অভিনবর পাগলামি এবং সত্য উন্মাদনা, এই ব্যাধি সারে না কখনও। টাকা নিল লোকটা, তার কাছে! তার মতো গরিবের কাছে!

আনন্দী জানলও না, মাত্র একশো টাকা হাতে নিয়ে একজন ডাক্তার একজন প্রকৃত রোগীকে বধ করে দিলেন। বুঝিয়ে দিলেন, দুর্বোধ্য অক্ষর কাউকে দানাপানি দিয়ে রক্ষা করে না, যেমন জীবনানন্দকে করেনি। দেওয়ালের চিত্রাবলী গতিমান মানবপঙ্‌ক্তি কেন টাঙিয়ে রেখেছেন ওই ডাক্তার? ওখানে কি সত্যিই ঘুরে বাগ নেই? এই কল্পনার পাগলামি পছন্দ করেননি ডাক্তার! অভিনবর কোনও কিছুই বসুরায়ের ভালো লাগেনি? 'বসুরায়'! সিদ্ধার্থ বসুরায়, হা ঈশ্বর, এই নামটা এত চেনা কেন লাগছে! হ্যাঁ, এই মানুষটাকে নিশ্চয় আমি চিনি। ওঁনার লেখা কবিতা ষাটের দশকে পাঠকের সম্ভ্রম জাগিয়েছিল, ইদানিং কোথাও তেমন চোখে পড়ে না।

ইনি কি সত্যিই তিনি? অত্যধিক ড্যাশ ব্যবহার করে কবিতা লিখতেন, কবিতার শেষে পূর্ণচ্ছেদ দিতেন না, ড্যাশ থাকত এবং পঙ্‌ক্তি হত ছোট ছোট, বেশ ছট ফটে লাইন আর বেশ গাঢ়ও লাগত , শুনেছিলাম তিনি নাকি ডাক্তার। তাহলে কি এই ডাক্তারই সেই কবি? ওহ্ ইয়েস! তিনি মনোরোগ চিকিৎসক ছিলেন। হায় ভগবান, অভিনব কোন গুহার মধ্যে ঢুকেছিল?

বাইরে বেরিয়ে সবই ঝাপসা লাগছে। অভিনবর চোখে কিরকির করা জল দৃষ্টি এবং বুদ্ধি ঘোলাটে করে দেয়। আনন্দীকে কোথাও দেখা যাচ্ছে না। ও তাহলে চলে গেছে। জাতিবোধ এ দেশের মানুষের অকাট্য প্রবৃত্তি এবং শ্রেণীঘৃণা সেই জাত না মানা

উগ্র আওয়াজের ভিতর দিয়েও প্রকাশ পায়। আনন্দী, কখনও তোমার নগ্ন পিঠে মুদ্রিত করবে না কবির আঙুল, আমার পদবী। আমি ঝাপসা চোখে মফস্বলে ফিরে যাচ্ছি।

অটোরিকশার স্ট্যান্ডের দিকে ঘাড় কুঁজো করে হেঁটে এল অভিনব। পেছনের সিটে বসে কী মনে করে বুক পকেটে ভাঁজ করে রাখা ডাক্তারের প্রেসক্রিপশনের কাগজ বার করল। পড়ে দেখেই চমকে উঠল। কোথাও তার নাম নেই। আনন্দীর নামে চিকিৎসার ওষুধ লিখেছেন সিদ্ধার্থ। একটা ঘুমের ওষুধ, এবং আঙুলে মালিশের মলম একটি। ব্যস।

সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে লাগল অভিনবর। প্রথমে কিছুক্ষণ কী করবে ভেবে পেল না। তারপর ভিতর থেকে একটা ধাক্কা খেয়ে দ্রুতবেগে হেঁটে আনন্দীর মামার বাড়ি ছুটে এল অভিনব। মামার ড্রইংরুমে এসে ঢুকল সে। দেখল, মামা আনন্দীর সঙ্গে কথা বলছেন।

অভিনবকে দেখেই মামা জানতে চাইলেন—কেমন দেখলে ডাক্তারকে? ভালো মনে হল?

মুখ নিচু করে অভিনব ভেজাস্বরে জবাব দিল—আজ্ঞে হ্যাঁ। খুব ভালো মানুষ।

—তোমাকে দেখলেন?

—আজ্ঞে, কথা বললেন।

—কথাই তো বলবেন। কথাই আসল চিকিৎসা। তোমার হাতে ওটা কী? প্রেসক্রিপশন?

—আমার কোনও অসুখ নেই মামাবাবু। আনন্দীর জন্য চিকিৎসার ওষুধ লিখেছেন উনি। নাও আনন্দী। ধরো।

—তোমার জন্য?

—আমার কিছু না মামাবাবু। খালি বললেন, অক্ষর আমাকে রক্ষা করবে।

—তাহলে তো ঠিকই আছে। আমি তো ভাবছি, আনন্দীর সঙ্গে সিদ্ধার্থর বিয়েটা কেমন হবে। তুমি তো বন্ধু, আনন্দীর নিশ্চয় ভালো চাও। ঠিক করে বল, কেমন দেখলে? বয়সটা কি খুব ভারী মনে হল?

সিরসির করে একটা ঠান্ডা স্রোত শিরদাঁড়া দিয়ে উঠে নেমে গেল অভিনবর। সে কোনও প্রকারে বোকা শুকনো মুখ তুলে বলল—আজ্ঞে না। উনি তো রীতিমতো যুবক। কবিতা ভালোবাসেন।

—ভালোবাসে কী বলছ অভিনব! ও তো নিজেও লেখে। আগে তো নাম করেছিল। এখন কম লেখে। ছাপে আরও কম। লিখে এনে আমাকে শুনিয়ে যায়। রবীন্দ্রসংগীত অসম্ভব ভালো করে। এত গুণ মানুষটার! তুমি আগে ওর নাম শোনোনি?

—আমি সকলকে জানি না মামাবাবু!

—তোমাকে সেই জন্যেই ওর কাছে পাঠালাম। অবশ্য বলতে ভুলে গেলাম তখন, সিদ্ধার্থ কবি।

—আজ্ঞে আপনি আমার খুব উপকার করেছেন। উনি আমার কাছে একশো টাকা

চাইলেন, আমি দিলাম। রেমুনারেশন অফ ফিজিসিয়ন, সেটা তো দিতেই হয়, তবে ডাক্তার আমার জন্য ওষুধ লেখেননি, কিছুই লেখেননি। ফি দিয়ে বেরিয়ে এসে দেখছি, আনন্দীর জন্য লিখে দিয়েছেন। আমার পকেট খালি আনন্দী, আমাকে টাকাটা দাও, ডাক্তার তোমার কাছে নিতে বলেছেন। বলে অভিনব মুখ নিচু করে প্রার্থীর মতো দাঁড়িয়ে রইল।

—হ্যাঁ-হ্যাঁ, টাকাটা তাহলে দিয়ে দে আনন্দী। বলে উঠলেন মনোসুধা।

—আমাকে ট্রেন ধরতে হবে।

—হ্যাঁ, ট্রেন ধরতে হবে। বলে ভিতরে চলে গেলেন ডাক্তার মিত্র।

আনন্দী অধোমুখ দাঁড়িয়ে থাকা বেচারি অভিনবর মুখের দিকে চাইতে পারছিল না। মুখটা সাদা কাগজের মতো রক্তশূন্য লাগছে। ভারী গলায় অনুরোধের স্বরে আনন্দী বলল—দাঁড়াও অভি, তোমার সঙ্গে আমার কথা আছে।

—কাল বিশ্ববিদ্যালয়ে দেখা হবে, তখন শুনব।

—না, এখনই বলব। বাইরে চলো। ওষুধ কিনে ফিরব। তুমি থাকো একটুখানি। খুবই অসহায় শোনাল আনন্দীর গলা।

রাস্তায় নেমেই আনন্দী একটি টেলিফোন বুথে ঢুকে পড়ল। প্রেসক্রিপশনের কাগজে টেলিফোন নম্বর দেখে ডায়াল করল বসুরায়কে। কাচঘরের ভেতরে কী কথা হল টের পেল না অভিনব। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলেছে আনন্দী। চোখেমুখে চাপা অসন্তোষ ফুটে উঠছিল, শেষের দিকে কেমন ব্যথিত বিষণ্ণ দেখাচ্ছিল তাকে।

বুথ থেকে বেরিয়েই আনন্দী অভিনবকে শুধালো—ফি বাবদ তুই একশো টাকা ডাক্তারকে দিতে গেলি কেন?

অভিনব অন্য কিছু ভাবছিল বা সে আনন্দীর কথা শুনতে পেল না, চুপ করে রইল। আনন্দীই আবার কথা বলল—তোর চিকিৎসা উনি করবেন না।

—আমার জন্য দশ টাকা ভিজিটের ভোলা পাল আছে আনন্দী, তুই ভাবিস না।

—তোর কোনও অসুখ নেই। পেশেন্ট আমি। ডাক্তার বললেন, টাকা না নিলে ওঁর নাকি আত্মবিশ্বাস নষ্ট হয়ে যায়। বুঝলাম না কথাটা। মানুষকে বোঝা কত কঠিন!

—আমি বুঝেছি। ডাক্তার-কবি আমাকে একদম পছন্দ করেননি। তোর পাশে আমাকে অসহ্য মনে হয়েছে তাঁর। আমি অভিশপ্ত আনন্দী বসুরায়। তোমার ভালো হোক। তোর আঙুলটা নিশ্চয় সেরে যাবে, দাগ থাকবে না। কোথাও তোমার মাংসে আমার অক্ষর থাকবে না।

অভিনবর কথায় ব্যথার সঙ্গে অশ্রু ঠেলে উঠল আনন্দীর চোখে। সে গাঢ়স্বরে ডাকল—অভি!

—হ্যাঁ, বল!

—ওই জায়গায় কেমন অন্ধকার দেখেছিস! মাথার বাল্বগুলো কারা সব ভেঙে দিয়ে রাখে। চ।

—কেন?

—আয় না! বলে রাস্তার মোড়ের ভিতরের গলিতে বন্ধুকে টেনে আনল আনন্দী। অন্তর্বাস এবং জামা খুলে ফেলে বলল—আমার পিঠে লিখে দে, আমি তোকে আজ বাধা দেব না।

—এমন কেন করছ আনন্দী!

—দাও লিখে দাও!

—আমি কামনা তাড়িত মানুষ, তুমি বন্ধু আমার, কষ্ট বোঝার চেষ্টা করো। আমার বোবা বোনকে ধর্ষণ করে মেরেছে ওরা, বিশ্বাস করো তুমি।

—তুই লিখে দে পাগল!

—আমিও রবীন্দ্রসঙ্গীত ভালো গাইতে পারি আনন্দী।

—শুনেছি অভিনব, আমাকে আর বোলো না। খালি লিখে দাও, তোমার নাম, তোমার পদবী।

—হায় তমসা! তুমি বোবা হলে, তোমাকে আমি পেতাম, এ অন্ধকার আলোর মতো করে আমাকে দেখছে যে!

—কী বলছ অভিনব! লিখে দাও! বিশ্বাস করে লিখে দাও।

—আমি আর তোমাকে ছুঁতে পারি না আনন্দী। ক্ষমা করো। বলা মাত্র অভির চোখের গরম জল আনন্দীর ঘাড়ের নীচেয় পিঠে পড়ল ঝরে। আনন্দীর সমস্ত শরীর কেমন করে উঠল। অদ্ভুত আনন্দে চোখ মুদে এল। তার নিশ্বাস বন্ধ হয়ে এল। ঠিক কত দণ্ড কেটেছে বুঝতে পারেনি সে। অন্ধকারে হঠাৎ চোখ খুলে ভয় পেল মনোসুধা মিত্রের ভাগ্নী। চাপাস্বরে ডাকল—অভি!

কেউ সাড়া দিল না। আলোয় বেরিয়েও অভিনবকে পেল না আনন্দী। অভি নিঃশব্দে চলে গেছে। তাকে টাকাটা দেওয়া হল না। ওষুধ নিতে দোকানে এসে হঠাৎ কোথা থেকে দুটি ডানাওলা শব্দ কালো বিমর্ষ পেঁচার মতো মনের নির্জ্ঞানে ঢুকে গেল তার, সেটি একটি কাব্যনট্যের নাম।

ট্রেন থেকে মফস্বলে নামল অভিনব। তখন রাত হয়েছে। ভ্যান-রিকশা করে দু' মাইল এসে পায়ে হাঁটতে লাগল। তখনই তার মতো একটা লোক চাদর গায়ে চাদরের তলায় রামদা লুকিয়ে নিয়ে পিছন থেকে তাকে অনুসরণ করতে লাগল। আকাশে ঘোলা চাঁদ। বানের ঘোলানো জলের মতো কাদাটে জ্যোৎস্না গায়ে পড়লে ঘেন্না লাগে। বাঁশবনের সরু পথে একলা ঢুকল অভিনব।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া নাকে ঝাপটা দিয়ে ঠেলে আনল লাশের গন্ধ। এই রকম ঘোলা চাঁদ কলকাতার সন্ধ্যায় ছিল না। কিন্তু ঘোলা জ্যোৎস্নায় এভাবে পচে উঠল কে? চাঁদ কখন উঠল? কে আসে পিছনে? ছমছমে ভয়ে হেঁকে উঠল অভিনব। কে রে!

বাঁশপাতা চুঁইয়ে ঘোলা জ্যোৎস্না যা পড়ছে, তাতে পথ ঠাওর করাই কঠিন। পিছন থেকে কেউ এসে আক্রমণ করলে অভি বাঁচবে না। ভাবতে ভালো লাগে, আনন্দীর মাংসে একজন বেকার-কবি গেঁথে গিয়েছে। আর তো কিছু নয়, এ জীবন কবিতার কালো

ভোজবাজি।

—কে? কে হে?

পিছনের লোকটা জবাব দিচ্ছে না। কী দুর্গন্ধ হা জ্যোৎস্নার তিমির। পায়ে কী ঠেকল যে! এইই তো সেই বোবা লাশ মনে হচ্ছে। পরনে কাপড়, ছেঁড়া হলুদ ব্লাউজ, চোখ কিসে খেয়ে ফেলেছে। মাটিতে বসে পড়ে অভিনব।

পিছনের লোকটা এগিয়ে এসে লাশ ছুঁয়ে লাশের পায়ের দিকে বসে গেল। চাদর গায়ে এ ঠিক অভি ভাস্করের মতো দেখতে। ঘোলা জ্যোৎস্নায় মুখ বোবার মতো পুরু। হাসল একটুখানি দাঁত বার করে—দুই চোখ ক্ষুধার্ত।

এই লোকটাও তাহলে কবিতা লেখে! ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে বোনকে ছুঁয়ে রইল অভিনব। কিন্তু এ বোন কি না বোঝা যায় না। কারণ ঘোলা অল্প জ্যোৎস্নায় লাশ বোঝা অসম্ভব। তবে এ কোনও নারী। এবং বিন্দুও হতে পারে।

ভোরের জন্য অপেক্ষা করতে হবে, কী বলো?

লোকটা মাথা নাড়ল এবং তখন অভি ভয়ে চিৎকার করে বলল—ভোলাবাবু! দেখুন, আমি পাগল হয়ে গেছি। দেখুন, ওই লোকটা শকুনের মতো বসে আছে। বিন্দুর শরীরে আমকুশির বৈশাখী গন্ধ আনন্দী ছিল! ভোলাবাবু, আমাকে বাঁচান ভোলাবাবু!

দুই

সিদ্ধার্থ দেখলেন অতিথি-অভ্যাগত সবাই ফিরে গেল। প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান শেষ হল রাত একটা নাগাদ। বাড়ি অসম্ভব নির্জন হয়ে এসেছে। প্রফুল্ল বাসন্তী হাওয়া মিষ্টি স্পর্শ দেবার জন্য বারবার ছুটে আসছে জানলা দিয়ে।

খাটে সালংকারা মেথিঘ্রাণ রূপবতী রমাই বুঝি বসে রয়েছে। বেচারি বউ অপেক্ষা করে করে একেবারে কেমন যেন হয়ে গেছে। মিলনের আকাঙ্ক্ষায় সারামুখে ফোঁটাফোঁটা ঘাম দেখা দিয়েছে। বিয়ের পর দিনকতক বাইরে যেতে হয়েছিল। সিদ্ধার্থ এগিয়ে এলেন। আনন্দীর মাথার কাপড় ফেলে দিলেন। অলংকার খসিয়ে ফেলতে লাগলেন। আনন্দী কথাও বলল না, বাধাও দিল না। কানের দুল খুলতে গিয়ে অধৈর্য সিদ্ধার্থ বোধহয় কানের ফুটো রক্তাক্ত করে দিলেন। আনন্দী কাঁদল না, ব্যথায় কাতরালো না।

শাড়ি খসিয়ে টেনে ফেলে দিতে দিতে সিদ্ধার্থ বললেন, আমি তোমাকে ভোগ করতে পারিনি রমা। বিয়ের সাত দিনের মাথায় স্টোভ বার্স্ট করল। ২৬ দিনের মাথায় নার্সিং হোমে মারা গেলে। আর আজ কত বছর পর, তুমি মায়া হয়ে এলে আনন্দী। প্রেম যুদ্ধের মতো, নীতি মানে না। কবিতা প্রতিযোগিতার মতো, একজন আর একজনকে দরকারে ঠেলে ফেলে এগোয়। এ যুগে কবিরা কেউ কারও নয়। আমি বড় প্রতিষ্ঠানের সুযোগ না নিয়ে ভুল করেছি। দ্যাখো, যা বলি শোনো, কাব্যের ব্যর্থতা সফল পেশা দিয়েও পূরণ হয় না আনন্দী। দুঃখ কোরো না, তোমাকে অভি ভাস্কর কামড়েছিল, ওটা একটা বিকৃত কামনা। ওটা রোগ নয়। তুমি কি কষ্ট পাচ্ছ?

আনন্দী তবু কোনও কথা বলল না। নগ্ন হয়ে গেল স্বামীর হাতের টানে। দীর্ঘকালের দমিত কাম সিদ্ধার্থের রক্তে হাজারটা স্টোভ জ্বেলে দিল। আনন্দীর মুখ করুণভাবে আশ্চর্য শুকনো, সে ঘামসিক্ত হয়েও নরম হতে পারেনি। প্রেম মানুষকে যে কামনার স্বেদে উত্তেজনায় ভেজায়, কোথাও তা অনুভব করল না আনন্দী। বিছানায় নগ্ন বউকে চিত করে ফেলে নিজে উলঙ্গ হলেন সিদ্ধার্থ। নানা কামকলার উপাচারে আনন্দীকে ভরালেন সিদ্ধার্থ বসুরায়। স্পর্শ-কাতর প্রত্যঙ্গে উপযুক্ত স্পর্শ দিলেন। আনন্দীর চিত্ত ভরল না। সে রইল যৌতুকের আসবাবের মতো কাঠ হয়ে। সিদ্ধার্থ যখন অবশেষে ক্রোধের মতো জ্বালায় আনন্দীর মধ্যে ঢুকলেন, তখন আনন্দী বোবার মতো ভয়ে, যাতনায়, প্রার্থনায় কুঁইকুঁই করে উঠল।

সিদ্ধার্থ বউকে ধর্ষণ করতে লাগলেন। ধর্ষণ শেষে প্রায় মৃতের মতো দেখালআনন্দীকে। আনন্দীর নির্জ্ঞান মনের তমসায় পেঁচা ডাকছিল, গলায় বোবার আকুতি—যেন সে একটি ঘোলা জ্যোৎস্নার মাঠে বাঁশবনে পড়ে আছে। ধর্ষণ করে আনন্দীর কানের কাছে মুখ ঠেলে নিয়ে গিয়ে সিদ্ধার্থ কামার্দ্র গলায় ডাকলেন—রমা! মায়াবতী! আনন্দী। ডাকতে ডাকতে পাগলের মতো করে উঠলেন তিনি, অর্থাৎ সাইকিয়াট্রিস্ট সিদ্ধার্থ বসুরায়। এবং গলা চিরে প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন বেচারি। অদ্ভুতভাবে তাঁর গলা দিয়ে বার হয়ে এল একটি নাম—বিন্দু! বিন্দু! বিন্দু!

পাগলের মতোই ধর্ষিতা বউয়ের আধবোজা ম্লান ব্যথায় শুকনো চোখে দেখলেন কান্না ফুটে উঠতে না পারার বোবা ছাই।

সিদ্ধার্থ বউকে কাত এবং উপুড় করে দেখলেন পিঠে নখের আঁচড়ে সরু রেখায় নাম লেখা—অভিনব ভাস্কর!

—কিসে তুই মজেছিস বউ, কবিতা তোকে বোবা করে দিল! বলে ডুকরে কেঁদে উঠলেন সিদ্ধার্থ বসুরায়।

সিদ্ধার্থর চোখ থেকে আনন্দীর পিঠে টুপিয়ে পড়ল গরম জল। সেই সময় আনন্দজীর পিঠ সির্‌সির্‌ করে কাঁপল, সে কেমন ভিতরে ভিতরে ভিজে উঠল। বোবার মতোই আনন্দী, বোবার মতোই বা কেন, বোবা আনন্দী বুকে নিশ্বাস চেপে নিমেষ শুনতে থাকল।

কখন অভি ভাস্কর তাকে আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে কবিতার মতো লিখে যাবে! কখনই বা তাকে ছোঁবে অভিনব, পাগল কবি! আনন্দীর পিঠের উপর কোনও অন্ধকার কি খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে!

নীল অন্ধকারের ভিতর থেকে টুপিয়ে পড়তে থাকল তমসাক্ষর জল।

হিংসার উৎস

ফাটা মঘাই একজন পেশাদার খুনি। তাকেই শেষ পর্যন্ত হরচৌধুরীর বডিগার্ড হতে হল। হরচৌধুরীর বডিগার্ড মঘাই, একথা নেবুতলার লোক বিশ্বাস করতে চাইল না। কিন্তু মঘাই হরচৌধুরীর সত্যিই বডিবার্ড এবং তাকে বহাল করে দিয়েছে পাড়ার দাদা—বটমদা।

মঘাইয়ের নামে তেরোটা মামলা ঝুলে আছে জেনেও হরচৌধুরী তাকে নিলেন। ফাটার পক্ষে পাড়ায় থাকা নিরাপদ ছিল না মোটে ; বটমদাও বলল, মাস কতক এলাকায় থাকিস না কেশব। বেজায় ধরপাকড় হচ্ছে। তোকে একটা চাকরি দিয়ে গাঁয়ে পাঠাচ্ছি। মাস মাইনে আছে, খাওয়া-দাওয়া ভালো, আরামের কাজ। বলে কিছুক্ষণ বটম চুপ করে রইল।

তারপর বলল, হরদা রজি হয়েছে। পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হলে ফিরে আসবি।

মঘাই জানত, হরচৌধুরী একজন সৎ লোক। জনসেবক গোছের বিধায়ক। কোথায় কেন দূরে গাঁ এলাকায় পড়ে থেকে মানুষের জন্য কাজ করেন। এই লোক তাকে নেবেন কেন, বুঝল না কেশব ওরফে ফাটা মঘাই। কিন্তু হরচৌধুরী তাকে বাস্তবিকই সঙ্গে নিলেন এবং বুলেট মোটরবাইকের পিছনে বসিয়ে নিয়ে বললেন, তোমাকে আমি আমার দেহরক্ষী করলাম কেশব। কোনও কালে আমি কারুকে এভাবে কাজ দিইনি। আমার কোনও বডিগার্ড লাগে না। মায়ের জন্য করতে হল।

বেশ আশ্চর্য হল মঘাই। মায়ের জন্য কেন?

বাইক ছুটে চলেছে গাঁয়ের দিকে। পিছনের সিটটা বেশ বড়, জুত করে বসা যায়, চালকের গা ঘেঁষাতে হয় না। বেশ না-ছোঁয়া সম্ভ্রমের ফাঁক রেখে সদ্য-নিযুক্ত বডিগার্ড মঘাই বসেছিল। বাইকটা গাঁক-গাঁক গম্ভীর আওয়াজ দেয়।

—তুমি যেখানে যাচ্ছ কেশব, সেই তামাম অঞ্চলে আঠারো বছর কোনও খুনের ঘটনা নেই। কিন্তু আমার এলাকার বাইরে রোজই খুনোখুনি হচ্ছে। আমার এলাকায় খুচখাচ অশান্তি যে নেই তা নয়, কিন্তু আমি সেইসব সহজেই নিষ্পত্তি করি। পারতপক্ষে পুলিশ নিই না। মানুষকে বিশ্বাস করি, তারাই এলাকার শান্তি কল্যাণ করে।

—তাহলে আমাকে কেন নিয়ে যাচ্ছেন বাবু আমার সেখানে তো কোনও কাজ নেই।

—আছে। কাজটা এই যে, তুমি আমার সঙ্গে রয়েছ। মায়ের ভরসা।

—মা আমাকে ভরসা করলেন?

—হ্যাঁ। মাকে বলেছি, পেশাদার লোক তুমি। এরা নেমকহারাম হয় না। এরা নুন খেয়ে গুণ গাইতে জানে।

—মাকে বললেন?

—হ্যাঁ। আচ্ছা, তুমি লেখাপড়া কিছু...

—করেছি। কলেজ পেরোইনি, কিন্তু কলেজে ঢুকেছিলাম। ছাত্র খারাপ ছিলাম না, তলার দিকে ফার্স্টবয় ছিলাম।

—তুমি গান গাইতে পারো?

—পারি। এবং খুন করার পর, যাকে কিল করলাম, তার ছবি অবিকল এঁকে দিতে পারি, আসলে আমি যাকে খুন করার বরাত নিই, তাকে ভালো করে দেখে নিই, অনেকের সঙ্গে ভাব পর্যন্ত করেছি। তাছাড়া..

—তাছাড়া?

—অনেক সময় যাকে টার্গেট করা হল, তার ছবি আগাম এঁকে ঘরে টানিয়ে রেখে চেয়ে চেয়ে দেখতে আমার ভাললাগে।

—বল কী কেশব!

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

পিছনে ঘাড় আধখানা ঘুরিয়ে হরচৌধুরী কেশবকে একবার দেখলেন। কেশবের দৃষ্টি দূর দিগন্তে কোনও কিছুতে ঘন হয়ে উঠেছে। সে চৌধুরীর ঘাড় ঘোরানো দৃষ্টিক্ষেপ লক্ষই করল না।

হঠাৎ সম্মুখ থেকে বুলেটের শব্দের মধ্যে হাওয়ায় ভেসে প্রশ্ন এল, তুমি কি ভালোবাসো কেশব?

—খুন করতে।

—কী ঘৃণা কর?

—খুন করতে।

খড়ের আগুন যেভাবে ধিকিধিকি এগোয় সেইভাবে একটা গ্রাম ছাড়িয়ে আর একটি গ্রামের দিকে গণহিংসার আগুন এগিয়ে আসছে। হরচৌধুরীর এলাকায় সেই আগুন এখনও ধিকিয়ে ধিকিয়ে এসে ঢুকে পড়েনি। তবে যে-কোনও মুহূর্তে হঠাৎ ঝলসে উঠতে পারে সীমান্ত জনপদ।

তাঁর এলাকার সীমানা ধরে হরচৌধুরী সীমান্ত গ্রামগুলিতে বুলেট চড়ে দেহরক্ষীসহ ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। পাবলিক কিছু আশ্চর্য হল। হরচৌধুরী কখনও গুলি-বন্দুক বোঝেন না, কখনও বডিগার্ড নেবেন ভাবেনি কেউই। মানুষ বড় বেশি আশ্চর্য হল কেশবের সৌন্দর্য দেখে। ছেলেটা হিন্দি সিনেমার নায়কদের চেয়ে সুন্দর। যেমন লম্বা, তেমনই স্বাস্থ্যবান, টানটান থুতনি দৃঢ়তার শক্তি ফোটায়, চোখে ভরা স্বপ্নের নরম মাধুর্য, চোখ দুটি বড় বড় এবং কালো মণি দুটি দৃষ্টিকে গভীর করেছে। কেশবের বাহু দুটি কী বলিষ্ঠ! চোখেমুখে শিক্ষার ছাপ পর্যন্ত ঠাহর করা সম্ভব।

কেবল চুলের আড়ালে ঢাকা রয়েছে মাথা ফেটে যাওয়ার দাগ। মানুষ বুঝলই না কেশব আসলে ফাটা মঘাই। হরচৌধুরী বুদ্ধিমান মানুষ, বডিগার্ডকে বডিগার্ড কিনা বুঝতে দেন না। যদিও কেশবের কাঁধে রয়েছে পিঠ-খাড়া একটি লম্বা দু'নলা।

—ছেলেটা আপনার হরবাবু? এক বৃদ্ধের জিজ্ঞাসা। একালের গ্রাম্য শিক্ষক।

—হ্যাঁ, জগদীশ মেসো।

—ভাই?

—হ্যাঁ, ভাই।

—সহোদর?

—আজ্ঞে, মেসোমশাই।

—তাহলে একজন বিশ্বাসী মানুষ সঙ্গে রাখতে হচ্ছে আজকাল?

—হ্যাঁ।

—আর্মড্ অ্যান্ড ফেথফুল?

—আজ্ঞে। আমার ভাই।

এত প্রগাঢ় বিশ্বাসের সঙ্গে হরচৌধুরী কেশবকে 'ভাই' বলে পরিচয় সুদৃঢ় করেন যে, কেশব মনে মনে চমকে ওঠে।

একটি অন্ধ গলিতে জন্ম এবং কেশবের বেড়ে-ওঠা এবং সেখানেই কৈশোরে মানুষ খুনের অভিজ্ঞতা লাভ, কেশব কখনও এই রকম মুক্ত প্রকৃতির করতলে কুলুধ্বনি ছড়ানো অপ্রশস্ত সুন্দর নদীতীরের বৃদ্ধ গ্রামশিক্ষক দেখেনি। মানুষগুলো এখনও আদিম সারল্যে বিস্ময়কর। দূরে কোথায় একটা টিয়াপাখি টিহি-টিহি করে তাল রেখে ক্রমাগত ডেকে চলেছ। ডাকটা বুকের মধ্যে কেমন একটা স্ফূর্তি এনে দিচ্ছে।

নদীর পাড়ে বরফ-রঙা আগুন জ্বলবল করছে, আসলে ওটা একটা গাভী। এত সাদা, এত পবিত্র ধবল, এত স্বাস্থ্যময়ী, এত বিদ্যুৎ চমকানো দুধে ভরা অনুচ্চ গাভী, এত ভরাট, এত অহিংস সুন্দর গাভী, বাঁটগুলি মাঝে মাঝে মাটিতে ঠেকে যাচ্ছে ; এই রকম সুখী প্রাণী কখনও দেখেনি কেশব। গাভীর পিঠে সহসা ঝাঁপিয়ে এসে ঝটাপটি বাধিয়ে দিল আশ্চর্য সবুজ ফরিয়াদি টিয়া। এখানকার লোকে বলছিল—ফরেদি টিয়া। ওরা গাই ভালোবাসে, ধলীকে বিরক্ত করে আনন্দ পায়।

এই রকম তো ছবিতে আঁকে মানুষ, কিন্তু প্রকৃতি যে এই রকম নিজেই নিজেকে এঁকে বসে রয়েছে, তা কে জানত! টিয়াগুলোর সঙ্গে দুটি কালো কুচকুচে ফিঙেও জুটেছে। ফরেদি পাখিকে ওই দুটি ভয় পেলেও গাভীর পিঠের অধিকার পেতে চাইছে।

—গাইটা কার?

—দরবেশের বউ পালে।

—দরবেশ?

—আসল নাম খোকন সিকদার, বাউল গোছের মানুষ, রাধিকে বেশে থাকে। মেয়েলি ঢঙ আছে কি না, মাথায় কাঁধ নাচানো কেশ, মাঝখানে সিঁথি, কপাল-নাকে

চন্দনের নকশা, ধুতি পরে গায়ে টানা দেয়, গাঁওয়ালি ব্যবসাও আছে শিশি-বোতলের।

—শিশি-বোতল?

—আজ্ঞে, দরবেশের হচ্ছে বাটার ব্যবসা। 'মিঠা কুমড়া বোতলে বদল, বোতলে বদল মিঠা কুমড়া-আ-আ'। বলে একজন হাঁক পেড়ে দেখাল দরবেশের গাঁওয়ালি ফিরির বিজনেস।

হরচৌধুরী বিষয়টি আরও পরিষ্কার করে বোঝানোর জন্য দরবেশকে ডেকে পাঠালেন। দরবেশ বিশ মিনিট বাদে বাহক কাঁধে সামনে এসে দাঁড়াল। ওর পিছু পিছু এসেছে স্ত্রী গৌতমী ওরফে অন্ন। স্বামী গাঁওয়ালিতে বার হচ্ছে, বেলা আটটা বেজে গেছে। পরনে গা-ফেরতা ধুতি, কাঁধে রাঙা টকটকে গামছা, পায়ে হাওয়াই চটি।

নারীর নাম অন্ন, ভালো কথা।

—গাইটার দুধে পায়েস কেমন হয়?

—ভারি সুস্বাদ। খাবেন? গৌতমী ছলবল করে বলে উঠল। কণ্ঠস্বরে আশ্চর্য মাদকতা। এত মিঠে কণ্ঠ আগে শোনেনি কেশব। চোখে যেন টগর ফুলের শিশিরভেজা স্নিগ্ধ কাম, হৃষ্ট শরীর, দোহারা গড়নে মিষ্টি ত্বকের ঘন যৌবন, ঠোঁট দুটি স্ফুরিত পাপড়ির মতো বিনে রঙে রাঙা, নিতম্বিনী সরু কোমর বাঁকিয়ে ঢলে এসেছে একটি মধুর ছন্দে।

—পায়েসান্নই তাহলে খাব চৌধুরীমশাই।

—খাবে। এখানেই তোমার থাকার জায়গা। শোনা যাচ্ছে এই নদী পেরিয়ে ওরা আসতে পারে।

—কারা?

—মাস্কেট কারখানার বেহারি মেয়েমদ্দ। ওরা বোমা বাঁধারও কারিগর। এইখানে রাত্রে তোমার চৌকি পড়বে কেশব। অন্য সময় তুমি আমার সঙ্গে থাকবে।

—আজ্ঞে। বলে অন্নর মদির আবেশমাখা বিস্ময়ঘন আশ্চর্য সুন্দর চোখে চাইল কেশব এবং বিড়বিড় করে বলল, আমি কখনও মেয়েমানুষ খুন করিনি। এবং বালিকা ধর্ষণ করিনি। এবং মৃতার সঙ্গে সঙ্গম করিনি।

—কিছু বলছ কেশব?

—না দাদা। খালি বলছি...বলে নদীর দূরবর্তী পাড়ের পাখিবেষ্টিত গাভীকে দেখে কেশব বলল, গাইটার ছবি আঁকব।

হরচৌধুরী প্রায় আঁতকে উঠে কেশবকে বললেন, না মঘাই, তুমি ভগবতীর ছবি আঁকবে না। তুমি শুধু ওর দুধ খাবে। শুনেছি, বেহারের ওরা প্রথন একটা গাভী বধ করে গাঁয়ে ঢোকে। ভাবতে পার, কখনও ওই পবিত্র পশুটা ওইভাবে ওখানে চরবে না। তুমি রক্ষী কেশব, নদীর পাড়ের ওই ছবি তোমাকে আমি দেখবার জন্য দিয়েছি। তাছাড়া গৌতমীর পায়েসান্ন খেতে হলেও তোমাকে শুদ্ধ হতে হবে। একে দুধজল চন্দনে চান করিয়ে দাও অন্ন। যাও, নিয়ে যাও।

দরবেশ আত্মমুগ্ধ এক পরমপ্রাপ্তির হাসি আপন মনে ফুটিয়ে তুলল নিজের ঠোঁটে

এবং হরচৌধুরীর কথা সমর্থন করে আশ্চর্য আতিথ্য ঘোষণা করল—হ্যাঁ নিয়ে যা অন্ন। উঠানে কলতলায় জল দিয়ে যা। চান হলে কুলো করে ধানদুব্বো, জবা, শ্বেতপুষ্প দিয়া বরণ করবা। পঞ্চব্যঞ্জন দিয়া ভাত বাড়বা। শ্যাষে ধলী গাইয়ের দুধবাটি অতিথির হাতে দিবা, বলবা, তুমি মোদের রক্ষী।

গ্রামের নাম ধূলিনগর, নদীটার নাম শিরিন। হরচৌধুরী বললেন, এইসব নাম নতুন করে দিয়েছে জগদীশ মাস্টার, জাতীয় শিক্ষক। আগে অন্য নাম ছিল। এই বসতটা হাল আমলের। একবার বাইশি মজলিস ডেকে নাম ঠিক করা হয়। আমি মানুষগুলোকে বেছে বেছে এখানে এনেছি। মানুষের একটা ভালো জাত তৈরি করব বলে। জগদীশ মাস্টার এখানকার খুঁটি। সীমান্ত এলাকায় ভাল লোক না দিলে অঞ্চলের আঁট থাকে না। কিন্তু সেই গ্রামও এখন ধোঁয়াচ্ছে, দেখতে পাচ্ছি। আমি ভয় পেয়েই তোমাকে বডিগার্ড করলাম কেশব। মাকেও খানিক 'বুঝ' দেওয়া গেল। আচ্ছা তুমি কখনও নারী-সংসর্গ করেছ?

—না।

—হত্যা করেছ কয়টা?

—মেয়ে? না, একটাও না।

—কেন?

—ওটা পারি না।

—কেন?

—অন্ধ গলিতে লড়াইটা পুরুষে পুরুষে। আমার মাথায় কেউ নারী খুনের মতলব দেয়নি কখনও।

—ঠিক আছে, তুমি তাহলে পায়েসান্ন পাবে। আমি গৌতমীকে বলে দেব।

—গৌতমী নিজেই দেবে বলেছে।

—ঠিক বলেনি। ও তোমাকে জানে না।

—আপনি না বললে দেবে না?

—না। কারণ আমি একদিন ওর কুমারী পূজা করেছিলাম। পরে দরবেশের সঙ্গে ওর কণ্ঠী বদল হল। আমি অন্নকে দেবীজ্ঞান করি কেশব। ওর সৌন্দর্যের তুলনা কোথাও পাইনি। আমি বিবেকানন্দের ভক্ত। বিয়ে করিনি। অন্নকে ভালোবাসি, মনে রেখো।

হরচৌধুরী মানুষটাকে বড় বেশি আশ্চর্য লাগল। মানুষটা কুমারীপূজা করেছিলেন। অন্নকে দেবীজ্ঞান করেন। মানুষের ভালো জাত তৈরি করবেন বলে এই সীমান্তে একটা বাছাই মানুষের বসত গড়ে তুলেছেন—এখানে অপ্রশস্ত খাদালো বেগবান নদী শিরিন বইছে মাঠপ্রান্তরে এঁকে বেঁকে। নদীতীরে আশ্চর্য ধবল গাভী চরে। তার গায়ে সবুজ টিয়ারা ঝাঁপায়।

—তুমি তাহলে কুমারীপূজার দেবী? তুমি মানুষ নও অন্ন? কেশব শুধায়।

অন্ন বলল, আমার কুমারীপূজা হয়নি। হয়েছিল আমার দিদির। আমারই মতন দেখতে কি না, তাই হরবাবু গুলিয়ে ফেলেন। দিদি এখনও কুমারী, হুগলির মঠে সন্ন্যাসী

হয়ে রয়েছে। ব্রহ্মচারিণী লীলাদেবী আমার দিদি। দিদিকে পূজা দিয়ে হরচৌধুরী সর্বনাশ করেছিল, দিদির মাথায় ঢুকে গেল, দিদি সত্যিই দেবী হয়ে গেছে। মা তাই মাধ্যমিক পাস করার বছরই দরবেশের সঙ্গে কণ্ঠী বদল করিয়ে আমাকে নবিপুর পাঠালেন। দরবেশকে চৌধুরীই নবিপুর থেকে এখানে খাস জমির লোভ দেখিয়ে টেনে এনেছে।

—তোমার পুজো হয়নি?

—না।

—তুমি দেবী নও?

—না। আমি প্রকৃতি। দরবেশের প্রকৃতি। বোঝো? দরবেশ মানুষ-পুজো করে। রাধিকের বেশ ধরে আমার সঙ্গে থাকে। রোজ আমার পুজো দেয়। এবং আর তোমাকে বলছি না। শোনো, আমি তোমাকে পুজো দেব ঠাকুর। তুমি এই চরদিয়াড়ের ধূলিনগরে থেকে যাও।

—আমি তো হরচৌধুরীর বডিগার্ড অন্ন। ওঁর ছায়া। উনি যতদিন চাইবেন থাকব।

—তুমি বিয়ে করোনি?

—না।

গৌতমী এবার ডাগর এবং কাজল-আঁকা চোখ দুটি মেলে নির্নিমেষ কেশবকে দেখতে থাকে। এ রকম অকুণ্ঠ এবং প্রায় অলজ্জ তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি কেশব কোনও নারীর দেখেনি। অলজ্জ বটে, কিন্তু রসস্থ. কোনও জ্বালা নেই। মেয়েটার গলায় তুলসীমালা, কপালে সাদা তিলক।

হঠাৎ গৌতমী বলে উঠল, তুমি আমাকে দেবীজ্ঞান করবে না কখনও। আমি মানুষ হতে চাই। পূজা চাই না আমি। ভালোবাসা চাই। শোনো, হরচৌধুরী যাকে দেবীজ্ঞান করে, তার জীবনে কোনও নিস্তার নেই।

—মানে। বলে চমকে ওঠে কেশব।

—আমি দিদির জন্যই ওই লোকটাকে ক্ষমা করতে পারি না।

—তুমি এত কথা আমাকে বলছ কেন? আমি ভাড়াটে লোক। মানুষ খুন করি।

—মানুষ খুন করো। তার মানে! বিষম অবাক হয় অন্ন। ফ্যালফেলে দৃষ্টিতে কেশবকে দেখতে থাকে। তার দৃষ্টির ক্ষণপূর্বের মাধুর্য উবে গেছে।

কেশব হা হা করে এক প্রস্থ হেসে ওঠে। তারপর বলে, আমার নামে তেরোটা খুনের মামলা ঝুলে আছে। আমি ফেরার হয়ে এখানে এসেছি।

—বাজে কথা।

—আরে না না, বাজে কথা নয়।

—তুমি হতেই পারো না।

—কী?

—যা বলছ। তুমি খুন কর?

—হ্যাঁ। খুন করার আগে, যাকে করব, তার একটা ছবি আঁকি। ছবি এঁকে সামনে

ঝুলিয়ে দিই।

—কেন?

—খুনের জন্য বাসনা দরকার গৌতমী। ছবি দেখে সেটা জাগিয়ে তুলি।

—কী অদ্ভুত!

—তোমাকে হরচৌধুরীর দেবীজ্ঞান করার চেয়ে অদ্ভুত নয়। নিশ্চয় নয়। তাই না?

—তুমি কী জানো কেশব? বেশ তো, হরচৌধুরীর একটা ছবিই আঁকো, আমি দেখব।

—কোন মানুষটা ছবি হবে বলা তো যায় না অন্নপূর্ণা।

বিবৃত সংলাপ থেকে ওরা দুজন—গৌতমী আর কেশব—দুটি খাস বাক্য মনের মধ্যে চয়ন করে রেখে দেয়। 'হরচৌধুরী যাকে দেবীজ্ঞান করে, তার জীবনে কোনও নিস্তার নেই।' বাক্যটি কেশবের মনে চির-মুদ্রিত এবং আকীর্ণ হয়ে যায়। গৌতমীর মন আঁকড়ে ধরে অদ্ভুত বাক্যটি, 'কোন মানুষটা ছবি হবে বলা তো যায় না।'

ধূলিনগরে মাস তিন দেহরক্ষীর কাজ করে কেশব কত কিছু দেখল। সবচেয়ে বিস্মিত হল, দরবেশের প্রকৃতিপূজার আচার দেখে। অন্নকে লালপেড়ে সাদা শাড়ি পরিয়ে বড় পিঁড়িতে বসিয়ে 'আলেক, আলেক' বলে চেঁচায় এবং ক্ষুদ্র ঘণ্টা নেড়ে ধূপবাতি নারীর মুখের উপর ঘোরাতে ঘোরাতে পূজা দেয়। কপালে অন্নর টকটকে লাল ধ্যাবড়ানো ছোপ, টিপটাই ছেতরে গেছে। ওর বড় বড় চোখ গলে জলের ফোঁটা নিঃশব্দে ঝরে যেতে দেখে কেশব। দরবেশের পিছনে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে মনে হল একটি নারী অন্য একটি নারীর পূজা দিচ্ছে। কারণ, দরবেশও একটি লালপেড়ে শাড়ি পরেই নারী-অর্চনা করছে।

দরবেশ পূজা শেষে ঘাড় ঘুরিয়ে কেশবকে শুনিয়ে বলল, প্রকৃতির মন পাওয়া ভার কেশব সাঁই। তার কাছে যেতে হলে স্ত্রীবেশে যেতে হবে।

খুব ভোরে আরও এক দৃশ্য দেখল কেশব। ঘরের খুঁটি ধরে বিষণ্ণ মূর্তি নারী দাঁড়িয়ে রয়েছে, স্নানশুদ্ধ অন্নকে সুন্দর দেখাচ্ছিল, ঠোঁটে ওর হালকা হাসি লেগে রয়েছে। তার পায়ের কাছে পূজার ফুল চড়িয়ে যাচ্ছে ধূলিনগরের বউঝিরা। তাকে নির্বাক দাঁড়িয়ে পূজা নিতে হচ্ছে। এ কী দুঃসহ ছবি।

এই ছবিটাই কি তা হলে খুন হবে? গৌতমীর মনের কান্না শুনতে পাচ্ছিল কেশব।

হরচৌধুরীকে কোনও প্রশ্ন করতেই প্রবৃত্তি হল না কেশবের। সে জগদীশ মাস্টারের বৈঠকখানায় রাত্রে শুয়ে আকাশপাতাল চিন্তা করছিল। নদীর ধারের অন্য একটি কুটিরে শুয়ে রয়েছে হরচৌধুরী। কী মনে করে তড়াক করে বিছানা ছেড়ে লাফিয়ে উঠল ফাটা মঘাই। তার মনে হল, হরচৌধুরীকে বলা দরকার, গৌতমী কোনও দেবী নয়। আপনি মেয়েদের বলে দিন, পুজো নিতে বেচারি অন্নর বেজায় কষ্ট হয়। ওরা যেন অন্নর পায়ে ফুল না চড়ায়।

নদীর ধারের আলো-নেবা অন্ধকার কুটিরের বাইরের দাওয়ায় এসে পৌঁছল কেশব। তার মন হল, ঘরের ভিতরে বিদ্যুতের নীল নিষ্প্রভ আলো ফুটে আছে। দাওয়ায় খুঁটির কাছে নিঃশব্দে বসে পড়ল মঘাই। আচমকা কানে এল নারীকণ্ঠের অশ্রুসিক্ত কামার্ত ধ্বনি। ভিতরে হরচৌধুরী কাউকে ভোগ করছেন। হঠাৎই মেয়ে গলা বলল, আর কতদিন এই পাপ করবেন হরবাবু!

হঠাৎ দাওয়ার কোণে বিড়ির বিন্দুবৎ আলো চোখে পড়ল। ছায়ার অবয়ব দেখতে পেল কেশব। নারীকণ্ঠ শুনে বিড়ির আলো কাহিল মজা পেয়ে হে হে করে হাসল। কোণের আলোকবিন্দু বলল, পাপ নয় রে! এ হচ্ছে গুরুভোগ। হেঁ হেঁ। বাবু আমার কাছে তোকে রেখে পুষছে, তুই বাবুকে দমের কাজ শিখিয়ে দে গৌতমী। নবিপুরে ভরা সংসার রেখে তোর সঙ্গে কণ্ঠী বদল করলাম সাধে। বাবুই তো সংসারটি দেখেন অন্ন।

অন্ন কামার্ত যন্ত্রণায় বলে, কে জানত তুমি কত বড় মিথ্যুক। মা চৌধুরীর কথায় বিশ্বাস করে কণ্ঠী বদলে মত দিল। নবিপুরে গিয়ে কী হল! আগের বউয়ের সামনে আমাকে ...ছিঃ! একই বিছানায়, ছিঃ ছিঃ! আহ! হরচৌধুরী এই তোমার দেবীজ্ঞান ঠাকুর। পাছে অন্যের নজর পড়ে, তাই আমি সংসারের চোখে দেবী সেজে রইলাম। তুমি আমার দিদিকে ভুলতে পারনি, আমাকে ভোগ করার নামে তুমি কাকে পাও সোনার ঠাকুর। কাকে পাও? আমি কেশবকে বলেছি...

—কী বলেছিস অন্নপূর্ণা! ঘরের সোনার ঠাকুরটি ঘন আঠালো গলায় সম্ভোগবৃত্তে কথা বলে ওঠেন। দাওয়া ছেড়ে উঠে দাঁড়াল মঘাই। আলোর বিন্দু আঁতকে উঠে চেঁচাল, কে? কে ওখানে? সাবধান! আলেকসাঁই, হর হর হর হর!

কেশব এক লাফে পথে এসে নদীর কিনারা ধরে অন্ধকারে জোনাকির বিক্ষিপ্ত বায়ুপথ ধরে ছুটতে লাগল। অনেক দূর ছুটে এসে আকাশে একটি দপদপ করা নক্ষত্রের ঝলসানো মাংসে দোনলার ডবল 'গুলি' ছুঁড়ে দিল। দাওয়ার আলোকবিন্দু সন্ত্রাসে, ভয়ে, অকাট্য আতঙ্কে ডুকরে গেয়ে উঠল—শিশিবোতলে বদল মিঠা কুমড়া-আ-আ-আ! কেউ নাই, কিছু নাই। জ্বিন নাই, পরী নাই, দেউ নাই, দত্যি নাই হর। হর হর হর হর!

শূন্যে গুলিছোঁড়া দোনলা বন্দুকটা বিছানায় পাশে রেখে শুয়ে রইল কেশব। সারারাত একফোঁটা ঘুম এল না। অবোধ্য একটা ফলাঅলা খোঁচানো কষ্টে ছটফট করল। ভোরে সূর্যফোটা আলোয় নদীপাড়ে গাভীটাকে দেখল সে। মনে হল এত পবিত্র শুদ্ধতা তার চোখ সহ্য করতে পারছে না। অলৌকিক একটি প্রাণী যেন বা কোনও দেবীই ওখানে ঘাস ছিঁড়ে খাচ্ছে।

কেশব প্রাতঃকৃত্যের জন্য বাবলা-ঘেরা দূরের একটি ডোবার ধারে আসে। তারপর পিটুলির দাঁতন করে। হুড় হুড় করে নদীতে নেমে যায়। গামছাও সঙ্গে নিয়েছিল, মাথায় গায়ে নদীপাড়ের মাটি ঘষে চান করে। অতঃপর নদী পাড়ে উঠে সূর্য-প্রণাম এবং মর্ত্যের দেবীকে প্রণাম করে বলে—আমাকে তুমি বাঁচাও মা ভগবতী! শুচিতা দাও, শুদ্ধ করো দেবী! আমি যে গৌতমীর মুখ আর শরীর ভুলতে পারি না। গত পরশু রাত্রে একটা বিকট

স্বপ্ন দেখেছি। আকাশে শুকনো বিদ্যুৎ চিরে নামল দেবতা ইন্দ্র। তারপর গৌতম মুনির আশ্রমে এসে গৌতমপত্নীকে দেখে দেবতা কামার্ত হয়ে পড়ল। তখন ইন্দ্রজাল করল ঠাকুর, নিজেকে ষণ্ডে রূপান্তর করে মুনিপত্নীকে গাভী করে দিল। তারপর বনের ধারে গাভীকে গমন করল ষাঁড়টা। দেখলাম আবছা ষাঁড়টা মিলিয়ে যাওয়ার আগে আমার নাম ধরে ডাকছে! মনে হল, আমি কোথাও আকাশে মেঘ হয়ে কেঁদে বেড়াচ্ছি এবং গৌতমীর নগ্নদেহ খুঁজে বেড়াচ্ছি। কেন এমন হবে ভগবতী! তোকে ছুঁতেও আমার লজ্জা! তোর সাদা আগুনে আমি পুড়ে যাব অন্নপূর্ণা!

ঊষার আলোয় গাভীর কাছে এসেছে গৌতমী। ওর গালে চুলের মতো একটা চেরা দাগ। খানিক তফাতে দাঁড়িয়ে বলল, গুলি কেন ছুঁড়লে কেশব! চৌধুরীর সব সাহস সেই আওয়াজে ধসে গেল। তখন আমাকে মারল। ভোগে বিঘ্ন হলে মানুষ খুন পর্যন্ত করে জানো না। শোনো, দরবেশ ভয় পেয়েছে। হঠাৎ খালি বলে যাচ্ছে, হরকে হটিয়ে দেব অন্ন, শালাকে আর ধূলিনগরে রাখব না। বেহারি মাস্কেটিয়ারের খোঁজ পেয়েছি হিকমপুরে। বললে, আমি যাচ্ছি। কেন অমন করে বলছে মানুষটা! কী হবে গো! আমার পুরুষ কি পাগল হয়ে গেল!

গৌতমীর কথা শুনতে শুনতে বিকট দুর্বোধ্য মনে হল জীবনটাকে। কেশব আর কাউকেই বুঝে উঠতে পারছিল না। তবে হঠাৎই তার মনে হল, অন্ন ফাটা মঘাইকে ভীষণ ভয় পেয়েছে। অল্পক্ষণ গৌতমীর মুখের দিকে চেয়ে রইল কেশব। তারপর চোখ নামিয়ে নিল। মাথা নিচু করে জগদীশ মাস্টারের পায়রার টঙ-অলা বৈঠকখানার দিকে হেঁটে চলল।

সকাল আটটা নাগাদ মাস্টারের বাড়ির সামনে বাহক কাঁধে করে এসে দরবেশ দাঁড়িয়ে পড়ল। দুই বড় ডালা ভর্তি কাঁচের বোতল। বাহক কাঁধ থেকে নামিয়ে বলল, গঞ্জে মহাজনের কাছে বোতল দিতে যাচ্ছি কেশব ভাই।

—দুই ডালার দাম কত পাবে?

—পঁচাত্তর!

বৈঠক ছেড়ে সামনের পথ-লাগা আঙিনায় টঙের লোহার খুঁটির কাছে এসে দাঁড়াল কেশব। হাতে ধরা মাথা আঁচড়ানো চিরুনি। হঠাৎ সে চিরুনিটা ছুঁড়ে ফেলে দিল।

হরচৌধুরী এসেছেন। তাঁকে একবার চেয়ে দেখে কেশব বলল, এত চুপচাপ, নিষুত জায়গা ভাল-লাগছে না হরদাদা! পাখির ফাঁকা টিহি টিহি ডাক আমার ভাল লাগছে না। নদীর কুলু কুলু খুব মন খারাপ করায়। মাঠের ওই দিকে চাইলে বুকটা হু হু করে। ট্রামের ঘটাং ঘটাং না শুনলে ঘুম আসে না। আমার ধাতব জিনিসের ঘেঁষা লাগা শব্দ দরকার হরদা। আমাকে একটা কাজ দ্যান। বেহারিরা আসবে না। আমি একটা ছবি এঁকেছি। আচ্ছা দেখাচ্ছি! বলে ঘরের ভিতর থেকে টেনে একখানা অঙ্কিত ছবিকে জড়ানো ম্যাপের মতো খুলে ধরল কেশব। সেই ছবি বাড়ি থেকে ছুটে আসা অন্নরও চোখে পড়ে গেল। হাতে ধরা একটি বাটি।

আঁতকে উঠল গৌতমী। বাহকে ঝোলানো দুটি ঝুলন্ত ডালার ছবি, কোনও মানুষ নেই।

কেশব অদ্ভুত কাতরতায় ভেঙে পড়ে হরচৌধুরীর পায়ে ধরে বলল, আমাকে একটা কাজ দেন বাবু। ফাটা মঘাইয়ের মাথার ঘা চিড়িক দিচ্ছে বিধায়ক। মঘাই আর পারছে না দাদা।

—কাজ তুমি পেয়েছ কেশব। রক্ষীর কাজ। পাও নাই?

—না।

—তাহলে তুমি রাত্রে ওইভাবে ‘গুলি’ ছুঁড়লে কেন বজ্জাত! মনে রেখো, তুমি কাউকে মারতে আসোনি, বাঁচাতে এসেছ। তুমি রক্ষী, রক্ষা করবে।

—হ্যাঁ। কিন্তু আমার ধাতু-ঘর্ষণ চাই। শব্দ চাই। আকাশে আমি মেঘের মতো কেঁদে বেড়াচ্ছি কেন! বজ্রধোঁয়ায় একটি ষাঁড় নেমে আসছে হরদা! বাজের ধোঁয়া আর বৃষ্টির ঝাঁটলাগা ধোঁয়ার মতো কী সব মগজে ঢুকছে দাদা গো! গৌতমীর পায়েসান্ন পেলাম না বিধায়ক। দরবেশ দুধে চোনা ফেলে সব মাটি করে দিল।

—তুমি পাগলামি করো না কেশব। অন্নকে মানুষ ফুল চড়ায়। রাধা সহবতে দরবেশ প্রকৃতির ঘর করে। ধর্মমতে আমি ওই দুইটি উদ্বাস্তুর গোঁসাই কেশব। তুমি অন্ন পাচ্ছ, সিকিউরিটি পাচ্ছ, পায়েসান্ন চাইতে নেই। তোমাকে দেখবার জন্য গাভী আর নদী আর মাঠ দিয়েছি। এই বসত আমার গড়া, এর শান্তিকল্যাণ আমার হিফাজত। তুমি ফেরারি লোক। বটম না দিলে আমি তোমাকে নিতামই না। যাও, পা ছাড়ো। কাজ তুমি পেয়েছ আর কোনও হাঁকডাক কোরো না, বডিগার্ড কথা বলে না। বলে? বলে হরচৌধুরী কেশবের কাঁধ খামচে ধরে টেনে খাড়া করে তুললেন।

হঠাৎ তারপর ধূলিনগরের বিধায়ক বললেন, খালি গা কেন? জামা পরে নাও। শোনো, গ্রাম্যহিংসার একটি উত্তম নিঃশব্দ ব্যবহার আছে। হিংসার সেই ব্যবহার আমি জানি। তুমি নয়। কেমন? যাও, জামা নিয়ে এসো ঘর থেকে। যাও বলছি।

প্রথমে থতমত খেয়ে কেশব বৈঠকখানার ভিতরে চায়। কিন্তু নড়ে না। আচমকা দরবেশের ডালা থেকে একটি পেটমোটা লম্বা বোতল তুলে নেয় হেঁচকা টানে। তারপর লোহার খুঁটি পোতা পায়রার টঙের চালিতে চোখ শূন্যে তুলে তাকায়। এবং বোতলটা চকিতে লোহার খুঁটিতে আছড়ে ফেলে। পায়রাগুলো লোহার খুঁটির বয়ে যাওয়া মচকানো চূর্ণ তরঙ্গের সাড়া পেয়ে চালি ছেড়ে উড়ে পটপট করে ডানা ঝাপটে চালিতেই ফিরে এসে বসে।

সেই কাঁচভাঙার আওয়াজে শিউরে উঠে দুর্বোধ্য কাতরানি করে অন্ন। লক্ষ করে রাতজাগা কেশবের চোখ মুহূর্তে লাল হয়ে উঠেছে। উন্মাদ মনে হচ্ছে তাকে। সে বোতলটা ভেঙেই নিরস্ত হয় না। খেপে গিয়ে একটার পর একটা বোতল তুলে নিয়ে লোহায় আছড়ায়, চূর্ণ করে চলে। সারা আঙিনা এবং পথ ভাঙা এবং বিচূর্ণ কাঁচে ভরে যায়। দরবেশ একবার হাহা করে উঠে ভয়ে থেমে যায়।

কেশব কেবল ধমক দিয়ে থামিয়ে দেয় তাকে। এবং নেচে পাক দিয়ে বোতলের আছাড় দেয় লোহার খুঁটির ধাতু-সংঘর্ষে। মুখ দিয়ে বুগবুগ শব্দ করে। সে ঘেমে নেয়ে ওঠে। তার মাতলামি আরও বেড়ে যায়। অদ্ভুত যোগ এটাই যে, গৌতমী কেশবের জন্য রাত্রে করা পায়েসান্ন রাত্রে দিতে না পেরে হরচৌধুরীকে দেহের ভোগ দিতে গিয়েছিল। এখন সেই পায়েসান্ন সে বাটিতে করে এনেছে স্নানশুদ্ধ পুরুষের ক্ষুধার কাছে। সে বলে উঠতে পারছে না, তোমার জন্য এনেছি ফাটা মঘাই। তুমি নাও, গ্রহণ করো।

সমস্ত ভেঙে ফেলল কেশব। ডালা শূন্য করে দিল। রইল মাত্র একটি অবশিষ্ট বোতল। সেটা হাতে নিয়ে আধখানা ঝরিয়ে এবড়োখেবড়ো আধখানা হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরে তেড়ে এল দরবেশের বুক লক্ষ করে। টঙের চালি ঘিরে পটাপট বাজি দিয়ে ফিরছে সন্ত্রস্ত শাদা পায়রা। ভয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে দরবেশ মাটিতে বসে পড়েছে, হরচৌধুরীর মুখ শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে।

অকস্মাৎ অভিনব এক দৃশ্যে ঢুকে পড়ল কেশব। আঙিনায় চূর্ণ এবং আধভাঙা বোতলের আস্তরণে খালি পা ফেলে হেঁটে চলে গেল সে। দু'পা বিক্ষত করে কাচ রক্ত ঝরিয়ে পায়ের পাতা ভিজিয়ে তুলল। হা হা করে হেসে উঠল ফাটা মঘাই এবং হঠাৎ একসময় গৌতমীর কান্না শুনতে পেল—তোমার জন্য ধলী গাইয়ের পায়েসান্ন এনেছি কেশব। তুমি থামো।

কেশব আস্তরণের ওপাশে থামল বটে কিন্তু চিৎকার দিয়ে ডেকে উঠল, চলে এসো অন্ন। কাঁচের ওপর দিয়ে এসো, আমার খিদে পেয়েছে গৌতমী। চোখে কেশবের জল চকচক করছে।

কী যে হল তার, সেই অন্নের, কী যে উন্মাদনা, কী তীব্র কামনার উথাল দিল মন, কী অপূর্ব সাহস দেখাল তার ব্যাকুল শরীর, যেন সে বাস্তবিক পাগলই হয়েছে।

—দেবীর ভয় কিসের অন্ন! চলে এসো! এই একটা ডাকেই গৌতমী তার নিজেকে বেঁধাতে থাকল কাঁচে। মানুষ দেখেছিল দরবেশের বউ আসলে রক্তমাংসের মানুষ। তার পায়ে রক্ত ঝরে, তার কোনও অলৌকিক ক্ষমতাই নেই। পায়ে কাঁচবেঁধা মানবী কাঁচচূর্ণ পেরিয়ে তার এক আশ্চর্য পুরুষের বুকে ঢলে পড়ল।

পরের দিনই প্রান্তরে বয়ে চলা সবুঁজ বাঁকা নদীর বাঁকে জিয়ালার সারবাঁধা ছায়ার নীচে নীল মাছি কষে করে মরে পড়েছিল বুকে ভাঙা এবড়ো খেবড়ো বোতল বেঁধা ব্যাপারি খোকন সিকদার ওরফে দরবেশ।

বটমদার ডাক পেয়ে অন্ধ গলিতে ফিরে যাচ্ছে ফাটা মঘাই। ওকে আর বুলেট মোটরবাইকের পিছনে বসিয়ে নিতে সাহস পেলেন না বিধায়ক। তাকে একটি পুলিশজিপে তোলা হয়েছে, ধলী গাইটাও নদীর ধারে মরে পড়ে আছে। হিংসার একটি তীব্র দাহ মুখে নিয়ে আগুনস্রোত ঢুকে পড়ল শিরিন নদীর তীরে।

হরচৌধুরী মঘাইকে বললেন, তোমার নামে চৌদ্দ নম্বর খুনের মামলা ঝুলে গেল

কেশব।

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

—ভয় পেও না। আমি আছি। তোমাকে আবার আমি ফিরিয়ে আনব।

—আজ্ঞে না কলকাতায় অন্ধ গলিতেই আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবে। এখানে দেবী রইল। ওকে কে দেখবে?

—আমি।

—না মশাই। ওই দেখুন, মেয়েটা খুনির জিপের পথ আটকেছে।

কেশবের কাছে ছুটে এল অন্ন। দুটি হাত জড়িয়ে ধরে আকুল হয়ে জানতে চাইল, তুমি দরবেশকে মারতে পারলে!

কেশব বলল, আমি দু'পায়ে উঠে দাঁড়াতে পারি না গৌতমী। কাঁচে পা দু'খানা আস্ত নেই। অত দূরের মাঠে দরবেশকে কে খুন করতে যাবে! হাঁটলে রক্ত পড়ে অন্ন। খুব কষ্ট হয়।

হতবাক অন্ন কেশবের হাত ছেড়ে দিতে দিতে চরম বিস্ময়ে দূর দিয়ে একটি বুলেট মোটরবাইবাইক চলে যেতে লক্ষ করে। হরচৌধুরীর মুখ মাথা হেলমেটে ঢাকা। অন্নর দু'চোখ ঝাপসা হয়ে আসে। সে ছুটন্ত জিপের পিছু পিছু ছুটতে থাকে।

হাওয়া একটি সংকেত

সমরেন্দ্রকে তার ঠাকুরদা মৃত্যুর কিছু দিন আগে ইশারায় কাছে ডেকে বললেন—তোমাকে আমি কিছু একটা চুপি চুপি দিয়ে যেতে চাই সমু। কী চাও বল। আচ্ছা বেশ আমিই বলছি। তোমরা শুনেছ, আমার কাছে লুকনো মোহর আছে। কিন্তু কোনও কালে সেই মোহর চোখে দেখনি। ইদানীং আমার ছেলেমেয়েরা বলাকওয়া করে শুনতে পাই, আমার কাছে আসলে কিছুই ছিল না, নেইও। তুমিও কি তাই মনে কর?

সমরেন্দ্র লাজুক গলায় বলল—আজ্ঞে ঠাকুরদা, তোমার কাছে কী আছে না আছে, ভেবেই দেখিনি কখনও। থাকলে আছে না থাকলে নেই। যদি থাকে, একদিন নিশ্চয় জানা যাবে। তুমি কি আর বলে যাবে না? তুমি তো আর সেই সব সঙ্গে করে চিতা পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যাবে না!

—মানুষ তা-ও যায় সমু। তবু আমি অমন বেআক্কেলে কাজ করব না। আমার চিতার পাশে দাঁড়িয়ে ছেলেমেয়েরা কাড়াকাড়ি, কামড়াকামড়ি করে মরবে, ওদের আমি এইভাবে নিজেদের মধ্যে লড়িয়ে দিতে চাই না। সেই জন্যই তোমাকে ডেকেছি।

—আমাকে কেন ঠাকুরদা! আমি তো তোমার মোহরটোহর বুঝি না। ও তুমি অন্যদের ডেকে দিয়ে দাও।

—তুমি তাহলে বিশ্বাস করো?

—কী?

—আমার আছে! সত্যিই আমার কোনও লুকনো বস্তু রয়েছে!

—তুমি অবাক করলে, থাকবে না কেন। বা, না থাকলেই বা কী!

—না থাকলে, অনেক কিছু সমরেন্দ্র। জীবন যে একটা নাটক, সে তুমি পদে পদে বুঝবে। নাটকের শেষ দৃশ্যে দেখা যাচ্ছে, সত্যিই আমার গোপন কিছু ছিল না, আমি আলেকজান্ডারের মতো খালি হাতে ফিরে যাচ্ছি। লোকে বলবে, আরে দেখ-দেখ, লোকটা মরে গিয়েও হাত পেতে রয়েছে। এখনও চাইছে, কী আশ্চর্য।

—তুমি যখন মরে যাবে ঠাকুরদা, কথা দিচ্ছি, মৃত্যুর পর তোমার হাত দুটো আমি মুঠো বেঁধে দেব। তুমি সোনামুঠি হয়ে মরবে। তুমি অনেক দিয়েছ আমাদের, লোকে দেখবে, মৃত্যুর পরেও তুমি অনেক কিছু সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ, তোমার দু' হাত উপচে পড়ছে। কী, তুমি খুশি তো?

নতির কথা শুনতে শুনতে ঠাকুরদার চোখে জল এসে পড়ল। তিনি চোখে জল নিয়ে হাহা করে হেসে উঠলেন। তারপর গলায় ভেজা স্বর গাঢ় করে বললেন—তুমি

কবি। তোমার অনেক কল্পনাশক্তি, ঠিক আছে, আমি সোনামুঠি হয়েই মরব। মৃত্যুর সংকেত ঘন ঘনই এসে পড়ছে, বুঝতে পারছি যেতে হবে। এখন শ্বাসকষ্ট হলে মুঠো বেঁধে রাখব। ঘুমের মধ্যে চলে গেলেও হাত খুলে রাখব না। তুমি সেই মুঠো দেখিয়ে, আমার মৃত্যুর পর, অন্যদের বোলো, ঠাকুরদা ওঁর সব গোপন জিনিস সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেলেন। কিন্তু আমি তোমাকে, শুধুমাত্র তোমাকে, সত্যিই কিছু দিয়ে যাব। এই নাও... বলে বিনয়েন্দ্র তাঁর বালিশের তলা থেকে একটি পুরনো মোটা মার্কিন কাপড়ের থলে টেনে বার করলেন।

সমরেন্দ্র যথেষ্ট বিস্মিত হল, বিস্ময়ের সুরে জানতে চাইল—এতে সত্যিই কী আছে?

—আছে বইকি। আশরফি মুদ্রা। আমি সারা জীবনেও খরচ করিনি।

—কেন করলে না?

—তুমি নিশ্চয় করবে সমরেন্দ্র। করবে না?

—হ্যাঁ করাই তো উচিত। তুমি করনি কেন, ভেবে আশ্চর্য হচ্ছি। দ্যাখো, যক্ষের কনসেপ্ট আমার একদম পছন্দ নয়।

—এ কোনও যক্ষের ধন নয় সমু। এ হচ্ছে, গুমোর। সবাই বলছে, আমার সত্যিই কিছু ছিল না। কেন বলছে, ওরা পেল না বলে রাগে রটাচ্ছে, আবার মনে মনে ভাবছে, থাকতেও পারে। সামনে এসে আমাকে ঘাঁটাতে সাহস পাচ্ছে না। এই গুমোরটা না থাকলে মানুষ আমাকে ফেলে দিত।

—আমি দিতাম না ঠাকুরদা।

—তোমার তো চাকরি-বাকরি হয়নি, কী করে রাখতে আমাকে!

—এই তোমার আশরফি টাকা, এ দেখছি অনেক, তাই দিয়ে....

—তাই দিয়ে টানা এই জীবনটা পার হয়ে এলাম। সবাই জানত, আমার আছে। আমিও জানতাম আছে। যা আছে, তাকে দেখাতে নেই। এই সব জিনিস, না দেখালেই তার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। তখন হয় কী, এটাই হয়ে দাঁড়ায় একটা অপরিমেয় শক্তির উৎস। অন্যে তা সামান্যই বুঝবে, কিন্তু তুমি অনুভব করবে অনেক বেশি। নাও, রেখে দাও।

আশরফি মুদ্রার থলেটা সমরেন্দ্রর কোলে ফেলে দিলেন ঠাকুরদা। সমরেন্দ্র কিছুক্ষণ থলেটার দিকে হতবাক হয়ে চেয়ে রইল। তারপর অতি সন্তর্পণে সেটাকে স্পর্শ করল এবং এক হাতের মুঠোয় চেপে ধরল। ক্ষীণ কণ্ঠে বলে উঠল, তুমি আমায় খুব ঝামেলায় ফেললে ঠাকুরদা। এ জিনিস এখন আমি কোথায় রাখব! কেউ যদি দেখে ফেলে!

—অন্যে দেখবে কেন! আমি তোমাকে বন্দোবস্ত দেখিয়ে দিচ্ছি, এসো। যার থাকে, সে রাখতেও শিখে যায়।

—চোর-ডাকাতের উপদ্রব হবে।

—না হবে না। তুমি তো কাউকে বলতে যাচ্ছ না, কোথায় কী রেখেছ। বলে

বিনয়েন্দ্র নাতিকে তাঁর বিশাল আইনি গ্রন্থের আলমারির কাছে নিয়ে এলেন। তারপর বললেন—আলমারির পিছনে দক্ষিণের এই কোণের দেওয়ালে একটা কাঠের ঢাকনা আছে, ধাক্কা দাও। তার আগে, দরজায় খিল এঁটে এসো, কেউ যেন না ঢুকে পড়ে।

সমরেন্দ্র বলল—এ যে দেখছি, রহস্য রোমাঞ্চ গল্পের মতো ঠাকুরদা।

—না হে ছোকরা। সাদামাটা সিনেমার গল্প নয়। ও হচ্ছে, কী বলে, এতে তুমি রবীন্দ্রনাথের 'গুপ্তধন' গল্পটার গন্ধ পেতে পারো। তা-ও নয়, এটি অন্য কাহিনী।

—এতে কোনও ধাঁধা-সংকেত, এই সব রেখেছ নাকি!

—তা বইকি। তেমনটা যদি হয়, জীবনের রোমাঞ্চ তাতে বাড়ে বই কমে না।

—তুমি হেঁয়ালি করছ!

—হাঃ হাঃ হাঃ!

কাঠের ঢাকনাটা দেয়ালের রঙের সঙ্গে এমনই সদৃশ রঙে মেলানো এবং দেয়ালে গাঁথা যে, বোঝাই যায় না, এটা দেয়াল নয়। ঠাকুরদা তাঁর হাতটা কোণের দিকে নিয়ে যাওয়া মাত্রই ঢাকনা আপনা থেকে ঠেলে খুলে এল।

বিনয়েন্দ্র নাতিকে বললেন—এর চাবি হল এই আংটিটা, নাও, তোমার আঙুলে গলিয়ে নাও।

—আমার হবে!

—হবে বইকি!

—এই আংটিটা আগেই একদিন তোমার কাছে চেয়েছিলাম, তুমি দাওনি।

—হ্যাঁ দিইনি। তোমার অনামিকায় লাগে ভালো, তা-ও দেখেছি। আজ থেকে তোমার আঙুলেই এটা থাকবে। দিন যত যাবে, এটা তত তোমার আঙুলে সেঁটে উঠবে। আঙুল কামড়ে পড়ে থাকবে।

—হারিয়ে গেলে?

—যাবে কেন। আগেই পরীক্ষা করে দেখে নিয়েছি, তোমার আঙুলই এর উপযুক্ত।

—এতে কি চুম্বক আছে?

—প্রশ্ন কোরো না। চাবিকে মানুষ প্রশ্ন করে না। চাবিকে ব্যবহার করে মাত্র।

প্রশ্ন আর করেনি সমরেন্দ্র। আইনি গ্রন্থের আলমারির আড়ালে গৃহকোণে গচ্ছিত রইল তার মোহর, যা সে থলের উপর দিয়ে স্পর্শ করেছে, কিন্তু চোখে দেখেনি। আঙুলের আংটিটা তাকে সর্বক্ষণ মনে করিয়ে দেয়, আছে, তোমার রয়েছে, তুমি নিঃস্ব নও, নিঃসহায় নও, তোমার রয়েছে রহস্যময় এক শক্তির উৎস, জীবনের মহার্ঘ পাথেয়। কেমন তাঁর রঙ, কেমন তার আকৃতি, কী তার বিভা, কত তার মূল্য, কিছুই জানো না তুমি, কিন্তু যা আছে, তা সবার থাকে না।

ঠাকুরদা মারা গেলেন, খাটিয়ায় শোয়ানো হয়েছে তাঁকে, সাদা কাপড়ে ঢাকা দেওয়া মৃতদেহ। একটি হাতের মুঠো কাপড়ের বাইরে বেরিয়ে রয়েছে যেন সোনামুঠো

বিধৃত জীবন। এইভাবে মুঠো বেঁধে মরবার সঙ্কল্পেও মানুষ জয়ী হয়? এই সামর্থ্য তাঁকে দিয়েছিল আশরফি, অদেখা মোহরগুলি এবং এই আংটি।

আংটিটার দিকে যতবারই চেয়ে দেখে সমরেন্দ্র, ততবারই সে চাপা একটা সুন্দর আনন্দে প্রমত্ত হয়ে ওঠে, তার সেই মত্ততা চোখেমুখে ফুটিয়ে তোলে গভীর আত্মবিশ্বাস।

তবে এই আংটির মোটেও কোনও সৌন্দর্য নেই। ডান হাতের অনামিকায় একটি কালো রঙের ধাতব বস্তু বলয়িত হয়ে রয়েছে। একদিন সমরেন্দ্রর ডান হাতখানা মুঠোয় নিয়ে খেলা করতে করতে মধুরিমা ওরফে রিমা বলল—এমন বিশ্রী একটা আংটি আঙুলে, ছিঃ! পারও তুমি। খুব বুঝি পয়া?

—না রিমা, পয়াটয়া কিছু নয়। আংটি পরে, পাথর ধারণ করে ভাগ্য ফেরে, এইসব বুজরুকি আমি বিশ্বাসই করি না। এটা রেখেছি, ঠাকুরদা দিয়েছিল বলে। ঠাকুরদার স্মৃতি।

—তোমার সেই মোহরঅলা পূর্বপুরুষ! কিন্তু শুনেছি, সবটাই নাকি ভাঁওতা! বলেই মধুরিমা আরক্ত অপরাধে বলে উঠল—সরি, তুমি কিছু মনে কোরো না প্লিজ! শোনা কথা, যা শুনেছি...

সমরেন্দ্র তার ডান হাতটা রিমার মুঠা থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আংটিটার দিকে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতে থাকতে শব্দ করে হেসে উঠল। হেসে উঠে বলল—মনে করার কিছুই নেই রিমা। মৃত্যুর পর দেখা গেল, ঠাকুরদার আসলে কিছুই ছিল না। তাঁর সন্তান-সন্ততিরা ক্ষেপে গেল। মোহরটহর আসলে গুজব। এই রকম গুজবেপনার মানে কী? কিন্তু আসল ব্যাপার খুবই গোপনীয় মধুরিমা। মোহর আছে।

—আছে! কোথায়? যথেষ্ট অবাক হল মধু।

—কোথায় আছে, বলতে পারব না। তবে আছে।

—তুমি দেখেছ?

—না। দেখিনি। স্পর্শ করেছি। মনের ভিতরে রয়েছে। থলেটা একদিন ছুঁয়েছি।

—সেকী! আমায় বলোনি কেন?

—কাউকেই বলিনি।

—আমাকেও বলা যায় না?

—বলিনি এই জন্যে, ওই মোহর চরম বিপদে পড়লে তবে খরচ করা যাবে। ঠাকুরদা জীবনে খরচ করেননি। আমাকে বলে গিয়েছেন খরচ করতে। কিন্তু আমি করব না।

—সাংঘাতিক সঙ্কটেও করবে না?

—তা করব।

—তাহলে সেটা এখনই করা দরকার।

—কেন?

—লাখখানেক টাকা ঘুষ দিলে তোমার এই চাকরিটা হয়ে যায়। আমরা বিয়ে

করতে পারি। আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না সমর! বাবা-মা চাপ দিচ্ছে, দাদা তো বলছেই, যা করবার করে ফ্যাল। নইলে অন্যত্র ব্যবস্থা আছে।

—তাই নাকি?

—হ্যাঁ নিশ্চয়।

—অন্যত্র ব্যবস্থা আছে বলছ?

—আমি বলছি না, দাদা বলছে।

—তুমিও কি বলছ না?

সমরেন্দ্রর এই উক্তিতে মধুরিমা প্রচণ্ড রেগে গেল। রাগে মৃদু ফুঁসে উঠে বলল—ঠাকুরদার মোহর যদি সত্যিই থাকে, তাহলে আমিও বলছি বইকী।

—কী বলছ?

—অন্যত্র ব্যবস্থা নিশ্চয় আমার আছে। কিন্তু তুমি এই মোহর খরচ করতে বাধ্য।

—তাই নাকি!

—আবার তুমি 'তাই নাকি' বলছ। কেন বলছ? আমাকে হারাতে তোমার একটুও কষ্ট হবে না? আমি নেই, মোহর রয়েছে, তাইই কি ভালো হবে তোমার?

—ওহ, তাহলে তোমাকে কাঞ্চনমূল্যে কিনতে হবে মধু?

—এর মানে কী এই?

—হ্যাঁ। আমি দুটি জিনিস কখনও করব না। ঘুস দিয়ে চাকরি আর মোহর ভেঙে বিয়ে।

—ঠিক আছে। আমারও দাম আছে সমরেন্দ্র। আমি চলি। বলে পার্কের কাঠের বেঞ্চ ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল মধুরিমা, তারপর এক পা এগিয়েও গেল। সমরেন্দ্র এক ধরনের বেদনায় বিমর্ষ হয়ে উঠল।

ভারী গলায় সমরেন্দ্র বলল—তোমার দাম নেই, এ কথা কে কবে বলেছে রিমা। প্রশ্ন হচ্ছে দামটা তুমি কার কাছে চাইছ?

—তোমার কাছেই চাইছি সমর। ঝটিতি ঘুরে কান্না চেরা গলায় বলে উঠল মধু।

—না। তুমি দাম নয়। আমার কাছে মোহর চাইছ। বলে ওঠে সমর।

—ওহ, তাই বুঝি। এত আমার লোভ সমরেন্দ্র! তাহলে তো আমাকে তোমার বিয়ে করাই উচিত নয়। শোনো, তোমার মোহর কীভাবে কবে তুমি খরচ করবে, তা তোমারই ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু আমি আর অপেক্ষা করতে পারছি না।

—বেশ তো, তাহলে আমরা, এসো বিয়ে করে ফেলি।

—তারপর?

—দু'জনে টিউশন করে আপাতত চালাব। চাকরির চেষ্টা চলবে।

—এই সাহস কোথায় পেলে? ঠাকুরদার পরামর্শ বুঝি!

—হ্যাঁ।

—বাঃ, চমৎকার! দ্যাখো, সমরেন্দ্র, তুমি অদ্ভুত। জীবনের এই কৃপণতায় শেষ

পর্যন্ত প্রেমটাই মাটি হয়, সম্পর্কও বাঁচে না।

—আশরফি মুদ্রা খুব খাঁটি জিনিস মধু। প্রেমটাও খাঁটি হওয়া চাই। যেই শুনলে, মোহর আছে, অমনি তোমার অপেক্ষার ধৈর্য শেষ হয়ে গেল। তুমি একটা শর্টকাট রাস্তা বার করে ফেললে।

মধুরিমা এবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সমরেন্দ্রকে যেন মেপে নিচ্ছিল, তীব্র একটা আগুনও যেন ঠিকরে উঠতে চাইছিল সেই দৃষ্টির প্রক্ষেপে। হঠাৎ সে বলে ফেলল—তোমার সঙ্গে আমার আর মিলবে না সমর। দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা।

সমরেন্দ্র বলল—আমারও তাই মনে হচ্ছে।

—তুমি খুব সেকেলে।

—হ্যাঁ তাই।

—নইলে ওই রকম একটা বদখত আংটি ধারণ করে গর্ব বোধ করতে না।

—বটেই তো। কিন্তু যাবার আগে শুনে যাও মধু, এটা আমার পরম ধন। এ দিয়ে একদিন আমি গুপ্তধনের দরজা খুলব। এটা আংটি নয়, এটা চাবি।

—আচ্ছা, তোমার সত্যিই কি মোহর আছে সমরেন্দ্র?

—সংশয়ীর সঙ্গে প্রেম হয় না মধুরিমা। প্রেম একটা সোনামুঠি, তাকে বাঁধতে জানতে হয়। কষ্ট হচ্ছে, আমি তোমাকে ঠিক করে কখনও পাইনি। মোহর ভেঙে পেতে হলে আধুনিক আর হলাম কীসে! আমার সেকেলে থাকাই ভালো। বলে বেঞ্চে বসা সমরেন্দ্র ঘাড় নিচু করল, যেন সে খুব লজ্জা পেয়েছে।

বাড়ি ফিরে বিছানায় শুয়ে সারারাত ছটফট করল সমরেন্দ্র। কিছুতেই ঘুমাতে পারল না। মধুরিমার সঙ্গে তার সম্পর্ক কি তাহলে শেষ হয়ে গেল! তার কেবলই দুঃখ হচ্ছিল, মধু তার কথা একফোঁটাও বুঝতে পারল না, চাইলও না বুঝতে। মোহর শোনামাত্রই তার চৈতন্যের ভাষা কেমন বদলে গেল। মানুষটাই বদলে গেল। মধু খেয়ালই করল না, ঠাকুরদা সমুকে সাধারণ টাকা পয়সা কিছু দিয়ে যাননি। তা নামমাত্র মুদ্রা, কিন্তু আসলে তা আশরফি পুরনো জিনিস, কোনও এক পূর্বপুরুষের সঞ্চয়। এ বস্তু চোখেও দেখেনি সমরেন্দ্র।

ঠাকুরদা বলে গেছেন, 'যা আছে তাকে দেখাতে নেই। এই সব জিনিস না দেখালেই তার ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। তখন হয় কী, এটাই হয়ে দাঁড়ায় একটি অপরিমেয় শক্তির উৎস।'

সাধারণ টাকাপয়সার চরিত্র কি এই রকম? তা কি কখনও অপরিমেয়? ঠাকুরদা শুধু থলেটা হাতে তুলে দিলেই পারতেন—এই সব অদ্ভুত উপলব্ধির কথা বলতে গেলেন কেন? এমন করে বললেন যে, সত্যিই থলের মধ্যে কী আছে, কেমন তার চেহারা, একবারটি দেখারও বাসনা হল না সমুর?

কোনও কথা মন দিয়ে শোনার ধৈর্য মধুরিমার ছিল না। এমনকী সমুর কাছে মোহর যে সত্যি সত্যিই রয়েছে, তা পর্যন্ত বিশ্বাস করতে চায়নি। কেন চাইল না? ঠাকুরদা

বলে গেছেন, 'অন্যে তা সামান্যই বুঝবে, কিন্তু তুমি অনুভব করবে অনেক বেশি।'

অনুভব শব্দটি এক্ষেত্রে আসে কেন? কোনও মুদ্রা কি অনুভবের বিষয়বস্তু? হা ঠাকুরদা। এ তুমি কী অনর্থ করে গেলে। কাকে বোঝাব এখন, কেউ তো বুঝবে না।

ঠাকুরদা এই মোহর খরচ করেননি কেন, মধুরিমা একবার ভেবেও দেখল না। গচ্ছিত গহনা পর্যন্ত মানুষ সহজে ভাঙতে চায় না, আর এ তো বহু পুরনো আশরফি মোহর, এর একটি ঐতিহাসিক মূল্যও তো আছে। বলা মাত্র এটাকে ভেঙে ফেলতে হবে!

পার্কের ওখানে, চলে যাওয়ার সময় মধু বলে গেল—তোমার সঙ্গে আমার আর মিলবে না সমর। দু'জনের দৃষ্টিভঙ্গিই আলাদা।

ঠাকুরদা স্বর্ণমুষ্টি বেঁধে মরেছেন, যা বলেছেন, তাই করেছেন। এই মানুষ যখন অনুভবের কথা বলেন, তখন কি আমি সত্যিই কিছু অনুভব করি না?

তীব্র কষ্ট পেলেও সমরেন্দ্র কোনও এক আশ্চর্য অনুভবে স্থির রইল, মধুর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টাই করল না। এদিক ওদিক একলা ঘোরাঘুরি করল। চাকরির জন্য বিভিন্ন স্থানে দরখাস্ত পাঠাল। দু'জায়গায় ইন্টারভিউ দিয়ে এল। টিউশনে যেতে হয়, নিয়ম করেই গেল সে। কিন্তু মনের বিষণ্ণতা ঘুচতে চাইল না। মুঠিবাঁধা ঠাকুরদার হাত তার সম্মুখে বারবার উঠে আসতে থাকল।

এক গাঢ় বিকেলে সমু ঠাকুরদার ঘরে আইনি গ্রন্থ-আকীর্ণ বৃহৎ আলমারির সামনে একটি চেয়ারে অবসন্ন মনে চুপচাপ বসেছিল। তার সামনে লম্বা আবলুস কাঠের টেবিল ফাঁকা পড়েছিল। তার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল, রিমার জন্যই হয়তো ওই শূন্যতা।

বাইরে পাকা ফলের মতো গাঢ় রোদ গাছপালার আলোড়নে কাঁপছে এবং ধীরে ধীরে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। ভিতরে ঘোরলাগা রোদের গন্ধ, সঙ্গে এক ধরনের প্লাবিত সিসে রঙের ছায়া ধৌত করছে আইনের সমুদ্রকে। সমু হঠাৎ ভাবল, অনামিকায় এই অঙ্গুরীয়র সত্যিই কি মানে আছে, এর চুম্বকত্বই কি তাকে বিবশ করেনি? এই আংটি কি আসলে কোনও জাদু? আচ্ছা, ওই থলের মধ্যে বাস্তবিকই মোহর আছে তো?

এই সংশয় সমুকে মুহূর্তে অপরাধী করে তোলে। ছিঃ ঠাকুরদা, এ আমি কী ভাবছি! ভাবতে ভাবতে চেয়ার ছেড়ে ঘরের দক্ষিণ কোণে চলে আসে সমরেন্দ্র। আলমারিটাকে দু'হাতে ধাক্কা দিয়ে একটুখানি ফাঁক করে নিয়ে ভিতরে গলে যায়। সম্পূর্ণ গলে না, শরীরের অর্ধাংশ বাইরে থাকে। কোণের দিকে অনামিকা আঙুলের আংটিটা ধীরে ধীরে নিয়ে যায় ঠেলে, আঙুলের আংটিটা এগোয়। হঠাৎ ঢাকনা খোলে নিঃশব্দে। তখনই কণ্ঠস্বর ভেসে ওঠে—সমু! কোথায় তুমি?

মধুরিমার গলা। ক্ষিপ্র ভঙ্গিতে বাইরে ছিটকে আসে সমরেন্দ্র। সে একদম মূঢ় নির্বাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন সে ধরা পড়ে গেছে। হঠাৎই অপ্রতিভ ভঙ্গিমায় গা দিয়ে কোণের আলমারির অংশ ঠেলে দিতে থাকে।

—ওখানে তুমি কী করছ সমু?

—কিছু না রিমা, এই একখানা বই, মনে হল, ফাঁকে গলে গেছে।

—তুমি আইনের বই পড়ো?

—ওই আর কী, একটু আধটু দেখি।

—বইটা পেয়েছ?

—না।

কাছে এগিয়ে আসে মধুরিমা। সমরেন্দ্রর ডান হাতখানা নিজের হাতে তুলে নেয়। বলে—বই নেই, অথচ বই খুঁজছ?

—না, মানে। কী হল, ঠিক বুঝতে পারছি না, কী খুঁজছি বলো তো!

মধুরিমা হালকা সুরে খিলখিল করে হেসে ওঠে। তারপর কেমন এক রহস্যময় গলায় মধু বলে—তোমার এই আংটিটা আমাকে দেবে সমু? আজই আমাদের পাকা দেখা হয়ে যাবে। আমি আর তোমার কাছে কিছুই চাইব না।

মধু যেন সমুর হৃৎপিণ্ডটাকেই মুঠোয় চেপে ধরেছে। সমরেন্দ্রর মুখ রক্তশূন্য সাদা হয়ে গেছে।

—দেবে না? বলে উঠল রিমা।

কী যে হল, সমরেন্দ্র আংটিটা আঙুল থেকে খুলে ফেলল। বোকার মতো এগিয়ে এল সোফার কাছে। রিমাকে বসাল সোফায়। তারপর বলল—যদি এ আংটি তোমার ডান হাতের তর্জনিতে লাগে, তাহলে ভাবব, ঠাকুরদা আমাদের আশীর্বাদ করে গেছেন। কিন্তু এ জিনিস তো সুন্দর নয় মধু, কেন চাইছ?

—আমার খুব কৌতূহল হচ্ছে সমু।

—স্রেফ কৌতূহল?

—আর কী। দ্যাখো, এটা একটা চাবি, তাই না! চাবি তো অন্তঃপুরিকার কাছেই থাকে। আজ থেকে আমার কাছেই থাকবে। দাও, পরিয়ে দাও।

সমু বিবশ হয়ে পড়ে, যেন কোনও গাঢ় ছায়া তাকে ক্রমশ ঘিরে ধরছে বসন্ত বাতাসে। সমুকে ইতস্তত করতে দেখে রিমা বলে—দাও, দেরি করছ কেন?

—নারীর কৌতূহলে অনেক কষ্ট জড়িয়ে থাকে মধু। ইভের কথা মনে পড়ে? তুমি এমন করে চাইবে ভাবতেও পারিনি। কী চাইছ, তুমি জানো না। বলে কেমন একটা কাতর অসহায় দৃষ্টিতে মধুর দিকে চেয়ে রইল সমরেন্দ্র।

বিয়ের রাতে ফুলশয্যায় কনের চোখে বর কী দেখেছিল? অপার আনন্দে পূর্ণ দৃষ্টিতে, গভীর চোখে কি জেগে উঠেছিল তীব্র কোনও কৌতূহল? বারবার হাতের চাবি-আংটিটা দেখছিল নববধূ। তার সেই দেখাকেও স্বামীর চোখের আড়াল করতে চাইছিল মধু। কিন্তু সবই লক্ষ করছিল সমরেন্দ্র। স্বল্প সালংকারা মধুকে এখন তার কামিনী ছাড়া কিছুই মনে হচ্ছিল না। মধু মোহর দেখেনি, শুধু শুনেছে এবং এখন মোহর তার হাতের মুঠোয়—সেই আবেশে মিশে যাচ্ছে একটি ভোগী বিবাহের উৎসব—নারী হয়ে উঠছে শুধুমাত্র যৌনকেন্দ্র। মোহর দিয়েই মানুষের প্রেম যাচাই হয়। মোহর-সংস্কৃতিই ভারতের মুখ্য সংস্কৃতি, মানুষ অদেখা মোহরের লোভ দিয়ে চোখের দৃষ্টি সাজায়, চন্দনের কৌটো

দেয় এবং অতৃপ্ত করে তোলে নিজেকে, অধিকাংশ দাম্পত্যই মোহরের অদৃশ্য পাহারায় মুগ্ধ।

মধুকে চাপা একটা ক্রোধের সঙ্গে, অদ্ভুত ঘৃণার সঙ্গে ভোগ করল সমরেন্দ্র এবং চরম অশান্তির ঝড়ের মধ্যে ঘুমিয়ে পড়ল, সেই ঝড় টেরও পেল না মধুরিমা।

স্বামী ঘুমিয়ে পড়েছে দেখে ফুলশয্যার খাট থেকে রতিক্লান্ত বউ নেমে এল মেঝেয়। সাবধানে ঠাকুরদার ঘরে ঢুকে পড়ল। আলমারির দক্ষিণ-কোণে চলে এল। তার শরীরে জড়িয়ে আছে অতৃপ্ত যৌনতা এবং উদগ্র মাদকতা, দৃষ্টিতে লোভের আগুন। স্বামীর সম্ভোগকালেও তার চিত্ত কোথায় কী হাতড়ে ফিরছিল। সে ছিল উৎকর্ণ, ছিল সে অদৃশ্যঅস্তিত্ব সজাগ এক কামিনী, স্বামীকে সে দেহ দিয়েছিল, পরিপূর্ণ মন দিতে পারেনি।

আলমারিটা ঠেলে সরাল নিতম্বের ধাক্কায়। ভাবল, থলের মোহর সে ফুলশয্যার খাটে উপুড় করে দেবে, দু'চোখ ভরে দেখবে কৌতূহলের সামগ্রী। এ না দেখে চলে না, ফুলশয্যা পূর্ণ হয় না।

আংটিটা সে দেওয়ালে ছোঁয়াতে থাকে। এক সময় ঢাকনা খুলে যায়। দু'চোখ বিস্ফারিত করে মধু। থলেটা টেনে বার করে নেয়। দ্রুত চলে আসে টেবিলটার কাছে। লম্বা টেবিলে উন্মুক্ত থলে থেকে ছড়িয়ে পড়ে গোল গোল খোলামকুচি। চাপা, কাঁপা, অদম্য কান্নায় ডুকরে ওঠে মধুরিমা।

কাঁদতে কাঁদতে তার দেহ দুমড়ে মুচড়ে ওঠে। তারপর ঘৃণা আর আফসোসে তার মন ভরে যায়। ওই রাত্রে আবলুস কাঠের দীর্ঘপ্রান্তে কখন নিঃশব্দে এসে দাঁড়িয়েছে সমরেন্দ্র। তাকে দেখে জ্বলে উঠল মধু—এই তোমার মোহর সমু, দ্যাখো দ্যাখো! এই তোমার পরম ধন। ধাপ্পাবাজ ঠাকুরদা, তার ঠক নাতি আমার বর। ছিঃ।

ছিঃ! বলে মুখটাকে এমনই বিকৃত করল মধু যে, সর্বাঙ্গে শিউরে উঠল সমরেন্দ্র। সে কাঠের মূর্তি হয়ে গেল কিছুক্ষণ। তারপর ধীরে ধীরে এগিয়ে এল খোলামকুচির কাছে। পাগলের মতো হাত দিয়ে স্পর্শ করে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল। ধরা গলায় বলল—তুমি ভিখিরিকে বিয়ে করেছ মধু। কিন্তু আমি যা দেখতে চাইনি, তাকে তুমি এভাবে দেখালে কেন?

—সবই আমাদের ভুল হয়ে গেছে। কালই আমি বাবার কাছে ফিরে যেতে চাই। আমার মোহ ঘুচে গেছে। এত বড় ফাঁকি, একজন নামী আইনজীবীর এই রকম গুমোর। যাইই বল, তোমার ঠাকুরদা মানুষ ছিল না।

—আমাকে ক্ষমা করে দাও রিমা।

—তুমি আমার চরম ক্ষতি করলে সমরেন্দ্র। তুমি শেষ পর্যন্ত কোনও কিছুকে দেখতে চাও না। তুমি মোহাচ্ছন্ন থাকতে ভালোবাসো। এত বিশ্বাস আধুনিক মানুষের লক্ষণ নয় সমু। এ বাড়িতে আমার চলবে না। তোমাকে ক্ষমা করব, যদি তুমি সহজে মিউচুয়াল সেপারেশনে রাজি হও।

—আমার সমস্ত আত্মবিশ্বাস শেষ হয়ে গেছে মধু। তুমি যা বলবে, তাই হবে।

বলে থলেটা হাতে তুলে নিয়ে পাগলের মতো বিহ্বল চক্ষু বিস্ফারিত করে দেখতে থাকে সমরেন্দ্র।

—গা এখন কেমন গুলোচ্ছে আমার! বলে ওঠে রিমা।

চমকে ওঠে সমর। লজ্জায় মাথা নুয়ে আসে। সহসা সে আশ্চর্য হয় এবং দেখে, থলের গায়ে সুতোয় ফুলকারি ভাষায় লেখা, IND. vol. 13, Chap-2 p.31 এর মানে কী?

—আমি যাচ্ছি, আমাকে অনেকক্ষণ ধরে চান করতে হবে, নইলে আমি বাঁচব না। বলে পা বাড়িয়ে ছিল মধুরিমা। বাধা দিয়ে সমু বলল—দাঁড়াও মধু, প্লিজ।

—আর নয় সমরদা, ঢের হয়েছে। আমার প্রেম কিন্তু খোলামকুচি ছিল না, ধাপ্পা ছিল না।

—এক মিনিট মধু।

—বলে কি না সোনামুঠি! হেহে্! এই সব কি সোনা সমরেন্দ্র, টেবিলে এগুলো কী? নাও, ম্যাজিক রিং—এই যে, রেখে দাও, ফেলে দিও না, ধাপ্পাবাজ পূর্বপুরুষের স্মৃতি! বলে টেবিলের উপর আংটিটা ছুঁড়ে দেয় মধুরিমা। তারপর আশ্চর্য হয় দেখে যে, দু'হাত চোঙা করে পিছলে চলে যাওয়া টেবিলে লাফানো আংটিটা অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে মহার্ঘ কিছুর মতো ধরে নেয় সমর। তা দেখে অবাক হয় মধুরিমা। আরও অবাক হয়, সমু আংটিটা অনামিকায় গলিয়ে নিল। তারপর মই লাগিয়ে সিলিং প্রায় স্পর্শ করতে চাওয়া আলমারির সর্বোচ্চ থাক থেকে একটি লাল মলাটের রেক্সিন বাঁধাই মোটা বই টেনে নামিয়ে আনল বরবেশী মানুষটা, এটি একটি ইন্ডাসট্রিয়াল আইনের কিতাব। তেরো নম্বর ভল্যুম। সমু খুলল দুই নম্বর অধ্যায় ৩১ পৃষ্ঠা। লাল কালিতে দাগানো রয়েছে একটি লাতিন প্রবাদ। এই অধ্যায়টি হল সেল অফ গুডস অ্যাকট। ট্রান্সফার অফ টাইটেল বাই এ নন ওনার।

বইয়ের উপর কৌতূহলেই ঝুঁকে পড়েছে মধু। লাতিন প্রবাদটি সম্ভবত লাল কালিতে দাগানো, *Nemo dat qui non habet* (নিমো দাত কুই নন হ্যাবেত)। পাশেই ইংরাজিতে লেখা—None can give who does not himself possess.

মধু বলে উঠল—যার যা নেই, সে তা দিতে পারে না সমু। তোমার ঠাকুরদার কিছুই ছিল না। চলি।

—তাহলে আমরা অপূর্ণই রইলাম মধুরিমা।

মধু সেকথার সরাসরি জবাব না দিয়ে একেবারে অন্য কথা বলল—তোমার মুখটা কেমন ছাই হয়ে গেছে সমরদা, দেখে আমার হাসিই পাচ্ছে। শোনো, বাকি রাতটা আমাদের বিছানা কিন্তু আলাদা।

—চিরকালই আলাদা থাকবে মধু। আমার কী ছিল, তুমি কখনও জানতেও পারবে না।

—তাই বুঝি। বলে ফুলশয্যার খাটে এসে কান্নায় ভেঙে পড়ল মধুরিমা;

ঠাকুরদার এই আইনি প্রতারণা সে সহ্য করতে পারছিল না, অধিকার স্বত্ব, মালিকানা স্বত্ব নয়, তার জীবনস্বত্বটাই যেন মাটি হয়ে গিয়েছিল।

ফুলস্পিডে সারারাত মধুর মাথার উপর ফ্যান ঘুরেছে। ভেজা চুল শুকিয়েছে সে। ভোর থেকেই মাথা ধরেছে তার। চোখমুখ ঈষৎ ফোলাফোলা, পাতলা চুলের মতো বিষণ্ণতা জড়ানো, খাটের বাজুতে গা হেলান দিয়ে, চুপচাপ বসে রয়েছে মধুরিমা।

কে জানত এই রকম আশ্চর্য অসন্তোষে ফুলশয্যার রাতটি কাটবে! কেই বা জানত ঠাকুরদা সমরেন্দ্রর জন্য কী অদ্ভুত প্রতারণা সযত্নে গোপনে বন্দি করে রেখে গেছেন, আইনের প্যাঁচের মধ্যে লুকানো তুমুল ফাঁকির সত্য কীভাবে ঠেলে উঠল—আংটিটা যে এমনই বোকা বানাবার জাদু, সত্যি কে জানত!

তবে একটি জিনিস তো বোঝা গেল, মোহরের আসক্তি জিনিসটা কী জ্বালাময়ী। সবকিছুকেই বানচাল করে দিতে পারে। দাম্পত্য গেল, ভালোবাসাও রইল না। মধুর সামনে এখন দাঁড়াতেও লজ্জা করবে।

মধুর বিষণ্ণতা-মাখা ঢলঢল মুখটা কী তীব্রভাবে এই সকালে সমরকে আকর্ষণ করছিল। কিন্তু এই মেয়েটা তো তার পর হয়ে গেছে।

—তুমি জানবে আমার খুব লোভ, কিন্তু আমি জানব তুমি একজন মস্ত বোকা এবং পুরো ব্যাপারটা একটা রসিকতা। তোমার নেই যখন, তাহলে তুমি দিতে গেলে কেন! যা নেই, তাকে কি এমনি করে বোঝাতে হবে। ভল্যুম দিয়ে, চ্যাপ্টার দিয়ে, পেজ নাম্বার দিয়ে আন্ডার লাইন করে? এর মানে কী! খাটে হেলান দিয়ে বসে চায়ে চুমুক দিয়ে আস্তে আস্তে কথাগুলো বলে গেল মধুরিমা।

—এর মানে কী, সত্যিই আমি জানি না মধু!

—থাক। যথেষ্ট হয়েছে। আর কখনও ঠাকুরদার নামে হাঁকডাক কোরো না। আমি যা বলি, মন দিয়ে শোনো। এই ঘটনা যেন আমার বাবার কানে না ওঠে সমু। বাবা জানেন, আমাদের অনেক আছে। 'নেই'কে এখন বানিয়ে বানিয়ে 'আছে' করতে হবে আমাকে। এমনকী দরকার হলে বলতে হবে, আমি থলেভর্তি সোনার টাকা দেখেছি। তোমাকে যদি কোনও তালে কখনও জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কী বলবে?

—এইভাবে মিথ্যা বলতে হবে!

—ওহ, মিথ্যা বলতে পারবে না! প্রতারণা করতে পারবে আর মিথ্যা বলতে পারবে না! চমৎকার। মিথ্যা দিয়েই তো তুমি আমাকে পেয়েছ। না, মিথ্যায় ভুলে আমি এখানে এসেছি। তবু রাত্রের দুর্ব্যবহারের জন্য আমি অনুতপ্ত সমরেন্দ্র।

কথা শেষ করে রিমা কেমন একটা সলজ্জ ভঙ্গিমা করে এবং চায়ের কাপের মধ্যে যেন দৃষ্টি লুকিয়ে ফেলতে চায়। তার সেই নতমুখি দৃষ্টির ঘন পল্লবের দিকে চেয়ে এই সকালে বড়ই অবাক হয়ে যায় সমরেন্দ্র—যেন এ নারী রাত্রির কনেটি নয়, অন্য কেউ। তার মনের নরম কোণটিকে এই প্রথম আবিষ্কার করে সমর স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, কথা

বলতে পারে না। পরক্ষণেই সমরেন্দ্র মনে মনে বিচলিতও বোধ করে। মোহরের কথাটি এখন থেকে বানিয়ে তুলতে থাকবে মধু, বাবার সামনে সে মিথ্যা কথা রচনা করবে।

কিন্তু বাবা যদি কোনওক্রমে জানতে পারেন তাঁর মেয়ে মোহরের মিথ্যা গল্প বানিয়ে বলেছে, তখন সেই মিথ্যাবলা মুখের দিকে বাবা কীভাবে চেয়ে দেখবেন এবং সেই দৃষ্টি সমরেন্দ্রর দিকেই বা কীভাবে নিবদ্ধ হবে।

—তুমি কোনও কথাই বাবাকে বোলো না মধু। বোলো মোহরের কথা কিছুই জানো না।

—এটাও তো একটা মিথ্যা সমু। শোনো, তুমি আর কথা বোলো না, আমার মাথা ধরে আছে। আর হ্যাঁ, আরও একটি কথা বলে নিতে চাই। যত দিন দু'জনের মধ্যে কারও একজনের একটা চাকরি না হচ্ছে, ততদিন আমি বাবার ওখানেই থাকব। তুমি মাঝে মাঝে যাবে। এ বাড়িতে থাকলে আমি ঠিক সোয়াস্তি পাব না।

—চুপ রিমা। ছোটকা আসছেন। মোহরের কথা একদম নয়। বলে সমরেন্দ্র ঘরের অন্যত্র সরে চলে গিয়ে কী যেন বোকার মতো খুঁজতে থাকে। এটাও বুঝি একটা ছলনা। এবার আবার একটা ঘৃণার খোঁচা রিমার অন্তরে ধাক্কা দেয়। এই ফ্যামিলির প্রত্যেকেরই ওই মোহরের উপর লোভ ছিল। এ বাড়িতে বিনয়েন্দ্র সম্বন্ধে কারও খুব একটা শ্রদ্ধা-ভক্তি দেখা যাচ্ছে না, লক্ষ করে মধুরিমা। তাঁরা যেন কীভাবে জেনে গিয়েছেন, হয়তো বাতাস শুঁকে বুঝেছেন, গুপ্তধন একা নাতি সমরেন্দ্র বাগিয়ে নিয়েছে।

এক জ্যাঠা একদিন খেতে বসে হঠাৎ রিমার দিকে চোখ তুলে ক্ষুধার্ত দৃষ্টি ফেলে বললেন—তুমি কি মা ঠাকুরদার মোহরটোহর কিছু এক-আধটা পেয়েছ? পাওয়ার কথা। পাও নাই?

—আজ্ঞে না।

—পেলে আমাদের দেখিও। আমরা কেড়ে নেব না। খালি দেখব। অন্তত লোককে বলতে পারব, বুড়োটার সত্যিই কিছু ছিল।

—আমরা পেলে, নিশ্চয় আপনাদের বলতাম। বলে ডাইনিং ছেড়ে দ্রুত ছুটে নিজেদের শোবার ঘরে পালিয়ে আসে মধুরিমা। বিছানায় নিজেকে আছড়ে ফেলে মুখে বালিশ চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ওঠে সে। কান্না দমাতে দমাতে একটা আশ্চর্য দুর্বোধ্য অভিমান জমে মনের মধ্যে। স্বামীর উপর ভয়ানক রাগ হয় তার। রাত্রে শুয়ে সেই রাগ ফেটে পড়ে।

—শোনো, সত্যিই আমাকে চলে যেতে হবে।

—কী হল আবার!

—অনেক হয়েছে সমু। জ্যাঠা আমার কাছে মোহর দেখতে চাইছেন। কী করবে এখন? খোলামকুচিগুলো দেখাবে? বলো না, ঠাকুরদা তোমার জন্য এই সব সামগ্রী রেখে গেছেন। পারবে না দেখাতে? আঙুলের আংটিটা এখনও ফেলে দিতে পারনি। একটা অন্তত সত্য মানুষকে বলে দাও।

—আমি তোমার কাছে সত্যিই ক্ষমা চাইছি মধু।

—আংটিটা রেখেছ কেন?

—ওটা থাকবে।

—থাকবে কেন! কী কাজে লাগবে? ফেলে দাও।

—থাক। এ জিনিস কারও ক্ষতি তো করছে না।

—তোমার কোনও অপমানবোধ নেই? ওই ভাবে জ্যাঠা বলল, অথচ তুমি নির্বিকার।

—ক্ষমা তো চাইছি তোমার কাছে।

—আর কত মিছে বলতে হবে আমাকে!

—মিথ্যা তো তুমি বলতেই চেয়েছ।

—ও, আচ্ছা! খোলামকুচিগুলো কোথায়?

—রেখে দিয়েছি।

—ফেলে দাওনি?

—না।

চরম বিস্ময়ে মধুরিমা কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে থাকে। তারপর গলার স্বর খাদে নামিয়ে বলে—তুমি তাহলে চাকরির জন্য চেষ্টা করো। আমিও করব। বাবাকে দুপুরে টেলিফোন করেছিলাম। বাবা এলে আমি বাবার সঙ্গে চলে যাব।

—মিথ্যা তো তোমাকে সেখানেও বলতে হবে, আগেই বলেছ।

—তার মানে, কী বলতে চাও তুমি! দ্যাখো, এখানে কাকা-জ্যাঠারা অত্যন্ত অশ্লীলভাবে আমাকে খোঁচাবে, মোহর দেখতে চাইবে, মাঝে মাঝেই বলবে, পেলে নাকি বউমা, সমু কী বলে? বলবে না?

—বলতে পারে। আর ওখানে?

—আমার বাবা অনেক সহজ মানুষ সমরদা। যদি সাহস করে সত্য বলতে পারি, শুনেটুনে বাবা বড় জোর হেসে ফেলবেন এবং বলবেন সে কী রে, শেষ পর্যন্ত খোলামকুচি! ব্যস, মিটে গেল। আর যদি রেগে যান, তাহলে বলবেন, তুই এ বিয়ে করে বড্ড ঠকে গেছিস মধু! এই ধরনের রসিকতা ভাঁড়েরা করে। এখন কী করবি? আমার কাছেই থেকে যা, জামাই পায়ে উঠে দাঁড়াক, তারপর দেখা যাবে। দেখিস, এরপর যেন আর কোনও ভাঁওতায় না পড়তে হয়।

—মিথ্যা তাহলে তোমাকে আর বলতে হচ্ছে না রিমা! বলে উঠে সমরেন্দ্র নিজেই বুঝল, তাঁর কান্না এসে গেছে।

মধুরিমার হতাশ গলা। বলল—জানি না, সত্যি কী বলব বাবাকে, সত্য না মিথ্যা! যাও, একটু সরে শোও তো, আমার ঘুম পাচ্ছে। বলেই মধু শরীরকে গুটিয়ে খাটের একপাশে শুয়ে পড়ল, কাঠ হয়ে পড়ে রইল। সমরেন্দ্রর মনে হল, রিমা নিঃশব্দে কাঁদছে, ঘুমোতে পারছে না। কিন্তু মধুকে স্পর্শ করার সাহস হল না সমুর। তার কানে ধ্বনিত হয়ে উঠল, 'এই ধরনের রসিকতা ভাঁড়েরা করে।'

মধুর বাবা এলেন। মেয়েকে সঙ্গে করে নিয়ে চলে গেলেন। সমুর শ্বশুর বিখ্যাত একটি কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন, অত্যন্ত বাশভারী, চেহারায় আভিজাত্যের চড়া ছাপ।

খাওয়ার সময় বাবার পাশে দাঁড়িয়ে মধুরিমা বলল—আমাদের ওখানে যখন যাবে, আগে একটা ফোন করে যেও।

বোকার মতো সমরেন্দ্র জানতে চাইল সবিস্ময়ে—কেন!

উত্তর দিলেন প্রাক্তন-প্রিন্সিপাল—কিছুই নয়। এটা একটা ভদ্রতা সমরেন্দ্র। তা ছাড়া তোমার টেলিফোন পেতে নিশ্চয় আমাদের ভালো লাগবে। আচ্ছা, চলি।

এই টেলিফোনের ভদ্রতা জিনিসটা সমুর মাথায় না ঢুকলেও এটুকু বেচারি বুঝতে পেরেছিল যে, শ্বশুর-বাড়িতে সে খুব আদরণীয় জীব নয় এবং মধুর পিতৃপরিবার সত্যিকার অভিজাত এবং একটি অদ্ভুত ব্যবধান রয়েছে মধুতে আর সমুতে, এই ব্যবধানের দূরত্ব বস্তুটি সমরেন্দ্রর বোঝা উচিত। টেলিফোন করে তবে সে মধুর সঙ্গে দেখা করতে পারবে, এই অপমান হজম করা নিশ্চয় কঠিন। বেকার নাতির অপমানবোধ সোনামুঠি ঠাকুরদা অনুভব করার জন্য কোথায় মুঠি পাকিয়ে বসে রয়েছেন সংসারের চারিদিকে চেয়ে দেখে দিশে করতে পারল না সমরেন্দ্র।

—ঠাকুরদা! খোলামকুচিগুলি যদি তোমার সোনামুঠির ছোঁয়ায় মোহর হয়ে যেত। কেন আমাকে তোমার এই ব্যর্থ অপমানিত উত্তরাধিকার, এই আংটি বইতে হয়, এভাবে? নিমো দাত কুই নন হ্যাবেত—তোমার যে কিছুই ছিল না, তা তুমি জানতে, তাহলে আমাকে এভাবে মারলে কেন! আমি কোথায় যাব? মধুকে টেলিফোন করতেও পারব না। তুমি কি সত্যি ভাঁড় ঠাকুরদা! আপম মনে আইন-সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে সমরেন্দ্র কথা বলে গেল। তারপর কেঁদে ফেলল।

একদিন অতঃপর সমুর এল একটি চাকরির ইন্টারভিউ। মস্ত বড় একটি ওষুধ কোম্পানি তাঁদের কাজের জন্য রিপ্রেজেন্টেটিভ চাইছেন। উত্তম বেতন দেবেন। চাকরিতে উন্নতি করতে পারলে কোম্পানি থেকে গাড়ি পাবে সমু। চাকরিতে ঢুকেই সমু একটি নতুন মোটরবাইক পাবে। এই চাকরিটা আমার চাই ঠাকুরদা। রসিকতার ছলেই কি তুমি আমাকে এই চাকরিটা দিতে পারো না?

না, পারো না। নিমো দাত কুই নন হ্যাবেত। তুমি ভাঁড় মাত্র। কী আশ্চর্য! এখনও আমি জাদু আংটিটা ফেলে দিতে পারিনি। আমি অনুভব করব অনেক। আর কত অনুভব করব মহাপিতা!

এই ভেঙে পড়া চেয়ারা, আন-স্মার্ট তবিয়ত, মুখ দিয়ে কথা ফুটে বার হতে চায় না, অবসন্ন লাগে, যখন তখন ঘাবড়ে গিয়ে তোতলা ইংরেজি বলি, বড় কোম্পানি আমাকে চাকরি কেন দেবে! জীবনটাই তো একটা দুরাশা ঠাকুরদা! কোথায় সেই অপরিমেয় উৎস? কার মুখ দেখে আমি প্রেরণা পাব? মধুকে টেলিফোন করতেও আমার সাহস হয় না।

তবু ধসে পড়া দেহটাকে খাড়া করে তুলল সমরেন্দ্র। সুন্দর করে ধীরেসুস্থে দাড়ি

কামাল। ভালো করে কাচা, ইস্তিরি করা শ্যুট পরল, সাদা ধবধবে জামার উপর ঝুলিয়ে দিল লাল টকটকে নেকটাই, নীচে কালোমেশা নস্য রঙের প্যান্ট, পায়ে তকতকে জুতো। সোনা রঙের চওড়া বেল্টের ঘড়ি বাঁ হাতে। সোনার রঙ ঠাকুরদা! সোনা নয়। কী পরিহাস। চোখে ছায়া-চশমা, এই সবে কি ঢাকা পড়বে দুঃখের খিন্নতা, মুখের চামড়া টানটান হয়েছে কি? দ্যাখো মধু, আমি নাকি ঠাকুরদার মতোই দেখতে। প্রশস্ত কপাল। উন্নত নাশা, গভীর চক্ষু। আমি কি ভাঁড়, তুমি বলো! আমি কি প্রতারক রিমা?

এ যুগে কেউ কারও প্রেরণা নয়। প্রেমও প্রেম নয়। কারও কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়াতে পারে না কেউ। সমস্ত দণ্ড, সব মেরুদণ্ড কীভাবে খাড়া রাখে সভ্যতা, আমি অনুভব করেছি ঠাকুরদা। টেলিফোনের রিসিভার কানে নিয়ে প্রার্থিতাকে চাইলে যখন অপর প্রান্তে মধুর 'হ্যালো' শুনতে পেল সমরেন্দ্র, ঠিক তখনই হিম একটা অভিজাত ভয়ে রিসিভার নামিয়ে রেখে দিল। তোমাকে একবার দেখতে ইচ্ছে করছে মধু! কাল আমার ইন্টাররভিউ। বলতে পারল না বিনয়েন্দ্রর নাতি।

ঠাকুরদার ঘরে আবলুশ কাঠের লম্বা টেবিলের কাছে চেয়ারে বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ সে আয়নার সামনে উঠে এল। প্রতিবিম্বর দিকে সুসজ্জিত যুবক সমু চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ-ই হা হা করে হেসে উঠল। বিম্বকে সে বলল—আমি বোকা ভাঁড় সমরেন্দ্র। চাকরিটা কপালে নেই। অনর্গল ইংরেজি বলতে হবে, টাকরায় আমার জিভ আটকে যাবে। কোম্পানির লোকেরা হেসে উঠে আমাকে বাতিল করে দেবে। হ্যাল্লো মধু, তুমি শুনতে পাচ্ছ! বলে হাসতে হাসতে বোবা হয়ে যায় সমরেন্দ্র।

আবার চেয়ারে ফেরে। খুব ক্লান্ত লাগে। সহসা মই লাগিয়ে পাগলের মতো ইন্ডাস্ট্রিয়াল ল বইখানা পেড়ে নামিয়ে আনে। Chap-2, p. 31 বার করে পড়তে থাকে লাল কালিতে দাগানো—None can give who does not himself possess.

—ঠাকুরদা, তুমি কার জিনিস আমাকে দিয়েছ! কারা তাঁরা? কেমন রসিক তাঁরা, কত বোকা! এ কী! এখানে এই কথাটা কেন? এ ফের, কাব্যি করেছ বিনয়েন্দ্র!

তলার মার্জিনে পেন্সিলে আঁক টেনে লেখা—উত্তরে হাওয়া বয়।

এই কথাটির তলায় খুবই সরু এবং অত্যন্ত ক্ষুদ্র অক্ষরে অস্পষ্ট করে লেখা—প্রশ্নের উত্তরে।

—আজ তো জীবনটাই মস্ত প্রশ্ন ঠাকুরদা! মোহর কী, কেন, কোথায়? হাওয়া কি কোনও সংকেত? দ্যাখো মধু, উত্তরের বাতাসে শীত আসে। আমি হয়তো সেই বাতাসে মিশে ঝরে যাব। কত বেকার এদেশে ঝরে যায়। সবার অলক্ষ্যে। বলতে বলতে আলমারির উত্তর কোণে চলে আসে সমরেন্দ্র। ঠেলে সরিয়ে সামান্য ফাঁক করে নিতে বাতাসের স্পর্শ লাগে। ওখানে কী? একটা ছোট জালে ঢাকা জানলা। হাত বাড়ায় সমু। হু হু করছে হাওয়া।

সঙ্গে সঙ্গে সক্রিয় হয় আংটি। একটি ঢাকনা শব্দ করে খুলে যায়। ভিতরে খুদে একটি বাল্ব জ্বলছে। একখানা বড় রৌপ্যের থালার সোনার টাকা সাজানো। রৌপ্যের

থালায় গায়ে লেখা, SAVE ME.

সীমাহীন আনন্দে ফ্যালফ্যাল করে মোহরের দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে থাকে সমরেন্দ্র। তারপর হাত টেনে নেয়। ঢাকনাটা বন্ধ হয়ে যায়। চরম আনন্দে নিজেকে কেমন বোকা বোকাই লাগে। আলমারিটা ঠেলে দিয়ে সরে আসে সমরেন্দ্র। ঘটনাটাকে বিশ্বাস করতেই কেমন বিহ্বলতা আসে। মধুকেই তার চিৎকার করে ডেকে উঠতে ইচ্ছে করে। খেয়াল হয়, কেউ কোথাও নেই, সে একা।

সমরেন্দ্রর পোশাক ঝলমল করতে থাকে। বুকে আশ্চর্য সাহস। মুখে নিখুঁত সপ্রতিভতা। ইন্টারভিউয়ের শেষে তাকে বসতে বলা হয়। নিয়োগপত্র টাইপ হয়ে আসে। তখনই ধরিয়ে দেওয়া হয় সমুর হাতে। চমৎকার জিতে যায় সমরেন্দ্র।

বাড়িতে এলে কাউকে কিছু না বলে সিধে ঠাকুরদার ঘরেই ঢুকে আসে সমু। ঢুকে ঠাকুরদার টাঙানো দেওয়ালের ফটোর সামনে দাঁড়ায়। চোখ বন্ধ করে একটা মৌন প্রণাম জানায়।

ঘুরে দাঁড়াতেই পিছন থেকে কার স্পর্শ অনুভব করে সমরেন্দ্র। তার পিঠে হাত রেখেছে মধুরিমা। ঘুরে দাঁড়ানো মাত্র তাকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বউ বলে ওঠে—তোমাকে ছেড়ে আমি আর থাকতে পারলাম না সমু। বলে সমরেন্দ্রর বুকে মাথা ব্যাকুল আবেগে ঠেকিয়ে কেঁদেই ফেলে মধু।

—তুমি ঠাকুরদাকে প্রণাম করলে! সমুর বুকে মাথা রেখেই বলে উঠল মধুরিমা।

—এটা কি অভিযোগ মধু?

—না। একদম নয়।

—তাহলে!

—আমি বাবাকে মিথ্যাই বলেছি সমু। কিন্তু অবাক হলাম, মিথ্যা বলে আমি আনন্দই পাচ্ছি। আমাদের অনেক আছে সমরেন্দ্র। তুমি দুঃখ কোরো না। আমি জ্যাঠাদের বলে দিলাম, মোহর আমরা পেয়েছি। বিশ্বাস করতে পারেন, না-ও পারেন। তবে কাউকে আমরা ওই সব দেখাতে যাব না। এমন কড়া করে বললাম যে, জ্যাঠার মুখ দিয়ে কথাই আর বার হতে চাইল না। আমি কি ভুল করলাম, তুমিই বল!

—ঠাকুরদা আমাদের বোকা ভাঁড় মধু। বোকা ভাঁড়ে টাকা থাকে জানো না! সোনার আশরফি মুদ্রা। এটা তোমার আমার গোপন ইতিহাস রিমা। আমাদের সত্যিই আছে। তুমি মিথ্যা বলনি।

—কী বলছ! আমি বিশ্বাস করিনি? মিথ্যা জিনিসটা সব সময় তো মিথ্য নয় সমরদা।?

—মিথ্যা কীসের! আচ্ছা বেশ, রাত হোক। তোমাকে দেখাব। আমার একটা চাকরি হয়েছে মধু। এসো।

রাতে চারদিক নিশুত হলে সমরেন্দ্র হাতের আংটিটা স্ত্রীর হাতে পরিয়ে দিয়ে

বলল—যাও, উত্তর-কোণে। আলমারি ঠেলে হাত বাড়াবে। দেখবে, তারপর চলে আসবে।

বেশ অবাক হয়ে আঙুলে আংটিটা নেয় মধু। চলে আসে ঠাকুরদার ঘরের উত্তর কোণে। তারপর যখন সে স্বামীর কাছে ফেরে, তখন তার মুখ দিয়ে কথা ফুটে উঠতে চাইছিল না। মুখে তীব্র চাপা বিস্ময়কর আনন্দ।

—কী দেখলে!

কোনও কথা না বলে স্বামীর পায়ের তলায় মাথাটা রেখে গভীর আশ্বস্ত গলায় রিমা বলল—আমি আর সুন্দর মিথ্যা বলে আনন্দ পাব না সমু। মিথ্যার সেই নেশাটা কেটে গেল।

—না, কাটেনি। দাও, আংটিটা দাও। বলে আংটিটা স্ত্রীর আঙুল থেকে নিয়ে জানলার বাইরে মহানিশায় ছুঁড়ে দিয়ে সমরেন্দ্র বলল—এরপর কী বলবে তুমি? বলবে, আমাদের অনেক আছে। লোকে বিশ্বাস না করলেও তুমি বলবে, আছে।

মধু একটা সচকিত স্বরে বলে ওঠে—ওটা আমাদের পাকাদেখার আংটি ছিল সমু। ফেলে দিলে? সমু বলল—হ্যাঁ, দিলাম।

কারাগার

ফুলশয্যার খাটের দিকে চেয়ে থমকায় প্রমিত। ফুলের শোয়ানো হালকা লম্বা মালা আরতোড়া এবং পাপড়ির গা লাগা অলংকারের ছোট স্তূপ। গা থেকে সমস্তই খুলে ফেলেছে দীপিতা। প্রমিত ভাবল, অলংকারগুলি মিলনে বিঘ্ন হবে বলেই বউ খুলে ফেলেছে। কিন্তু বিছানার মাঝখানে এভাবে না রাখলেই পারত। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলেই তো হয়!

প্রমিত অলংকারের দিকে হাত বাড়িয়েছে দেখে ঘোমটার আড়াল থেকে দীপিতা বলল—দেখে নিন, সব ঠিক আছে কিনা। চাইলে গুনে নিতেও পারেন। আমি পাকা দেখার হিরের আংটিটাও খুলে দিয়েছি। সমস্ত বুঝে নিন। আর শুনুন, একসঙ্গে আমাদের শোওয়া হবে না।

দীপিতা ফুলে ফুলে সাজানো সাদা বিছানার খাটের প্রান্তে পাতা জোড়া বালিশের কাছে ভারী নিতম্ব ঠেকিয়ে আলতো ভঙ্গিতে বসে কথাগুলি এক নাগাড়ে বলে গেল। প্রমিতের দিকে মুখ ফেরাল না। অলংকারগুলি স্পর্শ করতে পারল না প্রমিত, যেন তার আগুনে হাত পড়ে যাচ্ছিল, সেভাবে আঁতকে উঠে হাত গুটিয়ে নিয়ে বিছানার ধারে বসে পড়ল। সিল্কের ঘিয়ে পাঞ্জাবির উপর গলা থেকে ঝুলন্ত ভারী ফুলের মালাটা তাকে সহসা ব্যঙ্গ করে উঠল। মুহূর্তে মনে পড়ে গেল, শুভদৃষ্টির সময় দীপিতা কিছুতেই তার সঙ্গে দৃষ্টি মেলায়নি। চরম ব্যাহত সেই দৃষ্টি শূন্যে উঠে গিয়েছিল।

গভীর হতাশায় ভাঙা সুরে প্রমিত তার হাত দুখানি পায়ের ফাঁকে কোলের উপর শিথিলভাবে ফেলে রেখে বলল—তুমি তাহলে এ বিয়ে চাওনি?

কঠিন এবং সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল দীপিতা—না।

কান্নার চেয়ে দ্রব একফালি হাসি কোথা থেকে উড়ে এসে প্রমিতের ঠোঁটের কোণে দেখা দিল, প্রমিত জানতে চাইল—কেন চাওনি?

দু'দণ্ড চুপ করে থেকে নিতান্তই আবেগশূন্য গলায় দীপিতা বলল—পাকা দেখার দিন আমাকে দেখে আপনারা যখন ফিরে যাচ্ছেন, তখন বাড়ির একজনের হাত দিয়ে আপনার কাছে একখানা চিঠি পাঠিয়েছিলাম। আশা করি আপনি পেয়ে থাকবেন।

দীপিতার কথা সমর্থন করে প্রমিত বলল—হ্যাঁ।

দীপিতা বলল—ওই চিঠিতে আমি লিখেছিলাম, আপনার সঙ্গে দেখা করতে চাই। আমার কিছু বলবার আছে, খুবই জরুরি। কোথায় দেখা করব, তা-ও জানিয়েছিলাম। সেখানে গিয়ে আমি অপেক্ষাও করেছি। আপনি আসেননি।

প্রমিত গলাটাকে একটুখানি শক্ত করে বলল—হ্যাঁ যাইনি। তোমার সম্পর্কে সমস্ত কথা দিবাকর আমাকে বলেছে। এক দিনে বলেনি। অনেক দিন ধরে বলেছে। দিবাকরই চায়নি আমি ওইভাবে দেখা করি। দিবাকর আমার ঘনিষ্ঠতম বন্ধু, ও চেয়েছে এবং আমার ওপর চাপ দিয়েছে বলেই এ বিয়ে হয়েছে। আমি তোমাকে চিনতামই না।

—আমার সম্পর্কে আপনি সব কথা জেনেছেন, অথচ আমার সঙ্গে দেখা করলেন না। কেউ চাপ দিলেই বুঝি বিয়ে করতে হয়।

—তুমি নিজেও তো তাই করলে। কেন করলে?

—সংসারে একটি মেয়ে কতভাবেই না বাধ্য হয়, এ যুগের মানুষ হয়ে আপনি বোঝেন না!

—দিবাকরের কাছ থেকে নানাভাবে আমি যা বুঝেছি, তাতে মনে হয় না, আমি কোনও খারাপ কাজ করেছি। তোমাকে চিনতাম না, কিন্তু জানতাম না, তা নয়।

—শুনুন, আপনি খুবই খারাপ কাজ করেছেন। ভুল করেছেন, সেই ভুল আপনাকেই শোধরাতে হবে। আমি বরুণের বাগদত্তা। দিবাকর এবং আপনার চোখে সে খুব খারাপ ছেলে, অযোগ্য। কিন্তু সেই অযোগ্য, খারাপকেই আমি ভালোবেসেছি। বরুণ একটা মাস্তান। দিবাকর ওকে মাস্তান ছাড়া কিছুই মনে করে না। বরুণের অনেক ঘাট, অনেক খামতি। কিন্তু সে আপনার মতো কারও গায়ে পড়ে উপকার করতে যায় না। বরুণের মাস্তানি সারাজীবন সহ্য করতে পারব, কিন্তু আপনার উপকার করাটা আমার আর এক মুহূর্তও সহ্য হচ্ছে না। এই ঘরে পা দিয়েই মনে হল, আমার সব ভুল হয়ে গেছে। সমস্ত মাটি করলাম আমি! বলে ভেজা চোখে ঘাড় সামান্য বাঁকিয়ে প্রমিতের দিকে মেলে দিল দীপিতা। তার গলার তীব্র চাপা হাহাকার ঘরের বাতাসকে ভারী করে তুলল। দীর্ঘক্ষণ কথা বলে এবার আচমকা ফুঁপিয়ে উঠল দীপিতা। দু' হাতে মুখ ঢেকে সারা অঙ্গ কান্নার আবেগে কাঁপাতে থাকল। সেই ধাক্কায় তার শরীর থেকে ফুলের পাপড়ি খসে পড়ল।

মেঝেয় খসে পড়া একটি পাপড়ি হাতে করে তুলে নেয় প্রমিত। বাঁ হাতের তালুর উপর নেয়। বোকার মতো সেই পাপড়ির দিকে চেয়ে থাকে। সত্যি সত্যিই কার জীবন মাটি হল সে ভেবে উঠতে পারে না। কেবলই তার মনের মধ্যে একটি জিজ্ঞাসা আছড়ে পড়তে থাকল, ধোবার পাটায় যেভাবে ভেজা কাপড় আছড়ে পড়ে—কেন সে দিবাকরের কথায় এভাবে বশ হয়ে পড়ল! কেন সে এই বিয়েতে রাজি হল।

দিবাকর সেই কবে থেকে দীপিতার কথা বলে আসছে। কীভাবে বরুণ মেয়েটার পিছনে লেগে পড়ে আছে তা-ও বলেছে দিনের পর দিন। দীপিতা মাতৃপিতৃহীন বলে কড়া করে তারা শাসন করতেও পারে না।

ইলেভেন ক্লাস থেকে কলেজের শেষ বর্ষ পর্যন্ত দীপিতাকে পাড়ার মাস্তানটা অনুসরণ করে এসেছে। দীপিতা বরুণকে প্রশ্রয় দিয়েছে, এমনকি অনেক দিন বাড়ি পর্যন্ত বরুণ চলে এসেছে দীপিতার সঙ্গে কথা বলতে বলতে। তারা দু'জন যখন পাশাপাশি কথা বলতে বলতে হেঁটে গেছে, সেই দৃশ্য কিছুতেই সহ্য করতে পারেনি দিবাকর। একটা

অত্যন্ত বাজে ছেলে এইভাবে নির্লজ্জের মতো চোখের উপর দিয়ে তার বোনের সঙ্গে ঘুরবে, কথা বলবে, অথচ চুপ করে থাকতে হবে—বল প্রমিত, এ কি ঠিক হচ্ছে? বাবা-মা বোনকে কড়া করে কিছুই বলবে না, কারণ দীপিতা ওদের নিজের মেয়ে তো নয়। অথচ খারাপ কিছু হয়ে গেলে আমাকে দুষবে। বলবে, তুই দেখলি না! কী করা যায়, বল তো!

প্রমিত শুনতে শুনতে একদিন বলে বসল—তুমিই ওর অভিভাবক। কারণ তুমি ওর জীবন সম্পর্কে যত শঙ্কিত, ওর মামা-মামি তার দশ ভাগের এক ভাগও নন। ওঁরা হয়তো ভাবছেন...

দিবাকর বলল—বাবা স্বভাব-আলগা মানুষ। মেয়ে কার সঙ্গে মিশছে দেখেও দেখে না। দেখেও না দেখার ভান কেন করে জানো। শুধু উদাসীন বলেই নয়, বরুণকে ভয়ও পায়। তা ছাড়া বরুণ বাবার পার্টির লোক। বাবা চিরকালের কমিউনিস্ট। আজ ওই পার্টিতে বরুণদের মতো অনেক লুম্পেন ঢুকেছে। এই রকম লুম্পেনরা বোল্ড ক্যাডার, পার্টির জন্য জান দিয়ে ফেলতে পারে। এদের যত্ন করে না পুষলে চলবে কেন?

প্রমিত বলেছিল—এই অবস্থায় পার্টির উপর-নেতৃত্বকে তুমি বলতে পারো না?

দিবাকর হেসে ফেলে বলেছিল—বাবাই তো নেতা, আর কাকে বলতে যাব আমি! উপরের নেতারা তো বাবার কাছেই ঘটনার ডিটেলস চাইবে। বাবা বলবে, ও কিছু নয়।

প্রমিত প্রশ্ন করেছিল—তুমি সরাসরি দীপিতার সঙ্গে কথা বলছ না কেন?

দিবাকর গম্ভীর গলায় উত্তর দিয়েছিল—বলেছি। বলেছি, পার্টি দুর্বৃত্ত পোষে তুমি জানো না? ও বললে কী জানো? বললে অদ্ভুত কথা। বরুণ নাকি বলেছে, ওর সঙ্গে কথা না বললে ভোজালি মেরে দীপিতার গাল কেটে নামিয়ে দেবে। শুধু তাই-ই নয়, কোথায় কার গাল সে চিরে দিয়েছে, তা-ও বলেছে। এবং একখানা ভোজালি দীপিতাকে দিয়ে বলেছে, এটা দরকার হলে বাড়িকে দেখাবে, নিয়ে যাও। সেই বস্তুটা আমি দেখেছি প্রমিত।

প্রমিত খুব আহত বিস্ময়ে দিবাকরের দিকে চোখ তুলল। ভোজালিটাকে কল্পনা করবার চেষ্টা করল। কল্পনার ভিতরে সে চমকে উঠে বলল—তুমি ওই জিনিসটা একদিন নিয়ে আসবে?

—কেন, তুমি কী করবে।

—ভেবো না, আমি বরুণকে ওটা হাতে করে তেড়ে যাব, সেই সাহসই আমার নেই। আমি খালি দেখব একবার।

—দেখে কী হবে!

—কিছুই হবে না। সব কিছুকে ডিটেলস-এ দেখা আমার অভ্যেস। কোনও কিছু খুঁটিয়ে দেখতে আমার ভাললাগে। ছবি আঁকি বলেই হয়তো আমার মনটা ওই রকম। তুমি আনবে তো?

বিষম আশ্চর্য হল দিবাকর। বলল—ভোজালিটা ডগার দিকে বাঁকা আর তীক্ষ্ণ, মাঝখানটাও একটা ফালি বাঁক খেয়ে রয়েছে, ধার দেখে বুকটা সিরসির করে। ডগাটা

ঠেকিয়ে গালে টানলে দীপিতার চিরকালের মতো দাগ পড়ে যাবে। ওটার একটা খাপও আছে। খাপের গায়ে মোগলাই নকশা। আচ্ছা বেশ, তোমাকে আমি দেখাব জিনিসটা।

দিবাকর দীপিতা, তীক্ষ্ণধার নকশা-কাটা আশ্চর্য অস্ত্রটা সঙ্গে করে এনেছিল দু' দিন পরেই। একটা প্রায়- নির্জন রেস্টুরেন্টে দুপুর বেলা পর্দা ফেলে একটা বৃহদাকার থালার উপর ওটাকে শুইয়ে দিয়েছিল। থালাটা নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের, তীব্র একটা আলো ঝলসায়, খাপ খোলা হলে অস্ত্রটা সেই আলোর তীব্রতাকে দ্বিগুণ বাড়িয়ে দেয়। প্রমিত আলোর ঝলকানি চোখের উপর হাত তুলে আড়াল করতে চায়। দিবাকর হেসে উঠে একটি ফোটো সামনে মেলে ধরে বলল—নাও, ডিটেলসে দেখে নাও। এই আমার বোন আর এই হচ্ছে মোগলাই ভোজালি। এত সুন্দর বোনটা লুম্পেনের হাতে পড়েছে প্রমিত। দ্যাখো, ভালো করে দ্যাখো। খুঁটিয়ে দেখলে নিশ্চয় তোমার ভাললাগবে।

ফুঁপিয়ে চলেছে দীপিতা, ফোঁপানি চাপতে গিয়ে শরীরটা তার আরও কেঁপে যাচ্ছে। মাথায় জড়ানো খোঁপার মালা থেকে মাঝে মাঝেই ঝরে পড়ছে একটি-দুটি পাপড়ি। কান্নার স্বরে যে-ধরনের হাহাকার ঘুলিয়ে উঠছে, তাতে দীপিতাকে মনে হচ্ছে, সত্যিই সে অকূল পাথারে পড়ে গিয়েছে। সত্যিই মাটি হয়ে গিয়েছে তার সমস্ত জীবন। আর এই জন্য দায়ী মানুষটি ফুলশয্যার খাটের প্রান্তে মেঝেয় পা দু'খানি রেখে আলতো করে বসে হাতের তালুতে একটি পাপড়ি রেখে, সেটির দিকে বোকার মতো চেয়ে রয়েছে।

এই ঘরে পা দিয়েই দীপিতা বুঝেছে, মস্ত ভুল হয়ে গেল। তার আগে এই ভুলের মাত্রা বেচারি বুঝে উঠতে পারেনি। এখন সেই ভুলকে শোধরাতে হবে প্রমিতকে। সেই কারণেই ওই খাটে একসঙ্গে শোওয়া যাবে না। কথাটি স্পষ্ট স্বরে ঘোষণাও করে দিয়েছে দীপিতা। এই ধরনের সাংঘাতিক অকথ্য অপমানের জন্য একেবারেই প্রস্তুত ছিল না প্রমিত। এ সে কী করল, জীবনের জন্য একটি হাস্যকর ফুলশয্যার আয়োজন করল! দিবাকরের কথায় এতখানি বশ হল কেন, ওই ভোজালিটাই কি তাকে বিভ্রান্ত করেনি?

একখানি সাদা আলো ঝলসিত নিষ্কলঙ্ক ইস্পাতের থালায় খাপ খুলে রাখা নগ্ন ভোজালি দেখে দীপিতার জন্য একটি তীব্র অব্যক্ত মায়া হয়েছিল। বরুণের স্পর্ধাকে প্রমিত কি মনে মনে চ্যালেঞ্জ জানাতে চেয়েছিল! কিন্তু কোন যুক্তিতে? দিবাকরের প্ররোচনাই কি ওই একটা নিঃশব্দ চ্যালেঞ্জের প্রেরণা, নাকি ফোটোর দীপিতার প্রেমে পড়ে গিয়েছিল প্রমিত? খুঁটিয়ে দেখতে চাওয়াই কি তার একটি বৃহৎ দুর্বলতা?

খাটে নিতম্ব ঠেকানো, মেঝেয় পা, দু'হাতে মুখ ঢাকা, ফোঁপানো কনেটিকে খুঁটিয়ে দেখতে থাকে প্রমিত এবং সজোরে ফুঁ দিয়ে হাতের তালুর পাপড়িটাকে উড়িয়ে দেয়। এবং গম্ভীর গলায় বলে উঠে—আমি গায়ে পড়ে কারও উপকার করতে যাইনি দীপিতা। উপকার আমার কাছে চাওয়া হয়েছিল। দাঁড়াও দেখাচ্ছি। বলে খুব দ্রুত প্রমিত ঘরের একটি কাঠের আলমারির কাছে চলে আসে। আলমারির চাবিটা বইয়ের সেলফের এক কোণ থেকে টেনে নেয়।

ভোজালিটা হাতে করে নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখতে দেখতে ফিরে আসে দীপিতার

সম্মুখে। খাপটা খুলে ফেলে এক টানে। ঘরের উদ্ভাসিত আলোয় ঝলসে ওঠে হিংস্র অস্ত্রখানি, যেন তা মানুষের রক্তের ভিতর থেকে লাফিয়ে উঠল।

প্রমিত ভোজালির ডগা দিয়ে অত্যন্ত সাবধানে দীপিতার ঘোমটা ঘাড়ের পিছনে ঠেলে দিল। চন্দন-ফোঁটায় বিষণ্ণ-মধুর মুখটা পুরোপুরি ফুটে বার হল প্রমিতের চোখের উপর। ফোটো নয়, এ এক রক্তমাংসের তীব্র যৌবন, বিশেষ সুন্দর মানবী, যার তারিফ দিবাকরের মুখে সহস্রবার শুনেছে প্রমিত, এই মুহূর্তে তাকেই ভীষণ অধরা মনে হল প্রমিতের। যে সম্পূর্ণ ধরা দিয়েও সম্পূর্ণই অধরা থাকতে চায়, সেই তাকে ঘিরে রহস্য রচনা পুরুষের চিরকেলে ধাত, কিন্তু এ রহস্য কোনও নারী-রহস্য নয়, প্রমিতের মনে হল, এই রহস্যের উৎস একটি বাস্তব ভোজালি। এই ভোজালিটা ওই সুন্দর মুখে কেটে বসে যেতে পারে, সেই খেয়ে ফেলা বিকৃত মুখটা একজন শিল্পী কীভাবে ছবিতে আঁকবে? অথচ এ যুগে তাই-ই যে আঁকতে হয়! মুখটাকে তুলির ছুরি দিয়ে আপেলের মতো আধখানা কেটে ফেলতে পারে প্রমিত। কেটে ভাস্কর্যের মতো বর্তুলাকার দিয়ে তুলির আঁচড়ে বসাতে পারে ক্যানভাসে।

মানবীকে বিকৃত করে লুম্পেনের থাবায় ধরা পলিটিকস ; শিল্পীর তুলির ভাষায় পাওয়া যাবে সেই বিকৃতির চরম বিশদ বিবরণ। আঁকার আগে, শিল্পী সেই মুখটাকে মনের মধ্যে পুরোপুরি এঁকে ফেলতে পারে। না এঁকে সেটিকে মুখ বুজে বহন করার যন্ত্রণা, মুখটি যার, সেও বুঝবে না। শিল্প যারা একদম বোঝে না, তারাও কেউ কেউ শিল্পীর জীবনে ঢুকে পড়ে অবুঝ মুখে বসে থাকে। দীপিতাও কি তেমনই অনড় প্রতিমা?

প্রমিত বলল—ধরো। দ্যাখো, চিনতে পার কিনা! বরুণ এ জিনিস তোমার বাড়িকে দেখাতে বলেছিল। আমি মনে করেছি, আমাকেও দেখাতে বলেছে। সেটিই আমার ভুল দীপিতা। তোমার ভালোবাসার চেহারাটা আমি বুঝতে পারিনি। প্রেমের ছাঁচ যে কত রকম হতে পারে, আমরা তার কিছুই জানি না। শিল্পীর দোষ হচ্ছে, সে যা করে, নিজের ছাঁচে ফেলে করতে চায়, আসল মানুষটা সেই ছাঁচের বাইরেই হয়তো সত্য হয়ে রয়েছে, আমরা ঠিক ধরতে পারি না। আমাকে ক্ষমা করে দিও। এখন ভয় হচ্ছে, এই অস্ত্রটা কেন আমি নিতে গেলাম! দ্যাখো, এটাই তো বরুণের ভোজালি? ভারতবর্ষের মূর্খ হিংসা আর নিষ্পাপ অবুঝের প্রেম। দ্যাখো, দ্যাখো, হাতে নিয়ে চুমু খেতেও পারো। তুমি তোমার মতো সুন্দর। যা চাও, তাই হবে।

অসহায় বোকা ভঙ্গিতে দু-হাত অল্প ফাঁকের ব্যবধানে মেলে দীপিতা অস্ত্রটা দু'হাতে নেয়। ততোধিক বোকা ভঙ্গিমায় প্রমিতের মুখের দিকে চেয়ে শিল্পীর কথা শুনতে থাকে। শোনে এবং আশ্চর্য হয়, কিন্তু হঠাৎ অবুঝের গলাতেই সশব্দে অস্ত্রটাকে সত্যিই চুমু দিয়ে ডুকরে ওঠে—ওহ্ বরুণ। এ তুমি কী করলে! বলে কেঁদেই ফেলে দীপিতা।

প্রমিত এবার অত্যন্ত সজাগ হয়ে ওঠে। বুঝতে পারে, শিল্পের ভাষা কীভাবে ব্যর্থ করে মানুষ, ভোজালির চেয়ে তার তুলির ডগা নিশ্চয় অনেক বেশি সূক্ষ্ম এবং ধারালো, সেই স্পর্শে এ নারী ধ্বনিত হওয়ার নয়। কী করে হবে, এ যে ছাঁচের বাইরে থাকা কোনও

কামিনী, তা হয়তো অন্য কোনওভাবে সুন্দর, লুম্পেনের হিংসাকে পূজা দেওয়ার জন্যও তো নারীরা এদেশে জন্মায়। একই সঙ্গে এই মুহূর্তে প্রমিতের মনে এই নারীর জন্য কামনা এবং ঘৃণা যমজ ইচ্ছার মতো জন্ম নেয়। দীপিতার কাছ থেকে সরে চলে আসে প্রমিত। আসার আগে দীপিতার শরীরের পাশে খাটের উপর ভোজালির খাপটা রেখে দিয়ে আসে।

ঘরের কোণে একটি বইভর্তি কাচের আলমারির সামনে এসে দাঁড়ায় এই গল্পের হতভাগ্য নায়ক। তার চোখে কেন যেন খানিকটা জল এসে পড়ে। সে আলমারির প্রতিটি সৎ গ্রন্থকে মনে মনে ধিক্কার দিতে থাকে। তার কেবলই মনে হয়, শিল্পের জ্ঞান একটি মস্ত অভিশাপ। বড়ই আশ্চর্য লাগছে, চুমু খেতে বলাতে, বাস্তবিকই দীপিতা অস্ত্রটার গায়ে সশব্দে চুমু খেল! এবং কাঁদল! প্রমিতের এখন মনে হচ্ছে সত্যিই সে অপরাধ করেছে। কেন সে ওই চন্দন-চর্চিত মুখখানাকে তুলির ছুরিকা দিয়ে কেটে মনের মধ্যে বিকৃত করে তুলে একটি তীব্র কাল্পনিক কষ্টে বারবার এতক্ষণ আলোড়িত হচ্ছিল? বরুণ তো একদিন হঠাৎ দীপিতাকে বাগে পেলে গাল কেটে সত্যিই নামিয়ে দিতে পারে! ওই মোহময় শোভন-উদ্বেল মুখের বিষণ্ণ-মধুর রূপটা চির-বিকৃতির হিংসায় কদর্য হয়ে উঠবে। এমন সৌন্দর্যকে কদর্য রূপে কল্পনা করার জ্ঞানটাই প্রমিতের একটি অবাধ্য প্রবৃত্তির মতো—তাকে ক্রমাগত ছোবলাতে থাকে। তার সৌন্দর্য-লিপ্সার আবেগটাই এমন অকাট্য, দুর্মর এবং দুঃশাসনীয়। দীপিতার সত্যিই কী হবে প্রমিত ভাবতে পারছে না। 'এই অস্ত্রটা কেন আমি নিতে গেলাম!' নিজেরই কথা আর একবার বিড়বিড় করে উচ্চারণ করল প্রমিত।

বইয়ের আলমারির সামনে অনেকক্ষণ এইভাবে নিস্তব্ধ দাঁড়িয়ে থেকে নিজের দিশেহারা চঞ্চল মনটাকে বাগে আনার চেষ্টা চালায় প্রমিত। মনে মনে ভাবে, এই ঘরে পা দিয়েই দীপিতা উপলব্ধি করেছে, তার আগে নয় যে, বেচারির জীবনটা মাটি হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এই সংবিত ঘরে পা দিয়েই হল কেন! ফুলশয্যার সজ্জিত খাটটা দেখেই দীপিতা তার ভুলকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পেরেছে? কোনও কোনও ব্যাপারকে বোঝার জন্য কি চরম কোনও মুহূর্তের সামনে এইভাবে দাঁড়াতে হয় মানুষকে? দীপিতা যেন ক্ষিপ্র তেজস্বিনী অশ্বের মতো খাদের কাছে পৌঁছে সম্মুখের দু'পা শূন্যে তুলে দিয়েছে, কোথাও তলিয়ে যাওয়ার আগে, অশ্বটি এভাবেই শূন্যতার গায়ে পা তুলে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপর তীব্র আবেগে চিৎকার করে ওঠে। মানুষ এই অশ্বিনী-দৃশ্যে দেখতে পায় একটি বিমূঢ় রুদ্ধগতির অসহায় শূন্যতাকে, তলেও এক বিপুল গভীর গহ্বর।

কিন্তু এই মনটা কি সংসারে আর এক মুহূর্তে বদলে গিয়ে ওই বিপুল গহ্বরকে লাফ দিয়ে অতিক্রম করে না? সে কি ভাবে না, খাদ পর্যন্ত এত দূর ছুটে যখন এসেছে, তাহলে এই পথটাই সত্য হোক, ওই খাদটাকেই পেরিয়ে যাই, ভুলটাকেই এভাবেই শুধরে নেওয়ার বেগ লাগুক অশ্বের শরীরে!

প্রমিতের শিল্পীমন ছুটন্ত অশ্বের পিছনে উড়ন্ত একটি ভল্লকে দেখতে পায়, গহ্বর

অতিক্রম করার আগেই কি ঘোড়াটা বিদ্ধ হয়ে খাদে তলিয়ে যাবে, শূন্যে তোলা দু'টি পা, ওই অবস্থায় ভল্ল গেঁথে ফেলবে অশ্বটিকে? কল্পিত এই দৃশ্যকে রচনা করে ভয়ে প্রমিত দু'হাতে মুখ ঢেকে ফেলে। ভাবে, 'এই অস্ত্রটা কেন আমি নিতে গেলাম!'

আলমারির কাছ থেকে ধীর পায়ে দীপিতার কাছে চলে আসে প্রমিত। দেখে অত্যন্ত শিথিল এক ভঙ্গিমায়, যেন মৃত সন্তানকে কোলে ফেলে শোকাহত মূক নারী বসে রয়েছে, কোন সুদূরে তার অন্যমনস্ক বিষণ্ণ দৃষ্টি ছড়ানো। তার কোল থেকে নগ্ন জ্বলন্ত অস্ত্রটা প্রমিত তুলে নিতেই আঁতকে উঠে ঝরঝর করে নিঃশব্দে কেঁদে ফেলল দীপিতা। আঙুল দিয়ে টেনে অশ্রু মুছল এবং কী যেন বলে উঠতে চাইল, কিন্তু বলল না। তখন প্রমিতের মনে হল প্রেমে ব্যর্থ দৃষ্টিও বুঝি এমনই শোকস্তব্ধ হয়ে থাকে। দীপিতাকে সান্ত্বনা দেবার ভাষাও প্রমিতের জানা ছিল না। তা ছাড়া এ মেয়ে তার কথা শুনতে পাবে বলেও মনে হল না। শুনলে ওই সুদূর দৃষ্টিতে ঘৃণা ছাড়া কিছুই জাগবে না।

অতঃপর প্রমিত দীপিতার পাশে পড়ে থাকা খাপটা নিঃশব্দে তুলে নিয়ে সরে আসে। খাপে ঢোকায় নাঙা অস্ত্রটাকে। হঠাৎ কেন যেন তার মনে হয়, বাসর-জাগা এই নির্ঘুম প্রহরণকে ঘুম পাড়িয়ে রাখা উচিত, নইলে বাসরকন্যাই একে তার নিজের বুকে বসিয়ে দিতে পারে।

খাট থেকে একটি বালিশ টেনে নেয় প্রমিত। ঘরের কোণে খাড়া করে রাখা গোটানো মাদুরটা নেয়। মেঝেয় পেতে বালিশের তলায় রেখে দেয় বরুণের ভোজালিটা। তারপর আবার ফিরে আসে খাটের কাছে। সমস্ত ফুল খাটের গা থেকে নামিয়ে ঘরের একটি কোণে স্তূপ করে রাখে। অলংকারগুলি তুলে এনে ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দেয়। ফুলকে সরিয়ে দিলেই শয্যাটা আর ফুলশয্যা থাকে না। গলার মালাটাও নামিয়ে দেয়। বাথরুমে ঢুকে নিজের মুখের চন্দনের ছাপ ধুয়ে আসে প্রমিত।

তোয়ালেয় ভেজা মুখ মুছতে মুছতে দীপিতার সামনে এসে দাঁড়ায় এবং প্রমিত বলে—তুমিও গলার মালা ফেলে দাও, আমি ফুলশয্যা ভেঙে দিলাম। বাথরুমে যাও, সব চিহ্ন ধুয়ে ফেল। তারপর এই খাটেই শান্ত মনে ঘুমিয়ে পড়ো। কষ্ট পেও না, বিয়েটাকে খুবই সামান্য ভুল মনে করবে। আমি শুতে গেলাম। বলে মাদুরের কাছে চলে আসে। ঘরের উজ্জ্বল আলো নিবিয়ে দিয়ে একটি রাত-প্রহরী নিষ্প্রভ বাল্ব ঘরে জ্বেলে দেয়। বাথরুমে আলো আছে। সেই দিকে চেয়ে দেখে দীপিতা। কিন্তু কোথাও নড়তে পারে না। মূর্তির মতোই খাটে বসে থাকে।

প্রমিত বালিশের তলায় অস্ত্র রেখে শুয়ে পড়ে। চোখও বন্ধ করে। ঘুম আসবে না জেনেও চোখ খোলে না। আধঘন্টা বাদে চোখ মেলে দেখে, মূর্তিটা খাটে সত্যিই শুয়ে পড়েছে। মাদুরের উপর উঠে বসে প্রমিত। চুপ করে বসে থাকে। এক সময় ঘরের রাত-জাগা আলো চোখে সয়ে গিয়ে দৃষ্টি অধিক পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। খাটের কাছে উঠে আসে প্রমিত। অবাক হয়ে দেখে দীপিতা চন্দন মোছেনি, গলার মালাও ফেলে দেয়নি। অক্ষয় সজ্জায় কনে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুমের শ্বাসে তার বুকের ওঠাপড়া দেখে প্রমিত। পেটের

কাছে শাড়ি কিছুটা সরে গিয়ে মদির ত্বক প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। মাথায় ঘোমটা নেই, মুখ উদ্ভাসিত, পায়ের গোছ দেখা যাচ্ছে। শাড়ি কিছু অসংবৃত। মনে ভারি লোভ জন্মায় প্রমিতের।

হাত বাড়িয়ে স্ত্রীর অঙ্গ স্পর্শ করতে সাধ জাগে প্রমিতের। স্ত্রীর বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তেও বাসনা হয়। কিন্তু ফুলশয্যায় স্ত্রী-ধর্ষণের প্রবৃত্তি তার ছিল না। ফুলবিহীন বিছানার দিকে চেয়ে স্ত্রীর বালিশের কাছে মাত্র একটি সাদা পাপড়ি অবশেষ পড়ে থাকতে দেখে লোভার্ত হাতটা সেদিকে বাড়িয়ে বসে এবং ঠিক তখনই দীপিতার ঘুম চটে যায়। চোখ মেলেই ভয়ে বিছানায় ধড়পড়িয়ে উঠে বসে এবং বলে ওঠে—আপনি কী করছেন? এখানে কেন?

থতমত গলায় প্রমিত বলে ওঠে—আমি খারাপ উদ্দেশ্যে এখানে আসিনি দীপিতা! বালিশের ওখানে একটা সাদা পাপড়ি দেখে লোভ হল। ভুল বুঝো না আমাকে! তুমি ঘুমাতে পারলে কিনা, তাই, এভাবে...আর কথা সাজাতে পারল না প্রমিত। বোকার মতো পাপড়িটার দিকে হাত বাড়িয়ে মনে হল, একটা নয়, একজোড়া পাপড়ি।

কিছু বুঝে ওঠার আগেই জোড়া পাপড়ি ডানা মেলে ঘরের মধ্যে উড়তে লাগল। প্রমিতের আর বিস্ময়ের শেষ রইল না। ঘরে সাদা সিসে রঙের উজ্জ্বলতায় উড়ছে একটি বিমূঢ় প্রজাপতি, এই প্রাণের সংকেত প্রমিতকে পরিহাস করতে থাকলেও, তার ভারি আনন্দ হচ্ছিল। জোড়া পাপড়িকে শূন্যে অনুসরণ করে খাটের কাছ থেকে চলে এল প্রমিত। প্রজাপতিটা উড়তে উড়তে এসে লাগল বুক-সেলফের মাথায়। বসে রইল।

প্রমিতের আনন্দ দেখে দীপিতা আশ্চর্য হয়েছিল। কিন্তু সে আর ঘুমাতে পারেনি। রাতটা পার করার পক্ষে, একটি অদ্ভুত প্রজাপতিই শিল্পী প্রমিতের পক্ষে যথেষ্ট ছিল। তার ওড়া আর বসা দেখতে দেখতেই এক সময় ভোর হয়ে এসেছিল। জানলা খুলে প্রজাপতিটাকে শুদ্ধ ভোরের বাতাসে চলে যেতে দিয়েছিল প্রমিত। সবই লক্ষ করেছিল দীপিতা। কিন্তু কোনও কথা বলেনি।

সকালেই এ বাড়িতে জিনসের ধুলো ধুলো প্যান্ট, কোমরে ভারি বেল্ট, একটি চকরাবকরা গাঢ় রঙের শার্ট পরা, ঝোলা গোঁফ এবং পাতলা করে কামানো কিন্তু গাল অবধি টানা জুলফি, এক হাতে বালা পরা বরুণ এসে উপস্থিত হয়েছিল। চোখের দৃষ্টি মদ্যপের মতো উগ্র, মাথার চুল এলোমেলো, মুখে অল্প খোঁচা খোঁচা দাড়ি। ঠোঁটের কাছে কাটা গালের দাগ চকচক করছে দাড়ির খোঁচা ছাপিয়ে।

বাইরে বৈঠকখানায় বরুণ বসে আছে শুনে দীপিতা অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ে। লক্ষ করে প্রমিত খাপে আঁটা ভোজালিটা হাতে করে বাইরে চলে গেল। দ্রুতই পিছু পিছু ছুটে আসে দীপিতা। এসে সামান্য পর্দা ঠেলে দরজার মুখটায় দাঁড়ায়।

মুখোমুখি দু'খানি নিচু সোফা, মাঝখানে কাচের সামান্য উঁচু একটি লম্বা টি-টেবিল। তার উপর ভোরের খবরের কাগজ পড়ে আছে। এখন সকাল সাড়ে দশটা বেজে গিয়েছে।

ভোজালিটা টেবিলটার উপর খবরের কাগজের পাশে আস্তে করে রেখে প্রমিত বরুণকে বলল—আগে কখনও দেখিনি। তবে তোমাকে আমি জানি। এই ভোজালিটা তুমি চিনতে পারো? বলেই হাসিমুখে ঘাড় বাঁকিয়ে তুলে দরজার কাছে পর্দা ঠেলে দাঁড়ানো দীপিতাকে একবার দেখে নেয় প্রমিত। বাইরে বেশ চড়া রোদ। বরুণ ঘামে ভিজে গেছে। মাথার উপর ফ্যান ঘুরছে।

এই রকম অপ্রত্যাশিত কঠিন আপ্যায়ন সত্ত্বেও বরুণ খুব কিছু বিচলিত হল না। সামান্য মুহূর্ত বোকার মতো হেসে সামলে নিল এবং অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় দীপিতাকে বলল—ফ্যানের পয়েন্ট দু'ঘাট বাড়িয়ে দাও না দীপিতা! বড্ড গরম।

দীপিতা পর্দা ঠেলে বেরিয়ে এল এবং দেয়ালে নব ঘুরিয়ে পাখার গতি বাড়িয়ে দিল। আবার পর্দার কাছেই ঘেঁষে গেল। বরুণ ঠান্ডা গলায় বলল—তোমার শ্বশুরবাড়ি দেখতে এলাম, আমাকে এক গেলাস গন্ধ সরবত দাও দীপিতা। আর কিছু চাইব না। যাও, নিয়ে এসো।

নির্দেশ শুনেও দীপিতা দাঁড়িয়ে আছে দেখে বরুণ অবাক গলায় বলল—এক রাতেই তোমাদের এত প্রেম হয়েছে যে, স্বামীকে পাহারা দিয়ে থাকতে হচ্ছে! যাও, ভয় কোরো না, আমি এখনই চলে যাব। যাওয়ার সময় আমার ভোজালিটা আমি সঙ্গে নিয়ে যাব। আপনি ভাববেন না মাস্টার।

—মাস্টার! বিস্মিত হয়ে প্রমিত বলে—আমি কোনও মাস্টার নই বরুণ!

বরুণ হালকা হেসে বলল—আঁকার স্কুলে আপনি মাস্টারি করেন না? বলেই ভোজালিটা হাতে উঠিয়ে নেয়। খাপ খোলা মাত্রই সকালের আলোয় অস্ত্রটা ঝলসে ওঠে।

ঝলসানো অস্ত্রের সুতীক্ষ্ণ ধারের দিকে চেয়ে শঙ্কিত ভীত দীপিতা নড়তে পারছিল না। ভোজালিটা হাতে নিয়ে উল্টেপাল্টে দেখছিল বরুণ, যেন বা ধার পড়ে গেছে কি না পরখ করছিল।

প্রমিত বরুণের পাঁয়তাড়া দেখে একটুও কাঁপল না। দীপিতার দিকে সরল দৃষ্টি ফেলে বলল—যাও, সরবত নিয়ে এসো। বলে বরুণের ভাবভঙ্গি গভীর মনোযোগ দিয়ে লক্ষ করতে থাকে। রোমশ হাতের বালাটাও লক্ষ করে। তারপর বলে—শোনো বরুণ, ওটা তোমার পার্টিকে নিয়ে গিয়ে দেখাও। মানুষকে এভাবে আর ভয় দেখাবে না। খাপে ঢুকিয়ে রেখে দাও। আমি আসছি। বলেই দ্রুত উঠে দাঁড়িয়ে ভেতরে চলে আসে গল্পের নায়ক।

দীপিতার হাত থেকে সরবতের সুগন্ধি গেলাসটা কেড়ে নিয়ে প্রমিত বলল—তুমি আর বাইরে যেও না। আমিই ওকে বিদেয় করে দিচ্ছি। তোমাকে দেখলে ওর রোখ আরও বেড়ে যাবে।

শরবত হাতে প্রমিতকে সামনে উপস্থিত হতে দেখেই বরুণের দুই চোখ ধক করে জ্বলে উঠল। চেহারা মুহূর্তে বদলে গেল। ভয়ানক অপমানিত বোধ করল সে। কড়া গলায় বলল—আপনি কেন আনলেন? আমি তো দীপিতার হাতে সরবত চাইলাম। ওকে

আসতে বলুন।

—না, ও আসবে না। আমি দিচ্ছি, খাও খেয়ে বিদেয় হও।

—ও, তাই নাকি! বেশ, দ্যান তা হলে। কিন্তু পার্টিকে জিনিসটা শুধু দেখানো যায় না, খানিকটা রক্ত মাখাতে হয়। বলে সরবতের গেলাস প্রায় ছিনিয়ে নিয়ে সমস্ত সরবত প্রমিতের মুখে ছুঁড়ে মারে বরুণ মাস্তান। তারপরই প্রমিতের ভেজা গালের দিকে চেয়ে উৎকট শব্দে হেসে ওঠে।

বরুণের হিংস্র উল্লসিত হাসির শব্দ কানে আসে দীপিতার। ফুলশয্যার ঘর থেকে ছুটে বৈঠকখানায় আসতে গিয়ে তার পায়ে জড়িয়ে যায় একটি ফুলের মালা। মালাটিকে পা থেকে ছাড়াতে ছাড়াতে প্রমিতের তীব্র তীক্ষ্ণ আর্ত চিৎকার শুনতে পায়। একবারই সেই নিরবলম্ব উচ্চকিত ধ্বনি ফেটে উঠে থেমে যায়। বৈঠকখানায় ছুটে আসে দীপিতা।

গালে হাত চেপে বসে রয়েছে প্রমিত। গাল থেকে হাত বেয়ে টেবিলের কাচে টুপিয়ে পড়ছে সুগন্ধিত মিষ্টি রক্ত, সেই শোণিত ঘ্রাণে দীপিতার সমস্ত স্নায়ু অবশ হয়ে আসতে চাইছে। স্বামীকে সে পাগলের মতো স্পর্শ করে বলে ওঠে—এ তুমি কী করলে বরুণ! আমি যে তোমার কাছেই ফিরে যেতাম!

সুতীব্র কষ্টের মধ্যেও রাজ্যের বিস্ময় দু'চোখে জড়ো করে প্রমিত স্ত্রী অসহায় মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলল। তার মনে হয়েছিল, প্রেম একটি বীভৎস শক্তি এবং সে আদি দুর্বৃত্ত।

গালে ডাক্তারি সেলাই পড়ল প্রমিতের এবং চিরস্থায়ী দাগ পড়ে গেল। সেই কলঙ্কিত চিহ্নকে ঢাকবার জন্য দাড়ি রাখল সে। সমাজের দুর্বৃত্তায়ন সম্বন্ধে কাগুজে নিবন্ধ পাঠ করা, মঞ্চবদ্ধ লেকচার শোনা আর গালে দাড়ির আড়ালে পলিটিক্সের রক্তমাখা ভোজালির চিহ্ন বহন করা এক জিনিস নয় ; যাকে বইতে হয় সে জানে, তার রক্তের মধ্যে একটি সাদা প্রজাপতি মরে গিয়েছে ; এই সমাজকে কখনও সে ভালোবাসতে পারবে না। প্রমিত রাজনৈতিক যে-কোনও নেতার মুখ দেখে আঁতকে ওঠে। একটি মহাআতঙ্ক তার রক্তে বোবার মতো ঢুকে পড়ে।

প্রমিতের বাবা-মা দীপিতাকে আর রাখতে চাইলেন না। ঘটনার এক সপ্তাহের মধ্যেই ঠেলে তার মামার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। বিদায়ের দিন অতি তৃষ্ণার্ত চোখে দীপিতা আহত এবং শায়িত প্রমিতের মুখের দিকে চেয়ে রইল, প্রমিত কিছুতেই চোখ তুলল না। দীপিতা শুভদৃষ্টি চায়নি, তাই প্রমিত কি বিদায়ক্ষণে অশুভ দৃষ্টির ভয়ে চোখ তুলল না? প্রমিত তার ছবিতে খাদের ধারে এনে একটি ঘোড়াকে শূন্যে দু'পা তুলে অর্পিত করল বাতাসে, তাকে বিদ্ধ করল ভয়াল বর্শা, কাত হয়ে চিত্রার্পিত বাদামি অশ্ব গহ্বরে টলে পড়ছে, দেখা গেল। প্রত্যেক ছবিতে জেগে উঠল অস্পষ্ট একটি ঘাতক-মুখ, সর্পসদৃশ একটি ভোজালি বেঁকেচুরে গলে যাচ্ছিল মহাশূন্যে এবং কারা যেন মঞ্চে পৃথিবীর ক্রমমুক্তির চিবনো বক্তৃতা করে চলেছে।

দুই

দিবাকরের মুখের দিকে ঠান্ডা নাতিপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাইল প্রমিত। দেখল, বন্ধুর চোখ দু'টি অদ্ভুত কষ্টে ছলছল করছে। সেই অশ্রুর দিকে আলতো বিস্ময়ে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল সে। তারপর মৃদুকণ্ঠে বলল—আমি দাড়ি রেখেছি কেন, পাড়ার লোক জানে। আমি রাস্তায় হেঁটে গেলে, আমার দুর্ভাগ্যের কথা লোকে ফিশফিশিয়ে বলে। মানুষের এই ধরনের দুর্ভাগ্যের ঘটনা লোকে উপভোগ করবার জন্য একটা কাহিনী গুছিয়ে তৈরি করে নেয়। যা ঘটেছে তা-ও বলে, যা ঘটেনি তা-ও বলে। আমার মুখের দাড়ি লক্ষ করে বলবার সময় বক্তার দৃষ্টি চকমক করে, আমি তখন পাগলের মতো ছুটে পালিয়ে যাই। কিন্তু এ আর সহ্য হয় না দিবাকর। একদৃষ্টে কেউ আমাকে দেখে যখন, ভাবি....

—এভাবে ভেবো না প্রমিত। তুমি ক্ষমা করো।

—করেছি। আমার কারও উপর রাগ নেই। শুধু ভাবি, কোনও কিছুকে আর ডিটেলসে দেখতে যাব না, বিশেষ করে মানুষকে। এই মনটাকে নিয়ে কোথাও আমাকে পালাতে হবে।

—কোথায় যাবে?

—যেখানে আমাকে কেউ চেনে না। আমার দুর্ভাগ্যের কথা যেখানে কেউ ফিশফিশ করে বলবে না। এমন একটা জায়গা যেখানে বাচ্চাদের জন্য একটি চমৎকার আঁকার স্কুল খুলতে পারব। খুব গরিবের মতো থাকব, আমার অস্তিত্ব যেখানে মানুষের বাড়তি মনোযোগ দাবি করবে না। তোমার সঙ্গে আর দেখা হবে না দিবাকর।

চোখ থেকে এবার নিঃশব্দে জল গড়িয়ে পড়ল দিবাকরের। সে এরপর কী বলবে ভেবে পাচ্ছিল না।

গলাটা ধরে এসেছিল দিবাকরের, সেই ধরা গলাতেই সে বলে উঠল—মানুষ একদিন তোমার সম্পর্কে গল্প থামাবে, গাওনা বন্ধ করবে। তুমি দু'দিন সহ্য করো প্রমিত।

প্রমিত এবার নিঃশব্দে হেসে ফেলে বলল—আমি যদি পাগল হয়ে যাই, সেই ভয় আমার আছে, তাহলে মানুষ রাস্তায় বা স্টেশনে পাগলটাকে দেখেই গল্পটা বলবে। গল্পটা প্রসিদ্ধ হবে, ওটা আর থামবে না। এখানে আর থাকা যায় না দিবাকর।

একটি খাবারের দোকানে একটি টেবিলকে ঘিরে মুখোমুখি বসেছিল ওরা। প্রমিতের একটা হাত টেবিলের উপর পড়েছিল। সহসা সেই হাত খপ করে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল দিবাকর। কুণ্ঠিত গলায় বলে উঠল—আমার অপরাধ তুমি ক্ষমা করো প্রমিত। আমি বুঝতে পারিনি। আমি তোমার ওপর জোর করেছিলাম।

প্রমিত শুকনো গলায় বলল—ভোজালিটা আমার গালে চালানোর আগে, গেলাসের শরবত মুখে ছুঁড়ে মেরে গালটাকে ভিজিয়ে নরম করে নিয়েছিল বরুণ, তারপর আচমকা চালিয়ে দিল। আমি বলছি তোমাকে, এত সত্ত্বেও ভোজালির সুন্দর নকশা ভোলা যাবে না। এই দেশে শিল্প দিয়ে হিংসাকে ঢাকবার ব্যবস্থা চিরকাল আছে। কষ্ট হচ্ছে এ কথা

ভেবে যে, অমন সুন্দর নকশা কেন! গালটা ওভাবে ভিজিয়ে নিল বরুণ, তা-ও খুব আশ্চর্যের, কখনও ভুলব না! অথচ আমি দীপিতাকে কখনও নিভৃতে একা কাঁদতে দেখলাম না। মনে হচ্ছিল যে, সে জয়ী হয়েছে।

প্রমিতের কথার মুখেই দিবাকর দুম করে ঘোষণা করল—দীপিতা বরুণের কাছেই ফিরে যেতে চাইছে। আমি আর ভাবতে পারি না।

—আমি পারি! বলে ওঠে প্রমিত। তা শুনে ঈষৎ চমকে দিবাকর প্রমিতের মুখের দিকে চায়। তখন প্রমিত হেসে উঠে বলে— আমি এখন সমস্তই ঠিকঠিক ভাবতে পারি। আমার কল্পনা আর আমার শত্রুতা করবে না। দীপিতাকে যেতে দাও, বাধা দিও না। ওর পক্ষে যা স্বাভাবিক, তাই করতে দাও।

—তুমি তা হলে চলে যাবে?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—কাউকে আমি বলে যাব না দিবাকর।

—আমি বলছিলাম...

প্রমিত সটান দাঁড়িয়ে উঠেছিল। অবাক হয়ে বলল—বুঝতে পারছি। তুমি ডিভোর্সের কথা বলছ। আমাদের মিউচুয়াল সেপারেশনই হবে। উকিল দ্যাখো।

দিবাকর বলল—অত তাড়াতাড়ি তো হবে না। ফাইল স্যুট করার আগে তোমাদের দু'জনের অন্তত এক বছর আলাদা থাকতে হবে।

—তুমি সবই জেনেছ তা হলে! বেশ তো, আলাদাই তো আছি। এক বছর কেন, আরও সময় লাগলে নাও। যা হয় করো... আমার আর সত্যিই ভাললাগে না দিবাকর। তবে সময় যত দীর্ঘ হবে, আমার অস্বস্তি আর যন্ত্রণা তত বাড়বে। আমি সব কিছু খুব দ্রুত ভুলতে চাই। বলে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে হঠাৎ প্রমিত কী একটা চিন্তা করে বলল—শোনো, এক বছর পরই তাহলে আমাদের দেখা হচ্ছে। অত ভেবো না, আমি কথা দিচ্ছি, যথা সময়ে আমি আসব।

—আমি তোমার ঠিকানা পাব না? দিবাকর অসহায় গলায় জানতে চাইল।

প্রমিত কড়া গলায় বলল—না। বলেই খাবারের দোকান থেকে দ্রুত বেরিয়ে উদ্‌ভ্রান্তের গতিতে পথে নেমে ছুটতে লাগল। দোকানের বাইরে বেরিয়ে এসে দিবাকর বন্ধুর ছুটে যাওয়ার উদ্‌ভ্রান্তি লক্ষ করে মনে মনে অত্যন্ত কষ্ট পেল এবং বিমর্ষ বিস্ময়ে পথের দিকে চেয়ে রইল।

অতঃপর প্রমিত এক অদ্ভুত পৃথিবীতে ধীরে ধীরে প্রবেশ করতে থাকল। সে পেরিয়ে এল তার নিজস্ব পরগনা, নিজস্ব জিলা—তার সমস্ত পরিচিত পরিবেশ। এসে পৌঁছালো কোনও এক নদীর ধারের আশ্রমের পাশে। সেখানে টালির চালের কঞ্চির বেড়ায় মাটি লেপা একটি ক্ষুদ্র কুটির পঞ্চাশ টাকা মাসিক ভাড়ায় থাকার জন্য বন্দোবস্ত করে নিল। ঘরের হালকা কাঠের দরজায় আলকাতরা লাগানো। ঘরে কোনও পাল্লা

লাগানো জানলা না থাকলেও বেশ ক্ষুদ্র মাপের কঞ্চি গাঁথা ফোকর আছে, সেটির গায়ে চটের ঢাকনা ফেলা। চট তুলে উপরে গুঁজে রাখার গোঁজ আছে, চট তুললে হাতের কাছেই নদী দেখা যায়। এটি একটি বিড়ি পট্টি। উঁচু হাইওয়ের গায়ে এখানকার বসতি অনেকখানি নিচু, মনে হয় প্রশস্ত খাদে বস্তিটা পড়ে আছে। নদীতে বান হলে প্রত্যেক বছর কিছুদিনের জন্য বসত ভেসে যায়। বান নামলে ফাট লেগে মাটির দেয়াল পড়ে যায়। তখন গেঁথে তুলতে হয়। নতুন দেয়াল গাঁথালেপা হলে মাসিক ভাড়া পাঁচ দশ টাকা বাড়াতে হয়।

এখানে বিড়ির মেয়ে-কারিগরই বেশি। পুরুষদের অনেকে রিকশা টানে, কুলিগিরি করে। এক মাইল দূরে শহর। এখান থেকে অনেক মেয়ে ঝি খাটতে শহরে যায়। থাকে ওরা চালে মাথা ঠেকে যাওয়া মাটির তালু সমান ঘরে। ছাগল মুরগি পালে।

প্রমিত গভীর রাতেও এখানে মেয়েতে মেয়েতে ঝগড়া বেঁধে উঠতে দেখেছে। বচসা বেঁধেছে দিন-দ্বিপ্রহরে। কার যেন মুরগি অন্য কার খুলায় ডিম দিয়েছে, অথচ সেই ডিম ব্যাপারির কাছে বেচে দিতে গিয়ে ধরা পড়ল বউটা। কীভাবে ধরা পড়ল? ডিমের সাইজ আর রঙই বলে দিল এ কার মুরগির আন্ডা। তখনই বিশ্বায়নগ্রস্ত অর্থনীতি এবং দুর্বৃত্তের ভল্ল-বিক্ষত প্রমিত ভাবল, বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি! সামান্য একটি আঙরা ডিম্বের বিতণ্ডা বিশ্ব অর্থনীতির প্রাঙ্গণে একটি মুরগির সুতীব্র তীক্ষ্ণ ডাক ছাড়া প্রমিতকে কিছুই শোনাতে পারল না। লালঝুটি মোরগের ডাকে নদীতে এখানে ভোর হয়। এখানে কারও হাতেই কোনও ভোজালি ছিল না, মেয়েদের হাতে ধরা ছিল বিড়ি বাঁধবার রঙিন সুতো।

এখানে নুরান সাঁইয়ের আশ্রম। তাঁরই চেষ্টায় শহরের একেবারে কোলে একটি স্কুল-বাড়িতে সকালবেলায় আঁকার স্কুল খোলা গেল। নুরানকে দেখে অত্যন্ত অবাক হল প্রমিত। শহরে শিক্ষিত মহলেও মানুষটার প্রভাব আছে। তাঁর আশ্রমে বিদ্বানের আনাগোনাও লক্ষ করা গেল। এখানে এসে কলকাতার অনেক বিদূষীও পড়ে থেকেছেন। দেখা গেছে দু-একটি বিদেশিনীকেও, তাঁরা এসেছেন বাংলার লোকস্তরের সংস্কৃতিকে গবেষণার কাজে লাগানোর জন্য। নুরানের মুখের ভাষা প্রায় শিক্ষিত মানুষের মতোই সচ্ছল।

নুরান প্রমিতকে কোনও ওজর ছাড়াই সাহায্য করলেন। এমনভাবে কথা বললেন, যেন সে সাঁইজির কতকালের চেনা। বললেন—তোমারও কি গবেষণার কাজ বাপু?

প্রমিত বলল—আজ্ঞে না। আমি আপনার ড-ফোঁটার প্রত্যাশী নই। আমি আসলে পলাতক। খুন করিনি, খুন হয়ে এখানে চলে এসেছি বাবা।

নুরান বললেন—এ তো আউলের আখড়া জীবানন্দ। আউল মানে পাগল।

—জীবানন্দ?

—হ্যাঁ, জীবেন। তুমি জীব ছাড়া কীই বা! আশ্বিনের কুক্কুরী তোমাকে কামড়েছে।

শুনেই হতভম্ব প্রমিত আপাদমস্তক চমকে উঠল। তখন থেকেই সামুদ্রিক জলগর্ভের মতো প্রমিতকে নুরান টানতে থাকলেন সবেগে নিজের দিকে।

একদিন প্রমিত নুরানের সামনে বলে উঠল—আমি যে তাকে ভুলতে পারি না বাবা!

—কী ভুলতে পারো না? তার অঙ্গ, না তার মন?

—মুখটা সাঁইজি! চন্দনের কৌটায় আঁকা একটা মুখ। আমি বিছানায় পেয়েও তাকে ভোগ করতে পারিনি। আমার দাড়ির আড়ালে একটা কাটা দাগ আছে, ওটাকে মুছে দাও ফকির সাহেব।

—ওহ, দাড়িটা তাহলে তোমার প্রচ্ছদ? বিষয়ের সঙ্গে তোমার প্রচ্ছদের মিল নেই হতভাগা। এই জন্যেই পুরনো লেবাস তোমাকে ফেলে দিতে হবে। লেবাস বোঝো?

—আজ্ঞে না।

—লেবাস হচ্ছে পোশাক। লেবাস ফেলে দেবে, নাম ফেলে দেবে। কিন্তু ভেক ধরবে না। অঙ্গ ফেলে দাও।

—অঙ্গ ফেলে দেব!

নুরান এ বার হাহা করে হাসতে লাগলেন। বেশ কিছুক্ষণ ধরে নানান সুন্দর লয়ে মগ্ন হয়ে হেসে চললেন। তারপর হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন—তুমি ভোগ করোনি, আমি তোমার ভোগের বন্দোবস্ত করতে পারি। তাহলে অঙ্গ না পারো, খোলস ফেলতে হবে। মনে রাখবা, সাপ খোলস ফেলে অঙ্গ নতুন করে নেয়। শোনো, তুমি যে আগুনে পুড়ছ, তার নাম স্মৃতি। ওই আগুন হাতায় করে বয়ে বেড়ায় ইবলিস। স্মৃতির বিষ থেকে অঙ্গ রক্ষা করার নাম তপস্যা। আমি তোমাকে ধ্যান দেব। তোমার লাগবে উল্টা পাক।

ভেক ধরল না প্রমিত। কিন্তু নাম ফেলে দিল। তার নতুন নাম হল জীবানন্দ ফকির। গভীর রাতে চাপা ভারী গলায় নুরান একদিন প্রতিমকে জানালেন—আমার একটা পৈতৃক নাম ছিল ভাই জীবানন্দ। প্রমথেশ। অনেক কাল বাদে হঠাৎ তোমার নাম দিতে গিয়ে মনে পড়ে গেল। স্মৃতির কয়েদ খাটা কি ভালো? তুমি বিশ্বাস করতে পার, স্মৃতি মুছে ফেলা যায়।

স্মৃতি মুছে ফেলা যায় শুনে আশ্চর্য আকুলতা অনুভব করল জীবানন্দ। বলল—আপনার তা হলে অতীত নামটা মনে পড়ল কেন?

—পড়ে। কিন্তু কষ্ট হয় না। মনে হচ্ছে, আমার নাম ছিল অরুণেশ। মায়ের নাম নির্মলা কিংবা সাবিত্রী। বাবা ব্রিজেশ বা ওই রকম কী একটা। আমি জন্ম মানি না। তোমার দাড়ির শিকড়ে আমি লোক-ঔষধি লেপে দেব। দাগ মুছে যাবে। আমি জন্মদাগ মুছে ফেলেছি।

—কী ছিল জন্মদাগ?

—একটা লাল জড়ুল। ওটাকে কেটেছিলাম বাদামি ঘোড়ার বেলেচি অর্থাৎ লেজের চুল দিয়ে বেঁধে। তারপর ওষুধ দিই, আউলে ওষুধ। দাগ নেই। মনে রাখবা, অঙ্গ সব কিছু ধরে না, ফেলে দিতেও পারে।

—কিন্তু আমি যে ছবি আঁকি, সংসারের সবকিছু ফেলে দেব কী করে?

—তুমি সেটাই ফেলে দিতে চাইছ, যেটি ফেলে দিতে হয়। বৈরাগ্যের দৃষ্টি তো খারাপ নয়। ওই দৃষ্টিতেও ছবি আসে। তোমার জন্য পরমান্ন নিয়ে পথে কোনও নারী দাঁড়িয়ে নেই জীবনানন্দ। আছে?

—না।

—সেই নেইটুকুনই আঁকতে পারো? বুদ্ধের খালি হাত, খালি চিত্ত, অপূর্ণতা। খিদে। তেষ্টা।

—আপনি এই সব বলছেন কী করে! আপনি কতদূর পড়াশোনা করেছেন?

—ফকির লালনের 'পাঠশালা পর্যন্ত। যাও, এখন ধ্যানে বসতে হবে। উল্টা পাক লাগাতে হবে তোমাকে। কাজটি কঠিন।

নুরানের অতীত অস্পষ্ট। কিন্তু এই ব্যক্তি বিদ্বান, গোপনচারী এবং সমাজ-শ্রেণীভ্রষ্ট ফকির। পালিয়ে এসেছেন আর ফিরে যাননি। তাঁর জন্যও কি কোনও নারী পরমান্ন সাজিয়ে অপেক্ষা করেনি! এখান থেকে মানুষ ফিরতে পারে না কেন?

উল্টা পাকের ধ্যানে বসেই কিছু টের পেল প্রমিত। পদ্মাসনে বসতে হল তাকে। দুই হাঁটুতে রাখা সটান দৃঢ় হাত। দাঁড়া টান করা। মাথাটা এ বার সামনে ঠেলে দিয়ে ঝোলাতে হবে, যেন সে পাত্রে রাখা জল খেতে অনেকটাই ঝুঁকেছে। মাথাটাকে ওই অবস্থায় বাঁ দিকে টেনে নিয়ে গিয়ে দুলে দুলে পাকে তুলে ডাইনে ঝোঁক দিয়ে টেনে এনে ফেলতে হবে। এই ভাবে ডান থেকে সামনে সটান ঝুলিয়ে টানতে হবে বাঁয়ে, এই ভাবেই পাকিয়ে তুলতে হবে মাথা এবং মোচড়াতে হবে শরীর। মাথাটা যেন পাগলের মতো না না করতে থাকে। কারণ মানুষের অন্তর গহনে পথ আছে, মস্তিষ্কে রয়েছে সুড়ঙ্গ, একটি বিন্দুর মধ্য দিয়ে নেতির সর্পজিহ্বা চলে গিয়ে চেটে চলেছে বিস্মৃতির চরম অন্ধকার। একফোঁটা পিঙ্গল আলো পড়ে না।

—বল জীবানন্দ, নাই। কানের কাছে মুখ এনে ফিশফিশ করে বলে উঠলেন নুরান সাঁই।

—নাই? খুবই চমৎকৃত হল প্রমিত।

—হ্যাঁ, বলো। নাই।

—কী নাই বাবা?

—নাম নাই। মুখ নাই। বুক নাই, পা নাই, উরু নাই, উরুসন্ধি নাই। বলো, বাহু নাই, বাহুমূল নাই। নাভি নাই। দৃষ্টি নাই।

—কী বলছেন, সাঁইজি।

—নাম, ভুলেছ, অঙ্গ ভুলতে কতক্ষণ। তুমি সুড়ঙ্গে প্রবেশ করো। এখানেই কিছুক্ষণ বাস করো তুমি। তারপর এখানে খোলস ফেলে তোমাকে বেরিয়ে আসতে হবে। বলো, বিস্মৃতিই সুখ। বলো, অন্ধকারেই আনন্দ। যে জীব অন্ধকারে থাকে। সে কি সুখহীন? মস্তিষ্কের যে-কোটরে এখনও জগতের আলো পড়েনি, সে কি নিরানন্দ? মস্তিষ্ককোষের কচি কিশলয় ফুটে উঠুক।

—আমি কি সরীসৃপ?

—না, তুমি যেখানে এখন এসেছ, তা এক অন্য কক্ষ, এখানে চেরাজিহ্বা অন্ধকার লেহন করে না। এখানে এসে নবজন্ম হল তোমার। খোলস পড়ে রইল অন্য কোঠায়। বলো, শব্দ নাই, খোলস নাই, নাম নাই।

প্রমিত ঘেমে নেয়ে উঠেছিল, কাঁপা এবং ধরা গলায় কোনও প্রকারে বলে উঠল—নাই।

তারপর ক্লান্ত গলায় অস্ফুট বলল—আমি কি বাঁচব! বলে সে ধ্যানের ভঙ্গি ছেড়ে মেঝেয় কাত হয়ে পড়ে গেল। কিছুক্ষণ তার জ্ঞান রইল না। জ্ঞান ফিরে পেলে নুরান প্রশ্ন করলেন—কার মুখ মনে পড়ে?

ভয়ার্ত গলায় প্রমিত বলল—পড়ে না।

নুরান জানতে চাইলেন—নাম মনে পড়ে?

প্রমিত বলল—এখনও পড়ে।

নুরানের প্রশ্ন—কী নাম?

প্রমিত বলল—আলো।

'দীপিতা' শব্দটি ভুলে গেল জীবানন্দ।

কঠিন গলায় নুরান বললেন—ধ্যানে আরও মন দাও জীবানন্দ। মনে রাখবে রাজনীতির তমসা এবং মানুষের যৌনহিংসার চেয়ে এই অন্ধকার সুন্দর। যে ভোজালি তোমাকে কেটেছে সে এই বিস্মৃত কোটরে ঢুকতে পারে না। এ মাতৃস্নেহের চেয়ে ঘন এবং পবিত্র।

ধ্যানে আরও মন দিল প্রমিত। এই ভাবে তার একটা বছর কেটে গেল। একদিন অতি প্রত্যূষে নদীতে স্নানে নেমে জলের গভীরে পা হড়কে চলে এল। জলের তলায় চোখ খুলে চাইল, কী ভীষণ আলো! সেই আলো আর সহ্য করতে পারল না সে। জলের উপরে ভেসে উঠে দেখল, সূর্য উঠছে। তখনই সে দিবাকরের নামটা মনে করবার চেষ্টা করে বুঝল, বন্ধুর নাম হয়তো দিনমণি মজুমদার, তবে ওটা সঠিক নাম নয়। 'আলো'-ও কারও নাম নয়।

অসম্ভব হাঁসফাঁস করে উঠল বুকটা। অনেক রকমের লোক-ঔষধি তাকে খাওয়ানো হয়েছে। মাথাটা সব সময় ঘোরে। একটি তমসা-বিন্দুতে সে আছে। বাইরের চোখ নয়, ভেতরের দৃষ্টিতে সে কী একটা দেখে। এই অবস্থাতে নুরান তাকে এক অমাবস্যার রাতে নারীভোগ দিলেন।

ঘরের মধ্যে পাথরে খোদাই করা মূর্তির মতো বলিষ্ঠ একটি মেয়ে এল, গায়ে তার সুতো নেই। চৌকির উপর শুয়েছিল প্রমিত। নীচে পায়ার ইটে রাখা অতি ক্ষীণশিখায় জ্বলছে একটা কুপি। এখানে কেরোসিন সামর্থ্যের তুলনায় ভীষণই আক্রা। সেই আলোয় নগ্ন নারীকে দেখে চমকে উঠল প্রমিত।

—আমাকে সাঁইজি পাঠালেন। আমি তোমার প্রকৃতি। সাধন-সঙ্গী হব। রাখবে না

আমাকে? আমার দিকে তাকিয়ে বলো, নাই। প্রত্যেক অঙ্গের নাম ধরে বলো, নাই। আমি উপগত হব। যার অঙ্গ ভোলো নাই, তার অঙ্গ আড়াল করব আমি। আমি তোমার। দ্যাখো এই তো দেহ। ভয় কোরো না। এবার দ্যাখো। বলেই মেয়েটা গায়ে একটি কালো অদ্ভুত আবরণ চাপাল এবং কঙ্কালে পরিণত হল। এই সেই বীভৎস কামনা-মূর্তি।

তীব্র ভয়ে আর্তনাদ করে উঠল প্রমিত—দীপিতা। এ আমি কোথায় বউ? আমাকে বাঁচতে দে বরুণ। বলে হাহাকার মথিত আবেগে শব্দ করে কেঁদে উঠল পাগল জীবানন্দ। তার কান্না কোনও বাঁধ মানছিল না। সেই অন্ধকারে তার মস্তিষ্কে নবীন এক আলোকপূর্ণ কোষ জেগে ফুটে উঠছিল। দিবাকরের নামটিও তার মনে পড়ে গিয়েছিল।

মাংসল ছায়া-কঙ্কালটি নিঃশব্দে সরে যাচ্ছিল তার সম্মুখ থেকে বাইরের নিবিড়কৃষ্ণ অন্ধকারে।

অরণ্য বৃষ্টির গল্প

এ যুগে মেয়েরা অনেক বেশি সাহস ধরে, ছেলেরাই বরং একটু কেমন ন্যাদাগোবিন্দ টাইপের হয়ে যাচ্ছে। বিভিন্ন পেশায় যেমন, তেমনি লেখাজোকা, ছবি আঁকা, গান, নাটক—এই সব ব্যাপারেও মেয়েরা আগের তুলনায় অন্তত তিন ধাপ এগোতে পেরেছে। যে-কোনও বিষয়ে তিন ধাপ এগোনোই ভালো, মাত্র তিন, দুই বা এক ধাপ—তার বেশি নয়। খুব বেশি এগিয়ে গেলে মানুষ আর তাকে চিনতে পারে না, নেয় না, এমনকি ঠান্ডা বা উষ্ণ আপত্তি জানায় অথবা নিঃশব্দ উপেক্ষা করে।

ধরা যাক, বৃষ্টির কথা। বৃষ্টি গঙ্গোপাধ্যায়। এই মেয়েটাকে আমি এ যুগের আদর্শ মনে করি। একসঙ্গে বৃষ্টি কতরকম কাজই না করতে পারে। সবই অবশ্য সাহিত্য-শিল্পকে ঘিরে। ও কখনও শিল্পের বাইরে পা বাড়ায় না।

শিল্পের অন্তত তিনটি ক্ষেত্রে ওর গতায়াত সহজ। ও সব কিছুকে মোটামুটি গুছিয়ে নিতেও চেষ্টা করে, ওর কোনও কিছুই খুব একটা এলোমেলো নয়। যেমন ওর কাঁধের নীল রঙের কাপড়ের ব্যাগটা অত্যন্ত সুন্দর। ওই ধরনের ব্যাগ কোথায় কিনতে পাওয়া যায় ভাবছিলাম।

বৃষ্টি বলল—আপনি সকালটায় লেখেন বুঝি?

—হ্যাঁ। সকালে, মানে যতটা পারা যায় সকাল-সকাল বসতে হয়, রাত্রে কিছুই পারি না। কারণ রাত্রে চোখ নিয়ে অসুবিধা হয়। আচ্ছা, এই ব্যাগটা কোথাকার?

—তা তো জানি না। তবে মাস দুই আগে কলেজ স্ট্রিট থেকে কিনেছিলাম। তারপর নিজেই খানিকটা ফুলকারি করে নিয়েছি, সব সময়ই আমি কিছুটা অ্যাডিশন করে নিই। বদ-অভ্যাস বলতে পারেন!

—আরে না, তা কেন।

—তাতে করে হয় কী, ব্যাগটা নিজের নিজের লাগে, অন্যের থেকে আলাদাও হয়ে যায়।

—তোমার এই নিজের করে নেওয়াটা ভারি সুন্দর আর রুচিকর! খুব ভালো!

—ধন্যবাদ আপনাকে, আপনার তাহলে ভালো লেগেছে!

—হ্যাঁ-হ্যাঁ। ভালো তো বটেই! আচ্ছা, তোমার হাতে ওটা কী?

—এটা পত্রিকা। আমারই....

—তোমারই মানে?

—এই জন্যেই আপনার কাছে এসেছি। আমি করি এটা। সম্পাদক আমি। কী

করব!

—কেন?

—একটা লিটল ম্যাগাজিন, একাই করতে হয়। চটি কাগজ, টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে করি।

—আশ্চর্য! টিফিনের পয়সা বাঁচিয়ে তুমি একাই পত্রিকা বার করো?

—আপনি অবাক হচ্ছেন কেন? আপনারা কি করতেন না?

—একা তো করিনি কখনও। অনেকে মিলে করতাম। তা ছাড়া আমরা সবাই ছেলে....কিছু মনে করো না—একদল ছেলে মিলে পত্রিকা ছাপাটা রেওয়াজ, ও তো হয়ই, বরাবরই নিয়ম....কিন্তু তুমি বলছ, তুমি একাই....

—হ্যাঁ। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বৃষ্টি গঙ্গোপাধ্যায়। এবার আমি কিছুক্ষণ ওর চোখের দিকে তন্ময়-বিস্ময়ে চেয়ে থাকি। ও কিছুটা সঙ্কোচ বোধ করে। এবং সঙ্কোচ কাটাতেই বৃষ্টি পত্রিকাখানি আমার দিকে এগিয়ে দেয়। ভাবছিলাম, এ ঠিক ক ধাপ এগিয়ে?

বললাম—তুমি প্যান্ট-শার্টই বেশি পছন্দ করো?

—সবই পরি। প্যাণ্টশার্ট, শাড়ি, সালোয়ার-কামিজ, যা যখন মন বলে এবং পাই।

—পাও মানে?

—এই, এটা যেমন বাবার।

—তুমি বাবার শার্ট পরো?

—পরি বইকি। আপনি আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? আপনি পত্রিকাটা দেখুন. আমি আপনার একটা ইন্টারভিউ নেব? দেবেন তো?

—ও হ্যাঁ। নিশ্চয়। কিন্তু এ তো দেখছি বেশিরভাগই কবিতা। ছোট একটা প্রবন্ধ। হ্যাঁ, এ যে দেখছি অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপর আলোচনা। বেশ তো। কে লিখেছে যেন....

—ও আমার বন্ধু, অরণ্য। ও আমাকে পত্রিকার ব্যাপারে সাহায্যও করে। একটুখানি ভুল বলেছি আপনাকে, ও আমার সঙ্গে আছে।

—তাহলে তোমরা দুজন? দুজন মিলে, এটাই স্বাভাবিক।

—না না, ও আমাকে আর্থিক সাহায্য কিছু করতে পারে না। বিজ্ঞাপনের ব্যাপারে দু-একবার সঙ্গে গেছে, তাও তো হয় না!

—ও, আচ্ছা! বুঝেছি। আমাদের সময়, মেয়েরা পত্রিকা করত না, তবে কবিতা লিখত। এতে তোমার লেখা কোথায়?

—নেই। বলে এবার খিলখিল করে হেসে উঠল বৃষ্টি। ওর উপরের ঠোঁটের প্রান্তরেখায়, অধরের সঙ্গে ওষ্ঠের মিলন-কোণের উপরে ডানদিকে একটি বড় তিল। হাসলে বামদিকের পিঠোপিঠি দাঁতের ভাঙা হাসি অতিশয় মধুর হয়ে ওঠে। কানে ওর মুক্তোডিমের দানা, ফুল। হাতের কোথাও সোনার চেনের ঘড়ি থাকতে পারে, সাদা ফুল শার্টের হাত কিছুটা গোটানো, তবু কোনও স্বর্ণবলয় চোখে পড়ছে না, আরও ভিতরে

লুকিয়ে থাকতে পারে। মেয়েটা বড়লোকের মেয়ে। ওষ্ঠ-অধরের সঙ্কোচনযুক্ত হাসিতে তিলটা মুখের বিবরে নেমে যেতে গিয়ে থেমে যায়। একে প্রকৃতি এত দিয়েছে কেন?

—নেই কেন? তোমার কোনও কবিতাও তো থাকতে পারত!

—না। আমি জোগাড়ে, লিখিয়ে নই।

—সেকি! তুমি নিজে লেখো না, অথচ লিটলম্যাগ করো! এ তো পৃথিবীর সেরা বিস্ময়! কেন পত্রিকা করবে তুমি! টিফিনের খরচ বাঁচিয়ে পত্রিকা!

—না, আমি পত্রিকার ছাপা খরচ আরও অন্যভাবে জোগাড় করি। আমি রেডিও নাটক করি, তারপর বিভিন্ন কোম্পানিগুলোর অ্যাডের কাজ নিই। বিজ্ঞাপনে গলা দিই আর কী! আমার কণ্ঠস্বর বোধহয় ভালো। তা ছাড়া টিভিতে ফ্রিলান্স করি, ধরুন কোনও বিখ্যাত লোকের সাক্ষাৎকার ইত্যাদি। এতে হাতখরচ যেমন হয়, কিছু তা থেকে বাঁচিয়ে পত্রিকায় দিই। বাবা আমাকে জলখাবারের পয়সা যা দেয়, মোটামুটি খারাপ না।

—তোমার বাবা কী করেন?

—সরকারি উকিল। আলিপুরে। আমাদের গ্রামের বাড়ি মেদিনীপুর, ওখানে এখনও কিছু জমি-সম্পত্তি আছে। কাকা-জ্যাঠারা দেখাশুনা করেন। ওখান থেকে কিছু কিছু পাই আমরা। অবশ্য সামান্যই সেসব। আপনি ভাবছেন, খুব সম্পন্ন আমরা, তা ঠিক বলা যায় না। তবে গরিব নই। আমার এক মামা আছেন, সল্টলেকে বাসা। উনি, নাম বললে চিনবেন, লেখক-খ্যাতি আছে ওঁর। আসলে প্রবীণ সাংবাদিক।

—কে?

—অমলেন্দু মুখোপাধ্যায়।

—ও, হ্যাঁ। তুমি তাঁর ভাগ্নী?

—তবে পত্রিকার ব্যাপারে কখনও মামাকে বলিনি। উনি কবিতা দু চক্ষে সহ্য করতে পারেন না।

—তবু ভাবছি, তুমি একা পত্রিকাই বা করবে কেন?

—আপনারা পত্রিকা করতেন কেন? লিটল ম্যাগাজিন করাটা কি আদৌ কোনও আদর্শ? বলুন?

—হ্যাঁ। আমাদের কালে, মানে ধরো পনেরো-বিশ বছর আগে, ছোট পত্রিকা করার সঙ্গে সমাজ-আদর্শ, ভারী কথা নিশ্চয়, তার একটা যোগ কল্পনা করা হত। সময়টাকে বোঝানো যায়, 'বামপন্থী আন্দোলনের জোয়ার' এই রকম একটা মোটা চিহ্নে, তাই না?

—হ্যাঁ, জানি।

—যেমন ধরো, তোমরা দুজনে মিলে, তুমি আর অরণ্য পত্রিকা করছ।

—না, তা ঠিক নয়।

—আরে বাবা বুঝেছি, তুমি একাই করছ, অরণ্য তবু যা হোক, সঙ্গে রয়েছে। সেই রকম, আমরা দুজন। আমি আর একজন, নাম ধর মলয়, আসল নাম বলছি না। মলয় বলল, অমুক অমুক পত্রিকা হল, পাতি-বুর্জোয়া, ওদের বর্জন করতে হবে। আমরা দুজনে

মিলে করব এমন একটা পত্রিকা, যদি তার দুটো সংখ্যাও বার হয়, টনক নড়ে যাবে, সব আর্টিকল সেন্সর হচ্ছে, আমরা অনিলদার প্রেসে ছাপব,গোপনে। বুঝলে!

—হুঁ। কিন্তু তারপর? বললাম আমি। দ্যাখ, মলয়, পিছনে ফেউ লেগেই রয়েছে, তারপর যদি পত্রিকা হয় আগুন, তাহলে তো:...

—ভয় পাচ্ছ নাকি! বলে বাঁকা করে হাসল মলয়। যৌবনে জেদও খুব একগুঁয়ে হয়, মরিবাঁচি পরোয়া থাকে না। পত্রিকা করে জেল খাটতে না পারলে, জীবনটাই যে পানসে হয়ে যায়! ভাবো বৃষ্টি! তুমি বৃষ্টি আর বন্ধু মলয় ছিল আগুন। অত্যন্ত দরিদ্র ঘরের ছেলে। কোনওভাবে পি ইউ পাশ করে আর কলেজ গেল না। রাজনীতির পোকা ঢুকে গেল মাথায়। মনে পড়ে, পত্রিকা করার জন্য গায়ের সবচেয়ে ভালো জামাটা, তাও তার এক দিদির দেওয়া, দিদি সুন্দরী ছিল বলে গরিব হয়েও ভাল বর জুটেছিল ভাগ্যে, সম্পন্ন গেরস্থ ঘরের বউ, বিনতা মলয়কে যে টেরিলিনের ফাইন একটা শার্ট দিয়েছিল, সেটি মলয় বেচেছিল সাইকেলের লিক সারাই করা দোকানদার অশোকের কাছে। তার সঙ্গে দিদির কাছে চেয়ে নেওয়া টাকা যোগ করে পত্রিকা বার হয়ে গেল। প্রধান লেখক আমরা দুজন, মলয় আর আমি। আমি পত্রিকা প্রেস থেকে রিলিজের দিন পঁচিশ টাকা দিয়েছিলাম। শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে না, আমি ওই টাকা কীভাবে জোগাড় করেছিলাম। অবশ্যই সেটা চমৎকার ঘটনা। মায়ের মুরগির ডিম, খোরাকির থেকে তোলা-তোলা পয়সা, যাকে চালমুঠি বলে, যে বোকা-ভাঁড়ে জমত, সেটার ফুটো আমার বোনের চুলের কাঁটার সাহায্যে গলিয়ে কাঁচা টাকা বার করে নিই। মা রবিখন্দের থেকেও তোলা তুলে রাখতেন, সেটা বেচা হত গাঁওয়াল-ফিরি করা ব্যাপারির কাছে। অবশ্য তাতে মাকে ঠকতে হত। এই হল আমার লিটল ম্যাগ করার কিসসা।

—তো? বলে বৃষ্টির ঠোঁট দুটি কেমন সৌন্দর্যের পীড়নে ছুঁচলো হয়ে গেল। বললাম—পত্রিকা প্রেস থেকে নিয়ে রাত্রে আমরা দুজন শহরের পথে গিয়ে বাস না ধরে, ভয়ে পায়ে হাঁটা পথে নেমে এক নেতার বাড়ি পৌঁছলাম রাত একটা নাগাদ। বলাই বাহুল্য নকশাল নেতা। উনি পত্রিকার একটা পৃষ্ঠায় খানিকটা চোখ বুলিয়েই আঁতকে উঠে বললেন, 'সর্বনাশ একী করেছ তোমরা! এতে যে তোমরা আমার টেকনেম রচনার মধ্যে গুঁজড়ে দিয়েছ। ওই নামটা এখন পুলিশের খাতায় উঠে গেছে হে! ছিঃ ছিঃ! এখন কী হবে! আগে তো আমায় বলবে তোমরা! কী লিখলে আমি জানতেই পারলাম না। যাও চলে যাও। রাত্রে আমার এখানে থাকা কারও পক্ষেই সুবিধের নয়। যেখানে পারো, পত্রিকা লুকিয়ে ফেল। মলয় তো মোটেও পুলিশের সুনজরে নেই। যাও, আর দেরি কোরো না।

—তারপর!

—ঠিক, নেতার কথাই ফলে গেল। পত্রিকা লুকাবো কোথায়? আমারা সেই পত্রিকা এখানে ওখানে ছড়ালাম, বিক্রিও করি কিছু। সাতদিনও গেল না, পুলিশ মলয়কে অ্যারেস্ট করল ভোররাতে, ঘুম থেকে ডেকে তুলে। মলয় আড়াই বছর জেলে রইল। আমি পালিয়ে বেড়ালাম কিছুদিন। পুলিশ আমাকে ধরেনি। বোধহয় আমার লেখা ততটা

উগ্র ছিল না।

লক্ষ করি, আমার সঙ্গে কথা বলার ফাঁকে ফাঁকে একটি ছোট নোটবইতে বৃষ্টি আমারই বলা কথা কিছু লিখে যেতে লাগল। এইভাবে আমারই বাড়িতে বসে বৃষ্টির সঙ্গে আমার আলাপ হয়েছিল। ওর পত্রিকার ছাপা সুন্দর, প্রচ্ছদপটও খারাপ নয়, ও নিজেই এঁকেছে। খুব বড় শিল্পীর কাজ নিশ্চয়ই নয়, স্বল্প আঁচড়ে ফুটিয়ে তোলা বিমূর্ত কিছু একটা বৃষ্টি তার প্রচ্ছদে ফুটিয়েছে। রঙের নির্বাচনের তারিফ করাতে বৃষ্টি বলেছিল—রং ঠিক করে দিয়েছে অরণ্য। ও ভীষণ সেনসিটিভ, ও আঁকলেও পারত। ওর কোনও কিছুতেই মন নেই। খুব খেয়ালি। ওর প্রবন্ধটা আপনি নিশ্চয় মন দিয়ে পড়বেন।

—হ্যাঁ পড়ব।

—আচ্ছা, অন্য একটা ব্যাপারে আপনার কাছে জানতে চাইছি। কিছু যদি মনে না করেন। আমার আসল কাজ হয়ে গেছে। আপনার সাক্ষাৎকার, বিশেষ ওই পত্রিকা করার ঘটনাটা খুব ইন্টারেস্টিং।

—কিন্তু অন্য কথাটা কী?

—হ্যাঁ, বলি। বলছিলাম কী, আপনি যে পত্রিকায় চাকরি করেন এবং লেখেন, ওখানে খুব মূল্যবান প্রবন্ধ ছাপেন আপনারা। কত কিছু জানতে পারি আমরা।

—কেন, তুমি কি কোনও প্রবন্ধ লিখতে চাও? পাঠাতে পার। তবে আমাদের পত্রিকার যে স্ট্যান্ডার্ড, সেটা তোমাকে বুঝে নিতে হবে।

—অফ কোর্স। আমি জানি সেসব। আমি অন্যরকম একটা কথা শুধোচ্ছি।

—হ্যাঁ, বলো।

—আপনাদের পত্রিকায় কোনও পি এইচ ডি থিসিস ছাপেন না আপনারা?

—না।

—থিসিসের অংশবিশেষ বা ধরুন থিসিসের সেন্ট্রাল-আইডিয়া নিয়ে কেউ যদি একটা প্রবন্ধ লিখে দেয়?

—আমরা অ্যাকাডেমিক লেখাপত্তর বিশেষ পছন্দ করি না। তুমি কি পি এইচ ডি করছ?

—না, একজন করছে।

—অরণ্য?

—হ্যাঁ।

—অদ্বৈত মল্লবর্মণের উপর কাজ করছে অরণ্য?

—না, না। মধ্যযুগের বৈষ্ণব সাহিত্য ওর বিষয়। বৈষ্ণব-সাহিত্যে মুসলমান পদকর্তা।

—ওহ্।

আমি চুপ করে গেলাম। চুপ করে রয়েছি দেখে কেমন অকারণ আহত লজ্জায় বৃষ্টি বলল—আজ তাহলে আসি। আপনাকে আমি মাঝে মাঝে জ্বালাতন করব কিন্তু।

—তা করবে, সে আমি বুঝেছি। কিন্তু একটা প্রশ্ন করি, অরণ্যের একটি চাকরি দরকার, তাই না?

—হ্যাঁ, খুব দরকার। বলে বৃষ্টি সামনের সোফাটায় আবার বসে পড়ল। ওকে এই সময় কেমন অসহায় দেখাচ্ছিল। মুখমণ্ডলে ওর ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ফুটে উঠেছে। হঠাৎ সে বাম হাতের জামার উপর নিজেরই মুখটা চেপে ধরে কিছুক্ষণ চোখ বড় বড় করে মেঝের দিকে নিষ্পলক চেয়ে রইল।

তারপর হঠাৎ কেমন অন্যমনস্ক আর শ্লথসুরে বলে উঠল—আমি নিজের জন্য ভাবি না, অরণ্যর জন্য না ভেবে পারা যায় না, ও খুব গরিব। ক্যানিং-এর ছেলে। বহু কষ্টে লেখাপড়া শিখেছে।

—তোমার পত্রিকায় ওর লেখা, মানে ওর থিসিস পারো না ছাপতে?

—না, ও তো গবেষণা করছে, কাজটা হয়ে যাক, তারপর আমি ভাবব। আপনাদের কাগজ না ছাপলে আমাকেই বার করতে হবে। আমি সেসব ভেবে রেখেছি। আপাতত ওর কিছু লেখাপত্তর ছাপা হওয়া দরকার।

—কেন?

—অরণ্য বলছিল, ও লেখক হওয়ার লোভ করে না, লেখা ছাপা হলে, সেটা চাকরির ক্ষেত্রে এক্সট্রা কারিকুলাম হল, সেটা দরকার।

—ওহ্, আচ্ছা! তাহলে ওর চাকরি হয়ে গেলে তুমি পত্রিকা বন্ধ করে দেবে, তাই তো? শোনো বৃষ্টি, তুমি এখন ,আসতে পারো। আমার আর সময় হাতে নেই! বলে আমি নিজেই চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ি। তাতে বাধ্য হয়ে বৃষ্টি সোফা থেকে একটি অদৃশ্য চাবুকের ঘায়ে খাড়া হয়ে উঠে দাঁড়ায়। ওর ফর্সা মুখে আমি যেন এক পোচ কালি ঢেলে দিলাম। মেয়েটাকে আমার আর সহ্য হচ্ছিল না।

বৃষ্টি চলে গেলে, আমি কিছুতেই লেখায় মন বসাতে পারলাম না। বৃষ্টিকে আমি গলা ধাক্কা দিইনি ঠিকই, কিন্তু ঘৃণা যে করেছি কিছুটা, তা কিন্তু গোপন থাকেনি। মনে পড়ছিল, লিটল ম্যাগাজিন যে আদর্শের জন্য নয়, একথা বুঝে নিয়েই আজকাল বৃষ্টিরা পত্রিকা করে। আমরা তাহলে অতীতে যা করেছি, তা কি সবই পাগলামি? মলয় কি পুরোটাই একটা বোকা মানুষ?

আমাদের প্রথম যৌবনে বাংলাদেশ থেকে একটি পত্রিকা হাতে আসে। পত্রিকার নামটা আমার বিচারে, আজও বিস্ময়কর এবং আধুনিক। মস্ত একটি পঙ্‌ক্তি, কাব্য-পঙ্‌ক্তি ব্যবহার করেছেন সম্পাদক তাঁর পত্রিকার নামের জন্য। 'শুনেছি শ্যামল রঙ রমণীর অনেক সুনাম'। বিশ্বাস করতে হবে, এটিই একটি পত্রিকার নাম। ভেবে দেখো বৃষ্টি, সেদিন শ্যামল-বাংলার সুনামের জন্য একজন পত্রিকা ছাপত এবং বলা বাহুল্য রচনার খ্যাতিকেও দেশের জন্য উৎসর্গ করা হত, এই আকাঙ্ক্ষা থেকেই স্বাধীন বাংলাদেশের জন্ম। যাক গে, ওসব এখন আর চলে না। দরকারও বোধহয় নেই।

এরপর বইমেলায় বৃষ্টির সঙ্গে দেখা। সে হেঁকে হেঁকে পত্রিকা বিক্রি করছে। বৃষ্টি

অরণ্যের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল—ভাবছিলাম, অরণ্যকে একদিন আপনার কাছে নিয়ে যাব। এই সংখ্যায় আপনার সাক্ষাৎকারটা আমরা দিয়েছি, সেই অ্যাট্রাকশনে পত্রিকা কিছু ভালোই বিক্রি হল। আপনি এখানেই নেবেন, এই সংখ্যাটা? আমি কিন্তু যেতাম ঠিক।

—আচ্ছা, দাও! শোনো, অরণ্যকে নিয়ে যেও তাহলে আমার বাড়ি। তখন কথা হবে। আমার খানিকটা তাড়া আছে। চাকরির কতদূর?

—ওই ব্যাপারে আপনার কাছে যাব আমরা।

—আমার কাছে কেন? আমি কী করতে পারি?

—আপনি পারেন বইকী। অরণ্যর ফার্স্ট ক্লাস আছে, ও একটা দরখাস্তও করেছে আপনাদের ওখানে। আপনারা নতুন সাংবাদিক নেবেন বলে বিজ্ঞাপন দিয়েছেন। ওর কি হয় না?

—বলতে পারব না বৃষ্টি। দ্যাখো, আমি সামান্য লোক, এ বিনয় নয়, আমার ক্ষমতা নেই। ক্ষমা করতে হবে। চলি!

দেখতে দেখতে লিটল ম্যাগাজিনের ছাতার ওখানে আমাকে ঘিরে কিছুটা ভিড় জমে উঠেছিল এবং কেউ কেউ অটোগ্রাফ চাইতে শুরু করেছিল। এই কারণে বৃষ্টির চোখে ঈষৎ গর্বও ফুটে উঠছিল। কেননা, বৃষ্টি ভাবছিল, আমি ওর পত্রিকায় কন্ট্রিবিউট করে যেন লেখকই হয়ে গেছি ওদের। আমি কিছুটা জোর করে ভিড় ঠেলে পালিয়ে আসি সেদিন।

চাকরি শুনলেই আমার আতঙ্ক হয়। আমি কোনও পাওয়ার হোল্ড করি না, ফলে ক্ষমতাও এনজয় করি না কোনও। আমি জানি, সামান্য লেখক আমি। লেখা ছাড়া আর কোনও দিশা আমার জানা নেই। অথচ, অরণ্যর জন্য কীই না করছে বৃষ্টি, কতকটা নির্লজ্জও হয়ে উঠেছে।

একদিন আমার পত্রিকা অফিসে দেখি, রিসেপশনে একখানা ইংরেজি পেপারব্যাক মুখের কাছে ধরে বৃষ্টি বসে রয়েছে। আমাকে দেখে গেটের কাছে লাফিয়ে ছুটে এল। বলল—উপরে অরণ্য ইন্টারভিউ দিচ্ছে. আমি তাই বসে আছি। আচ্ছা, আপনি একটু বলবেন, যদি সম্ভব হয়, কর্তারা নিশ্চয়ই শুনবেন আপনার কথা!

—কী বলব?

—আপনি অরণ্যর লেখা পড়েছেন, ও লিখতে পারে! আচ্ছা, কোনও উমেদারি ছাড়া আজকাল কিছু হয়, বলুন! আপনিই তো আমাদের চেনা মানুষ, তাছাড়া ইউ আর এ নোটেবল রাইটার!

—শোনো বৃষ্টি, বিরক্ত কোরো না। আমি অরণ্যর কোনও লেখা পড়িনি। তুমি বোঝার চেষ্টা করো, অরণ্য ভালো ইন্টারভিউ দিলে ওর চান্স নিশ্চয়ই হবে, এক্ষেত্রে আমার কথায় কোনও কাজ হবে না। এখানে এটা নিয়ম নয়। তুমি বসো গিয়ে।

—আচ্ছা বেশ, কিন্তু খুব আশ্চর্য লাগল, আপনি অরণ্যর লেখা পড়েও দেখেননি। কেন?

—কারণ, ওটা এক্সট্রা কারিকুলাম।

—ও, তাই?

—তুমিই তো বলেছ!

—হ্যাঁ, বলেছি! বলে আমারই চোখের সামনে মেয়েটা কেমন ম্লান হয়ে চুপ করে গেল। তারপর ধীরে ধীরে রিসেপশনের ভিজিটরস চেয়ারে বসবার জন্য ঘাড় গুঁজে চলে গেল নিঃশব্দে।

আমাদের আমলে, সিনেমায় নায়কের চাকরির জন্য নায়িকা চেষ্টা করছে, এই রকম দৃশ্য কল্পনা করা গেলেও, বাস্তবের নায়িকা কী করত? তা ছাড়া চাকরির জন্য এই ঘটনাটা বেশ নতুন যে, একটি লিটল ম্যাগাজিন হল চাকরির প্রধান উমেদার। ভেবে দেখা দরকার, সাহিত্যের কাজ শুধু আনন্দ নয়, ধান্দার উপযোগ হিসেবে জীবনের সূচনাতেই তাকে ব্যবহার করা যায়। আমার হঠাৎ একদিন মনে হল, এতে অন্যায় কিছু নেই। মহাকবি মাইকেল মধুসূদন যশ আর অর্থ উপার্জনের লক্ষ্য সামনে রেখেই কবিতার চর্চার কথা ভেবেছিলেন। তবে তিনি ময়ূরাক্ষী, শীতলক্ষার তীরে বসে কাব্য রচনার কথা ভাবেননি, ভেবেছিলেন টেমসের তীরে বসে ইংরেজিতে মহাকাব্য রচনার কথা। 'আই শাই ফর দ্য অ্যালবিয়ান ডিসট্যান্ট সোর'। ওই রকম কী একটা স্বপ্ন যেন ছিল কবির মনে। কিন্তু বৃষ্টির মনে, অরণ্যের মনে কী স্বপ্ন জাগে? সাহিত্যকে ঘিরে ওদের কোনও প্যাশন নেই, আছে একটা মোক্ষম হিসেব। ওরা কোনও কিছু লিখে ফেলে আবেগ-বিহ্বল হয়ে পড়ে না, তারা ভেবে দেখে এই লেখা থেকে নগদ কী উপার্জন সম্ভব! বৃষ্টি পত্রিকা করছে, অরণ্যকে দাঁড় করানোর জন্য। সাহিত্যিক হওয়ার সদিচ্ছাও অরণ্যের নেই, রয়েছে একটি চাকরির জন্য কারিকুলাম জোগাড় করা। যতবার এই কথা ভাবতে বসি, ততই নিজেকে কেমন বোকা বোকা লাগে!

প্রেম এবং সাহিত্য এই দুটি বস্তুই কি বোকা মানুষের কাজ! লিটল ম্যাগাজিন নিয়ে মাতলামি করাটাও কি আর বেহিসেবি হতে পারে না! ক্ষুদ্র পত্রিকা আকারে ক্ষুদ্র হলেও তার অন্তর চিরকালই আবেগ-পারাবার। এই সবই জানতাম। বৃষ্টিরা কেরিয়ারকে বাদ দিয়ে কিছুই ভাবতে চায় না।

একদিন আমার বাড়িতে একাই এল বৃষ্টি। সন্ধ্যার কিছু পরে। ওকে হাসিমুখে আহ্লাদি ভঙ্গিমায় ঢুকতে দেখে পিত্ত জ্বলে গেল। যথেষ্ট গম্ভীর হয়ে গেলাম। বৃষ্টি আমার বিরক্তি টের পেয়েও দমল না, বেশ রসস্থ ভঙ্গিমা করে সামনের সোফায় বসে পড়ল। হঠাৎ বৃষ্টি বলে উঠল—অরণ্যই আমাকে পাঠাল আপনার কাছে। আমি আসতে চাইনি।

—ইন্টারভিউ কেমন হল, অরণ্যের? শুধালাম। মনে হল, জানতে চাওয়া উচিত। বৃষ্টি বলল—ইন্টারভিউ কোথায়? যথারীতি টেস্ট। ও পারবে না। অত ভালো ও লেখে না। আমরা অযথা আপনাকে বিরক্ত করেছি। অরণ্য বলেছে, আমি যেন ওর হয়ে আপনার কাছে ক্ষমা চাই। তবে একথা ঠিক, আমরা তো অন্য কিছু জানি না।

—অন্য কিছু কী?

—অরণ্যের জন্য পার্টির নেতাদের কাছে যাওয়া বা কোনও মন্ত্রীকে ধরা করা।

আমরা সেসব পারব না। আমার মনটা আজ একদম ভাল নেই।

—কেন, কী হয়েছে তোমার?

—আপনি বুঝবেন না।

—কেন বুঝব না! তবে সত্যিই বলছি, আমি নাচার, চাকরি আমার হাতে নেই। বলেই চেয়ে দেখি বৃষ্টির সুন্দর বড় বড় চোখ দুটি কেমন অশ্রুছোঁয়ায় ভারী হয়ে উঠেছে। বললাম—কী হয়েছে, আমাকে খুলে বলো! বৃষ্টি অনেক্ষণ চুপ করে রইল তবু। তারপর ঈষৎ ভেজা গলায় বলল—অরণ্য রাগ করে আজ কৌটোর টিফিন মুখে দিল না পর্যন্ত। একদম খায় না। ওকে প্রচুর জোর করে খাওয়াতে হয়।

—আমারই মতো।

—হ্যাঁ। আপনার মতো আলবত। আপনি এক জায়গায় একটা আত্মজৈবনিক লেখায় লিখেছেন, আপনি বেসিক্যালি খেতে জানেন না।

—ঠিক। আরে ও তো, কী বলব! ওটা মিথ্যা নয় বৃষ্টি। খুব গরিব ছিলাম তো!

—অরণ্যও জানে, ও গরিব। গরিব যখন নিজেকে গরিব বলে বুঝতে পারে, সেটা নিশ্চয় খুব কষ্টের, তাই না বলুন! ওকে বলি, তুমি গরিব তো কী হয়েছে!

—তারপর?

—আজ ওকে খাওয়ার জন্য পেড়াপিড়ি করেছি খুব। বলুন, এটা কি আমার পাগলামি! ও দিন দিন রোগা হয়ে যাচ্ছে। মেসে থাকে, খাওয়া-দাওয়ার কোনও ঠিক নেই। আমি চুরি করে খাবার নিয়ে আসি কৌটোয় করে, কী করে আনি সে আমি বুঝব! কিন্তু তাতেও ওর আপত্তি! বলুন, এভাবে পারা যায়!

—ঠিক। নিশ্চয় তুমি ওকে জোর করে খাওয়াবে। কই দেখি তোমার টিফিন-কৌটোটা। দেখাও আমাকে! বলতে গিয়ে দেখি, আমার গলাটা কেমন ভেজা, ভারী হয়ে উঠতে চাইছে।

আবার কিছুক্ষণ চুপ করে রইল বৃষ্টি। কৌটোটা দেখাতে সে নিশ্চয়ই সংকোচ বোধ করছে। বিস্ময়ের পীড়নে আমার ভেতরটা কাঁপছে।

তার নীল ব্যাগটার ভেতরে আলতা-দুধ-রঙা হাতখানা ঢুকিয়ে দিয়ে ক'সেকেন্ড চুপ করে রইল বৃষ্টি। চোখের জলকে সংবরণ করার জন্য বেচারি সামান্য করে ঠোঁট কামড়ে ধরে ঢোক গিলল একবার। তারপর চোখ বুজে রইল দণ্ড দুই।

চোখ দুটি বন্ধ রেখেই যেন একটি দৃশ্য তুলে ধরতে চাইছে আমার সামনে। বৃষ্টি বলে উঠল—রাস্তায় হেঁটে যেতে যেতে ওকে আমি খাওয়ানোর চেষ্টা করি। কেন জানেন? কথা বলতে বলতে চলতি ভিড়ের মধ্যে গলাধঃকরণ করাতে পারলে, ও দিব্যি খেয়ে ফেলে। কী বলব, ওকে ফিড করাতে হয়, লাইক এ চাইল্ড। আমি জানি, ও কিছু চুরি করে খাচ্ছে না। এত ভীরু, এত ভীরু! খাওয়ার সময়, টপ করে গিলে নেওয়া চায়। কেন? আমি দিচ্ছি, এ তো আমার! তবু কেন লজ্জা! খাওয়াটাও কি কোনও অপরাধ! বলুন। অফিসে, আদালতে, নানা জায়গায়, কত মানুষ কলিগদের সামনেই চোখ বড় বড়

করে খেয়ে নেয়। খায় না? খেতেই তো হবে, নইলে বাঁচবে কেন মানুষ। বলুন!

—হ্যাঁ, খাবে! এর বেশি কিছুই যেন বলার ছিল না আমার।

বৃষ্টি এবার চোখ খুলে আমাকে ভালো করে দেখে নিয়ে ব্যাগের ভিতরে আরও একটু হাত চালিয়ে দিয়ে বলল—মফঃস্বলের একটি হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলে ওর একটা চান্স হচ্ছিল, কমিটি হাজার পঞ্চাশেক ডোনেশান চাইলে, আমি বলেছিলাম, আমি তোমাকে দেব। হঠাৎ সেদিন খেপে গিয়ে বলল, তুমি আমাকে কিনতে চাও নাকি! ব্যস, সেদিন আর খাওয়াতেই পারলাম না ওকে। এই তো মানুষ! বলুন কী করব ওকে নিয়ে!

বলে কৌটোটা টেনে বার করল বৃষ্টি। সঙ্গে বেরিয়ে এল জড়োসড়ো সাদা মতো কী একটা!

—কী ওটা!

—আর বলেন কেন। দেখুন, এটা ওর গেঞ্জি! বলুন, নীল কি বেশি হয়েছে! ও নেবে না। কেন না নীল কেন দিলাম! রাত্রে সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, বাথরুমে ঢুকে ওর ময়লা গেঞ্জি চুপি চুপি...যাকগে, গেঞ্জিটা তো মানুষ শার্টের উপরে চড়ায় না।

—আজ কী হয়েছে, তোমাদের!

—খাবে না। কেন যে রেগে আছে, নিজেও জানে না। চাকরি কি মোয়া! হল না এটা, বেশ। আবার চেষ্টা করব আমরা! পিছু পিছু ওকে কত যে ফুসলাতে হয়, প্লিজ! খাও, ইত্যাদি. তো আজ কৌটো খুলে যেই মুখের কাছে ধরেছি ওর, অমনি একটা বাচ্চা হাত উঠে এল, 'খেতে দাও!' এর আগেও দু'দিন ওই রকম হয়েছে। ওই ভিখিরি-শিশুটাকে আমরা চিনি। শেয়ালদার ফ্লাইওভারের তলায় ঘুরে বেড়ায়।

—আচ্ছা!

—স্বাস্থ্য ভালো। চোখে-মুখে ডাকাতে ভাব। এত নাছোড় আর স্মার্ট, না দেখলে বুঝবেন না। অরণ্য যতবার মুখে তুলতে গেল, ততবারই ছোঁ মারার মতো করে এগিয়ে এল। মারাত্মক! আমি কতবার চেষ্টা করলাম, ছেলেটাকে তাড়িয়ে দেওয়ার। পারলাম না; খাবারটাকে ঘুরে মুখে দিতে গিয়ে পরাস্ত হয়ে গেল অরণ্য। ঘুরে ঘুরে লাফিয়ে লাফিয়ে হাত বাড়াতে থাকল ভিখিরিটা। আর ককাচ্ছে ক্রমাগত। হঠাৎ অরণ্য হেরে গিয়ে সব খাবার ছোকরার হাতে ফেলে দিয়ে বলল, আমি ওর টার্গেট বৃষ্টি, এর আগেও দু'দিন হয়েছে এ রকম।

—টার্গেট!

—ও, তাই বলল। ওর মনে হয়েছে, ওকে আড়াল থেকে ছেলেটা লক্ষ রাখে। ঠিক এখানে আগে দু'দিন হয়েছে কিনা। ওইভাবে খেয়ে প্যান্টে হাত মুছে চলে গেল ভিখিরিটা। সবই অবাক হয়ে চেয়ে চেয়ে দেখল অরণ্য। আমি আর সহ্য করতে না পেরে রেগে গিয়েই বললাম, আগে কেন খেলে না তুমি! কেন খেলে না! আমি কত খারাপ দেখুন! বলে এবার খানিকটা শব্দ করেই কেঁদে ফেলল বৃষ্টি।

আমি কীসের একটা তীব্র আঘাতে চেয়ারে নড়েচড়ে বসলাম। কীসের ঘা

পড়েছিল বুকে নিজেও আর বুঝতে পারছিলাম না। তবু আমি বৃষ্টির অসহায় মুখের দিকে চেয়ে বললাম—তুমি কিছুই দোষ করোনি বৃষ্টি! প্রেমিক তো কোথাও কোথাও সন্তানের মতো। অরণ্য খেতে পেল না বলে উগ্র একটা স্নেহ তোমাকে কষ্ট দিয়েছে। আর কিছু নয়। স্বাভাবিক।

—না। না। অরণ্য আপনার একটা অনুভূতিকে চুরি করেছে, মাঝে মাঝেই বলে, ও বেসিক্যালি খেতে জানে না। আমি জানি, একথা সত্য। কিন্তু আপনাকে কোট করে হামেশা। এটা কি অহংকার? আমি আজ হঠাৎ বলে ফেললাম, তুমি সত্যিই খেতে জানো না, বেসিক্যালি। নাও, চলো!

—তারপর, কী হল! অরণ্য কী করল তখন? আমার প্রশ্ন যেন কেমন চাপা একটা আর্তনাদ হয়ে উঠল বৃষ্টির কানে। বৃষ্টি কেমন চমকে উঠল। কেমন বিহ্বল হয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর মাথা নিচু করে বসে রইল। বৃষ্টি সত্যিই কাঁদছে। আমিও আর কথা বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে চোখ মুছে নিল জামার হাতায়, তারপর আমরা দিকে চোখ তুলল বৃষ্টি। বলল—অরণ্যর মুখটা কেমন নিবে গেল সাডেনলি। তারপর অরণ্য কেমন হা হা করে হেসে উঠল লোকস্রোত উপেক্ষা করে। ও ওই রকম। এবং ও কেমন ইন্ডিফারেন্ট হয়ে গেল যেন। বলল উদাস ভঙ্গিতে—সুকান্ত কিছুতেই খেতে পারত না বৃষ্টি। কবি সুকান্তর রাজরোগ হয়েছিল। ডাক্তার ওর পথ্যের জন্য ডিম খেতে বলেছিলেন। বাঁচতে না পারে, পরমায়ু তো ক'দিন বাড়বে! কিন্তু কোনও বন্ধু ওকে দেখতে এসে দেখল, ডিমটা সুকান্ত তার সামনে বসে খেতে পারছে না। দেয়ালের দিকে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চুপিচুপি খাওয়াটা ছিল সীমাহীন লজ্জার ব্যাপার। আমি কেন সুকান্তর খাওয়া নিয়ে ভাবব, এই যুগে! তুমি আমাকে খাওয়াতে চাইলেই, আমার সুকান্তর কথা মনে পড়ে।... আর তা ছাড়া!

—বলো! বলে ঈষৎ বিস্ফারিত চোখে বৃষ্টির মুখের দিকে চেয়ে রইলাম আমি। যুগ কত বদলেছে, তবু সত্যিকার কোনও কবিমন একেবারেই বদলায়নি। মানুষের লজ্জা এবং প্রেম মানুষকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছে না। এ যুগে কোনও কবিমনের মানুষকে এখনও ভিখিরি শিশু হলেও সহজেই চিনতে পারে।

বৃষ্টি বলল—অরণ্য বলেছে, মন্ত্রীর কাছে তেল মারার চেয়ে, দলে নাম লেখানোর চেয়ে সরস্বতীর কোলে মুখ গুঁজড়ে থাকা ভালো। দেবী চাইলে এক্সট্রা কারিকুলাম জোগাড় হয়। সরস্বতীর কাছে ধান্দা করব, তাতে দোষ কোথায়? আমি তোমাকে পত্রিকাটা বন্ধ করে দিতেই বলছি বৃষ্টি!

—সেকি! বলে আমি অত্যন্ত বিচলিত হয়ে পড়ি। তারপর বলি—লেখাটা আমার এখন ধান্দা মাত্র। তোমরা আমাকে ক্ষমা করে দিও। আমি বুঝতে পারিনি। নিশ্চয় আমি অরণ্যর প্রবন্ধটা পড়ে দেখব। আমি চিঠি লিখে মতামত জানাব। তুমি অরণ্যকে বাঁচিয়ে রাখবে, ওকে জোর করে খাওয়াবে।

—এ-যুগে প্রেম কতটা নির্লজ্জ হবে, আপনিই বলি দিন! বলে বৃষ্টি আপন মনে ওর ব্যাগটা গুছিয়ে নিতে শুরু করল।

বললাম—তোমার টিফিন-কৌটোটাও ভারি সুন্দর! শুনে কাঁধে ব্যাগের ফিতেটা চড়িয়ে নিতে গিয়ে থেমে গেল বৃষ্টি।

বৃষ্টি বলল—এতেও আমার অ্যাডিশন আছে।

—কী?

—এটাও বাবার টিফিন-কৌটো। দেখুন দু'খানা টোল পড়েছে কেমন?

—কেন?

—এটাকে আছাড় মেরেছিল বাবা, একদিন আমার ওপর রেগে। একটুখানি তুবড়ে গেছে বলে, এ এখন আমারই। বাবার জামা ফেড হলে আমার, টিফিন-কৌটো তোবড়ালেও আমার। বাবাকে রাগিয়ে দেওয়া মানেই তো আমার লাভ।

—আশ্চর্য।

—হ্যাঁ।

—একটা কথা!

—হ্যাঁ বলুন।

—তুমি তোমার পত্রিকাটা চালিয়ে যাবে তো বৃষ্টি?

—অরণ্য যদি আমায় ছেড়ে না চলে যায়, পত্রিকাও আমর সঙ্গে থাকবে।

আমি বললাম—একটি লিটল ম্যাগাজিনের চেয়ে একটি প্রেম জীবনে বেশি দিন বাঁচে।

—উল্টোও হতে পারে। প্রেম রইল না, কিন্তু লিটল ম্যাগাজিনটা রইল। ভাবছি, এবার হাতের বালাটা বেচে দিতে হবে।

এই প্রথম জামার আড়াল থেকে বৃষ্টির স্বর্ণবলয় দেখা গেল।

ডানমেলা বৃশ্চিক

আমি আর আমার বোন ছাড়া ওই ধরনের বিছে-মাকড় কেউ দেখেনি। খুব নতুন আকৃতির জীব। কালো তেঁতুলবীচির মতন গায়ের রঙ, আমস্বত্ব রঙের বড় কেন্নোর মতন এক হাজার পা, দাঁড়া কাঁকড়ার পিঠের মতন শুকনো-শক্ত, ঝরেঝরে, পৌনে এক হাত লম্বা। দেহের দু'পাশে প্রায় এক বিঘত করে ডানা। এক বিঘত টানা এবং পেখমের মতন ছড়ানো অর্ধচন্দ্রাকৃতি, বিস্তারের সর্বোচ্চ সীমানা এক বিঘত। ডানা বলে ডানা!

পৃথিবীর কোনও প্রজাপতিও এত বহুবর্ণ আর সুন্দর পাখনা পায় না, এতই আশ্চর্য। দুনিয়ার সব সুষমা, তামাম সৌন্দর্য ডানায় ধরেছে জীবটা এতই বর্ণময়। জায়গাটা আলো হয়ে আছ। একটি কেটে ফেলা তালগাছের প্রকাণ্ড গুঁড়ি, এখনও মাটিতে পোঁতা, চারধারে প্রচুর ঘাস ছড়িয়ে এসে ঢেকেছে সেটিকে, তার ওপর স্থির হয়ে রয়েছে ভয়ংকর সুন্দর প্রাণীটা।

প্রথমে মনে হল একতাল সোনা ওখানে ঝলমল করছে। পরক্ষণেই মনে হল, হিরের মতন কিছু। তারপর মনে হল, জহরত। বিচিত্র মহার্ঘ খনিজ এবং ধাতু নানান আলোক-রশ্মির মতন চমকাতে লাগল। আসলে তখন একটু একটু করে স্পন্দিত হচ্ছে ডানাদু'টি। হয় ক্রোধে, নতুবা আহ্লাদে।

ওটা একটু একটু করে ধীরে ধীরে গুঁড়ি ছেড়ে নেমে পড়ছে ধানখেতের আলের দিকে। আমি আর আমার বোন থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছি। পা বাড়াতে সাহস হচ্ছে না।

পাখি ওড়বার আগে ডানাদু'টি যেভাবে আধখানা মেলে ক্রমশ সটান করে এবং পুরোটা খুলে দেয়, এই জীবটি তা করল না, উড়ল না—শুধু একটুখানি মেলে, নেমে গেল।

গুঁড়িটা যেন পুড়ে গেছে মনে হচ্ছে। গুঁড়ির উপর অনেক সময় বাগালরা আগুন জ্বেলে গাছছোলা পুড়িয়ে খায়, সেই দহনের দাগ কি না বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মনে হচ্ছে, ওখানে এই মুহূর্তেই আগুন লেগে গিয়েছিল, ওই জীবটার গা জ্বলন্ত বহ্নি। কালো অঙ্গার।

জীবটা সরীসৃপ, নাকি পতঙ্গ? জীবটা কি পাখি? আলের উপর দিয়ে চলেছে, ঘাস যেন ঝলসে যাচ্ছে। দুধথোড় ধানের গাছ, শীষানো ধানের গাছ ঝলসে যাচ্ছে আলের কাছাকাছি, মিইয়ে যাচ্ছে কেমন।

আমি আমার বোনকে গছাতে নিয়ে চলেছি শ্বশুর-ঘর। রাস্তায় এই ধরনের ডানাঅলা বিছে দেখব ভাবতে পারি না।

আমাদের রীতি-রেওয়াজ আলাদা, বোনকে না নিতে চাইলে গছাতে হয়, অভিমান করলে চলে না। সোয়ামি ভাত দেয় না যাকে, তাকে বরের কাছে নিয়ে যেতে হয়, আমাদের জীবনে এই ধারা ঘটনা অনেক ঘটে। আগে আরও দু'বার আসমানতারা বেগমকে ওর শ্বশুরের কাছে নিয়ে গেছি। শ্বশুর ধানাইপানাই করেছে, নিতে চায়নি, জোর করে রেখে এসেছিলাম। প্রথম বার সাতদিন, দ্বিতীয় দফায় চল্লিশ দিন বোনটি হারেমপুরে ছিল, পরে পালিয়ে আসে একা।

আমাদের গাঁয়ের নাম সাগরদিঘি নুনচা। আমরা গরিব। আমি প্রাইমারির মাস্টার, অনেকটা মৌলবি প্যাটার্নের চরিত্র, মুখে কোঁকড়া কালো দাড়ি, গোঁফ কামাই, তবে মাঝে মাঝে সম্পূর্ণ কেটে ফেলি, উত্তমকুমারের মতন। দাড়ি বিষয়ে খামখেয়ালি হলে সমাজে বদনাম হয়, লোকে বিশ্বাস করে না। আমার ফরাজি প্যাটার্নের কাঁধ পর্যন্ত চুল, চাঁদি কিঞ্চিৎ ফাঁকা, টাক মতন হয়েছে। আমার নাম বিছাদি মীর। ভালো নাম মীর নাসিরুদ্দিন।

আমি কবিতা লিখি। মুসলমানি পুথি পাঠ করি সুর ধরে। আতর মাখি। কাঁধে জড়ানো থাকে কাবা শরিফের ছাপ আঁকা বড় রুমাল। এই রুমাল সব সময় থাকে, তা নয়, মাঝে মাঝে থাকে, সভ্যভব্য জায়গায় যেতে হলে থাকে, মজলিস-আচ্চায় থাকে। আতর মাখি, মাঝেমিশেলে সেই সেই সময়। সব সময় মাখি না। আতরের দর আছে।

পুঁথি পাঠ করি গেরস্তের আঙনেয়, তা-ও করি অবরে-সবরে, রাতে। স্বরচিত গজল গেয়ে শোনাই ধর্মের জলসায়।

যথা ঃ মন যে আমার ময়না-পাখি,
খাঁচাতে রহে না—
মাঝে মাঝে যায় যে উড়ে,
সোনার মদিনা।।

এটি আমার স্ব-রচিত জনপ্রিয় গজল। জলসায় গেয়ে শোনাতেই হয়। কিন্তু একটা পাপের কথা লিখি। পুঁথি পড়া আমি বর্তমানে ছেড়ে দিয়েছি। রাত জেগে সুর ধরে পড়তে পড়তে একদা একটি গৃহবধূর সঙ্গে আমার অবৈধ ভাব হয়, সম্পর্কে তিনি ভাবী, সম্পন্ন ঘরের বেগম।

আরও কিছুদিন সংযোগ রাখলে সর্বনাশ হয়ে যেত। ওঁর হয়তো হত না, আমার হত। উনি আমার সুরের মাদকতায় কালনাগিনীর মতন দুলতেন। চোখমুখ জ্বলজ্বল করত, তাঁর ঠোঁটদু'টি কাম-স্ফীত হয়ে পড়ত।

আমার এই বোনটাই আমাকে কীর্তিনাশ করতে দেয়নি। আমার কেবলই মনে হয়েছিল, আমি যদি হীনা ভাবীর সঙ্গে...ওঁকে যদি ভোগ করি...তাঁর রুহ তৃপ্ত হবে, কিন্তু অন্যের বউকে ভোগ করলে, আমার বোনকেও বারো ভূতে ভোগ করবে। এক বৎসর হল, আসমানতারাকে ওর বর নিয়ে যাচ্ছে না, বাপের বাড়ি ফেলে রেখেছে।

বাপ তো নেই, আছি আমি। আমার এম. এল. এ কোটায় চাকরি। আগে জামাত করতাম, থানা সেক্রেটারি ছিলাম। বিধায়ক আমাকে ওই পদ ছেড়ে দিতে বলেন, কেননা

ওই সংগঠন করে ভবিষ্যৎ বানানো যায় না, বরং চাকরি কর, এই বলে তিনি আমাকে মার্কসবাদী করেছেন। চাকরি দিয়েছেন। এটা ঠিক, চাকরি পেলে অনেকেই আমার মতো হবে।

একটি সম্পূর্ণ আল খরখর করে জ্বেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে বিছেটা। ওর ডানা ফুলে ফুলে উঠছে। ক্রোধে কিংবা আহ্লাদে।

দ্বীনা ভাবীকে এক নিঃঝুম দুপুরে তাঁদের নির্জন বৈঠকে ডেকে বলেছিলাম—তুমি এক হাতে মক্কা ধরো। অন্য হাতে মদিনা। মনে মনে। যদি বলে দিতে পারি, তোমার সঙ্গে আমার ভাব হবে। ধরো, মুঠো করে ধরো!

ওঁর কী খিলখিল হাসি, ওঁর কী বুক চেতানো ভঙ্গিমা!

তিনি অসহ্য অবাক হয়েছিলেন। এবং নিশ্চিন্ত মুদ্রায় বলে উঠেছিলেন—তুমি জাদু জানো।

তারপর বিস্ময়মুগ্ধ অধৈর্য স্বর ফুটিয়ে শুধালেন—তুমি গুণ করতে পারো?

আমি উত্তর দিইনি।

আমার এক বন্ধু আছে, কলেজে বাংলা অনার্স পড়ে, নাম মসিউল, ও কবি। ওর কবিতা নানান দামি নামী পত্রিকায় ছাপা হয়, ওর সঙ্গে আমার গভীর সদ্ভাব। একবার ওর বেলা আমি মক্কা মদিনা করেছিলাম। ও সর্বোচ্চ সম্মানের বাংলা সাপ্তাহিকে কবিতা পাঠিয়েছিল একবার, তারপর শুধালো ছাপা কি হবে?...

বললাম—এসো মক্কা মদিনা করি, বোঝা যাবে।

ও হেসে উঠে বলল—কীভাবে?

বললাম—কবিতাটা কোথায় রাখবে? মক্কায় না মদিনায়? যেখানে খুশি রাখতে পারো। তারপর মুঠোর মধ্যে ধরবে। ও মদিনায় রেখেছিল কবিতাটা এবং বাঁ হাতের মুঠোয়। বললাম, মদিনায় রয়েছে কবিতা। তোমার মদিনা-যোগ চলছে। ছাপা হবে। তাই-ই হয়েছিল। ও-ও সেই থেকে বিশ্বাস করে, আমি জাদু জানি।

জাদু না জানলে কি আমার চাকরি হয় এই ভয়ংকর বেকারত্বের দিনে? হয় কীভাবে?

অধিক রূপ, অধিক দারিদ্র্য, অত্যধিক ধর্মাচার আমার সম্বল। আমি এবং আমার বোন অত্যন্ত সুন্দর দেখতে। আধুনিক প্রবাদে বলা হচ্ছে, গরিবের গুষ্টি বড় হয়। তাদের সংখ্যা অগণ্য, ভোট অগুনতি, হেথায় এক চাকরিতে এক হাজার ভোট জোগাড় করা যায়। এক-চাকরি এক হাজার, প্রকাশ থাকে যে, গত ইলেকশনে আমরা মুসলিম লীগকে ভোট দিয়ে সারাগুষ্টি ভোট নষ্ট করেছিলাম, এই জিলায় লীগপ্রার্থীর জামানত জব্দ হয়েছিল। তারপর আমরা জামাত করি।

—ভাইয়া! সব জ্বলে গেল! বলে সহসা তীব্র আর্তনাদ করে উঠল আসমানতারা। ও আমার পিঠের কলিদার পাঞ্জাবি খামচে ধরল। ও চেয়ে দেখল পুড়ে যাওয়া গুঁড়ি, ও দেখল ম্রিয়মাণ শস্যভূমি আর ওর ভাগ্যকে। ওর এক হাতের মুঠোয় মক্কা, অন্য হাতে

মদিনা। ও বলতে পারেনি—ভাইয়া বলে দাও, কোথায় কী? আর কতবার আমাকে এভাবে যেতে হবে মাঠপথ ভেঙে চুরি করে বরের কাছে? আমার চোখের সুর্মা, কপালের টিপ, পায়ের আলতা, আমার পায়রাখোপী বডিজ, আসমানতারা শাড়ি, ময়ূরপঙ্খী হারেমপুর ...কোথায় কতদূর?

গছানো শব্দটা খারাপ। শুনতে কটু লাগে। বড়ই অপমানের শব্দ। অথচ ও-ছাড়া আর কোন্ শব্দে আসমানতারার ভাগ্যের কথা লিখি। ওর পতিগৃহে যাত্রা যেন শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রা।

একটি ছাগশিশু ওর পায়ের কাছে ছুটে এসেছিল লেজ নেড়ে নেড়ে। বাচ্চা তড়বড় করে নাচে, নেচে উল্টে পড়ে গিয়ে ভ্যাঁ করে কাঁদে, বাঁটের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে ভুল লক্ষ্যে গুঁতো দেয়, ওকে বাঁট ধরিয়ে দেয় আসমানতারা—ভোর রাতে যখন আমরা উঠোনে নামলাম, আঁধার তাড়ানো হাওয়া বইছে, আকাশে পোয়াতি তারা জ্বলজ্বল করছে, মায়ের পিঠের কাছ থেকে উঠে এল তড়বড়ি আর আসমানতারার পায়ের পাড় দাঁত দিয়ে ধরে টানল—আসো। ওটা মেয়ে। ছাগী, শিশুকন্যা। ওটার নাম বোনের এখনও রাখা হয়নি। কেন উঠে এল, কেন কাপড় ধরে টানল! ও কি বুঝতে পারে, আসমানতারা পতিগৃহে যাচ্ছে!

আরও এগিয়ে যাচ্ছে জীবটা—পতঙ্গ বা সরীসৃপ। বাদুড়ের মতো ডানা জ্যালজেলে, কিন্তু রামধনুরচেয়ে বর্ণাঢ্য, সহস্র রঙে ভরা, মৃদু আন্দোলনেই ঝিলমিল করছে আগুন।

—এই জমি আমর শ্বশুরের, বাইশ বিঘের দাগ। সব ভুসো-পাতান হয়ে যাবে। আর কিসের তাগিদে যাব, আল্লাহক! বোনের গলায় ঘনিয়ে উঠল হাহাকার।

ওর আর হারেমপুর যেতে ইচ্ছে করছে না, সব উৎসাহ নিবে গেছে তার। সূর্য ওঠার আগে আমরা বার হয়েছি, সূর্যাস্তের কালে আমরা পৌঁছাব। দিনমান কাটবে পথে। সূর্য ঢলে পড়েছে পশ্চিমে। কত পথ পিছনে ফেলে বাইশ বিঘার দাগে, হারেমপুর মৌজায়, আসর বিশ্বাসের খতিয়ানে পৌঁছেছি আমরা দু'টি ভাইবোন।

আলের পশ্চিম কোণে জোড়া পাকুড়ের গাছ, বড় শান্ত ছায়া। ওখানে কী একটা জিনিস বাঘছালের মতো ঝলমল করছে। বাঘছালপরা কালী। টকটকে লাল জিভ বাইরে ঝুলছে। হাতে উদ্যত ভয়ংকর খাঁড়া, গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মূর্তিটা, একখানি পা ভেঙে জড়ো করে গাছে লাগিয়ে একপায়ে খাড়া হয়ে রয়েছে, পায়ে মল বাঁধা।

কালীর সঙ বার হয়েছে। এ-দিগরে এমনটি বিশেষ দেখা যায় না। বাটি খলসেপুরের ওদিক থেকে নদী পার হয়ে বহুরূপী আসে।

ওর পায়ের কাছাকাছি চলে যায় জীবটা। আল ধরে ঘুরে যায়। —পালাও! বলে বোন আর আমি সমস্বরে চিৎকার ক'রে উঠি। একখানি পা গাছের কাণ্ডে ভেঙে হেলান দিয়ে রেখেছিল কালী দ করে, ভয়ে সেটা নামায়, ঝম করে শব্দ হয়।

অবাক হই, সঙ বিশেষ বিচলিত হল না।

—কে তুমি? কাছে এসো প্রশ্ন করি।

ও বলল—বাড়ি মুঙ্গের।

গলাটা রিনরিন করে বাজল। মানুষটা মেয়ে।

—মুঙ্গের থেকে এখানে সঙ করতে এসেছ কেন?

—আসিনি। আমাকে আনা হয়েছে। আমি বোমা বাঁদি, বন্দুক বানাই, মাস্কেট তোয়ের করি। আমি এই জিলায় নারীশিক্ষা দিই, অস্ত্র তৈয়ারি করি। সঙ সাজি। আমাকে এম. এল. এ এনেছে। আমার মরদ আছে, আমি আছি।

—পোকাটা দেখলে?

—পোকা? কিসের পোকা? সবই তো পোকা, মানুষ কই? সব পিলপিল করছে। ছি পি এমের পোকা, কংগ্রেসি পোকা, ফেরালি পার্টির পোকা, ধর্ষণ করে পোকাতে, ওয়াক থুঃ!

—ফেরালি পার্টি?

—যে পার্টি পোকা পয়দা করে ফেরার করে দেয়। বলো, হাম্বা!

কেমন ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমরা। ওই রকম সরীসৃপের ভয়, কালীর ভয়। ভয়ে ভাইবোন ডেকে উঠি—হাম্বা!

সঙ বলল—যাও। ডাকতে ডাকতে চলে যাও। সামনেই চেকপোস্ট। গরু পিছু পাঁচ টাকা। পালের সঙ্গে ঢুকে যাবা।

গরুর পালের সঙ্গে কোথায় ঢুকে যাব আমরা? চেকপোস্ট কেন? থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি দু'টি প্রাণী, ভাই আর বোন।

সঙ বলল—যাও, দাঁড়িয়ে রইলা কেনে? বলবা, আতাবাবু শুধালে বলবা, হিরন থেকা আসছি।

গাছে ঠেকনো দেওয়া পা-খানি নামালো সঙ। ঝম করে শব্দ হল। মলের শব্দ। এ রকম কালী কখনও বা কাকতাড়ুয়া হয় শস্যভূমিতে, এমনটি দেখেছি। সঙের পায়ের দিকে এবার তীক্ষ্ণ নজর করে দেখি, ও মেয়ে নয়, পুরুষ।

জোড়া পাকুড়ের হেলান দেওয়া মূর্তিটা, যা হঠাৎ দেখলে গা ছম ছম ক'রে ওঠে, পরনে বাঘডোরা দেওয়া কানি জড়ানো, বাকি অঙ্গে কালো ছাতার কাপড়, লাল লোল-জিহ্বা, হাতে খাঁড়া, পিছনের দু'খানি অতিরিক্ত চামুণ্ডা-হস্ত হিলহিল করে দুলছে মনে হচ্ছে স্প্রিং করছে লতপত করে—ঝমঝম করছে পায়ের মল।

আল ধরে এগিয়ে যেতে লাগল সদর্পে পা ঝামড়ে লোকটা—ওই সঙ লোকটা, মুঙ্গেরের লোকটা।

সঙ একটি কাহিনী বলে চলে গেল। এই জিলার সীমান্ত গ্রামগুলিতে, গঙ্গাপ্রসাদের ওদিকে স্বামীস্ত্রী ওরা আসে এখানকার মানুষকে বোমা বাঁধা, মাস্কেট তোয়ের করার বিদ্যা শেখাতে। প্রথমে নবী মুক্তার অথবা ওদেরই মতন কোনও মস্তান-ডাকাত ওদের আহ্বান করে আনে। জঙ্গলের মধ্যে বিশাল গর্তে ওরা কারাখানা গড়ে। ওখান থেকে

উৎপন্ন অস্ত্রে গ্রাম ছেয়ে যায়। মস্তানবাহিনী খাড়া হলে রাজনৈতিক দলগুলি সশস্ত্র বাহিনীকে আশ্রয় দেয়। এই জিলায় ঘরের বউরা বোমা বাঁধতে পারে। বিড়ি বাঁধা এক ধরনের কাজ। বোমা বাঁধাও এক ধরনের কাজ।

এরা বিসমিল্লাহ ব'লে বিড়ি এবং বোমা বাঁধতে পারে। আমার বোন আসমানতারা এসব পারে না। সঙ বেচারি গলা মেয়েলি করে আমাদের সঙ্গে কথা বলছিল। সারা মাঠটা এখন ঝমঝম করে বাজছে। আসমানতারার মন নরম। ও স্বপ্ন দেখতে ভালোবাসে।

—দ্বীনাভাবীর জামা-কাপড় পিঁদেছি ভাইয়া! স্নো মাখেছি। উনি দিলেন। কইলেন, পিঁদে যা, দামাদ আমাদের, সুহাগ দিবে। ধান উঠছে গোলায়, ম ম করছে বাইশ বিঘা। আলম ব্যাপারি খবর আনেছে। ওই কালী আমার জেবনডা বরবাদ করবে ভাইয়া, ওই পোকায় খাবে মোকে! আমার কি হিল্লে হবে না রছুল, পয়গম্বর! দীনের নবী। আসমানের দারোগা!

—চুপ যা আসমানতারা, চুপ যা!

ভয়ে ভয়ে দুই ভাইবোনে কথা বলি আমরা। হঠাৎ সঙ উলঝে ওঠে, একহাতে খাঁড়া, অন্য হাতে পাখি তাড়ানো বাঁকা খটখটি। এখন বুঝতে পারছি সঙ আসলে হুটরা-লুটেরা ধানখেকো বর্গীপাখি তাড়াচ্ছে। খট্ খটাশ।

পিছনের দু'হাত বাইচ মারছে। খটাশ শব্দে সরীসৃপ রোষে পাখনা ফোলায়। তারপর এক হাত উপরে ওঠে মাটি ছেড়ে। দু'হাত উপরে ওঠে। বাইশ বিঘার আল বেড়ে উড়তে থাকে ডানাঅলা বিছা। তারপর তিন হাত উপরে ওঠে।

বিহারের জঙ্গল থেকে একটি গ্রাম-পথরেখা পশ্চিমবঙ্গের এই জিলা হয়ে ওপারে ঢুকেছে, ওই পথে চোরামাল এবং গরুস্রোত চলেছে, এর সঙ্গে পুলিশ, বি. এস. এফ জড়িত। এই পথে অস্ত্রবিদ্ বিহারী, বোমা-বাঁধুনি স্ত্রীলোক আসে। ধানথোড়ের গায়ে, শীর্ষে শীর্ষে ন্যাদা পোকার মতন গ্রামের অণ্ডে পোকা জন্মায়, রাজনীতি। কিন্তু ডানাঅলা বিছা কীভাবে পয়দা করেন খোদা-হালশাহনা (কর-সংগ্রাহক) বুঝা যায় না।

ল্যালল্যাল করছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে বিছা, ওর ডানা দুমড়ে যাচ্ছে, ছিঁড়ে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে। কিলবিল করছে সরীসৃপ।

বোনকে বলি, —ঘাবড়াস না। ধান উঠলে মানুষের মনে রস বসে। ভালোবাসার দধি তৈয়ারি হয়। মন হয় ননী-ননী। গ্রাম হল বেহেশতের কুঞ্জ।

আসমানতারা এবার হি হি করে হেসে ফেলে ভয়ে চুপ করে গেল। তখন আকাশে উঠতে লাগল ডানাঅলা সরীসৃপ। তার পশ্চাদ্দেশ কুঁকড়ে মুখের দিকে আসে এবং হাঁসুলির মতন জোড়া হয় এবং চিড়িক করে দুই মুখ ছুটে যায়, তারপর গান করে শিস দিয়ে সরীসৃপ। মধুর ধ্বনি দিয়ে আকাশে উঠে যাচ্ছে পোকা। সহস্র রঙ খেলা করছে আকাশে।

আমরা মাঠ ছেড়ে পথ ধরি, এদিকেই কি চেকপোস্ট? পিছনে পিছনে কে যেন পায়ের শব্দ তুলে এগিয়ে আসছে।

—আমি এখন ফরোয়ার্ডে খেলছি ভাবী! কলেজে ছিপি (সি. পি.) দিতাম, এখন দিই না। তবে বুশ যাবে কি সাদ্দাম যাবে, তাংবাং নাই, হরিহরপাড়া এখন চম্বল। ওখানে জিজিয়া কর বসেছে। যব-কং বলে একটা দল হয়েছে হারেমপুরে।

আঁতকে উঠে পিছনে চেয়ে দেখি, সঙকালী। আসমানতারা বিহ্বল হয়ে পড়েছে। ও বুঝতে পেরেছে, এ তার দেবর জিয়া। জিয়াউল। ডাকনাম পিনু।

—এতক্ষণ তুমিই নকশা করছিলে পিনু?

—জি। আমাদের কাছে চারখানা মাস্কেট চেয়েছে আতা এম. এল. এর পার্টি। জিজিয়া কর। আমরাও দিব। গোয়াল থেকে সাতটা গরু দড়ি খুলে চোখের সামনে দিয়ে নিয়ে চলে গেল। বড়ভাই বলেছে, বন্দুকের কারখানা বসাই, তারপর মাস্কেট বাস্কেট সব দিব। আমাকে বলছিল, তোমাকে আনবার জন্যে।

—যাও নাই?

—যেতাম। কিন্তু তুমি বড়ই সুন্দরী ভাবী। ভাগলপুরী মুঙ্গেরী মাস্কেটিয়ারের নজরে আনব, সেটা খারাপ হয়। রাতে আমাদের বৈঠকখানায় লোকটা আসে।

—কে?

—ভি আই পি। ভাগলপুরী ইজ্জৎ মারা পার্টি। ভি.আই. পি। নাম হল ভিখুপদ গোনাহগার। আসো। ইদিকে। বলেই সঙকালী আমাদের পাশ দিয়ে ছুটে চলে গেল সামনের পথ ধরে দিগন্তের দিকে। বুঝতে পারলাম, পিনুর কোনও আগ্রহ নেই তার ভাবীর প্রতি। আমরা আসছি বলে সে একটুও প্রসন্ন হয়নি।

এরপর আমরা গরুর পালের মধ্যে পড়ে যাই। পিছন থেকে পাগড়ি বাঁধা তিনটে লম্বা লোক খুব উচ্চ উচ্চ গরু তাড়িয়ে আনছে। আমাদের দু'জনকেও লোক তিনটি খেদিয়ে নিয়ে যেতে থাকে। যতবার ভাইবোন কথা বলতে যাই, কোনও না কোনও একটা গরু হাম্বা করে, আমাদের স্বর ঢাকা পড়ে যায়।

যেতে যেতে আতা এম.এল. এর চেকপোস্ট দেখতে পাই আমরা। জোড়া নিম ঘোড়ানিম তলায় বাঁশের লম্বা গেট, একখানা বাঁশ এপার-ওপার পথের উপর শুয়ে রয়েছে এককোমর উঁচুতে, দুই পারে খুঁটা। একটি খুঁটার কাছে টুলের উপর আতা।

আমরা ভাইবোন পরস্পর একে অন্যের কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না বলে গরুপাল গুনছিলাম মনে মনে। আমার হিসাবে আটচল্লিশটা সর্বমোট, ছোট বড়য় উচা নীচায় সাদায় কালোয় লালে পাখরায়, হেনয় তেনয় সংখ্যা ৪৮ টা হয়। ধুলায় ধুলায় ঝাপসা, আমার দাড়িতে ধুলা, আসমানতারার তেল-চোপানো চুলে ধুলা।

আতা পান খায়। খড়কে কাঠি দাঁতের ফাঁকে খোঁচায়। আতা ৫৫৫ সিগারেট ফোঁকে। আগে আতা ছাতা মাথায় লুঙ্গি পরে ফুলশার্ট পিঁদে গাঁয়ে গাঁয়ে দলের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে বেড়াত। আতা ছিল ধুলা কাদার মানুষ। বিপ্লবী, আগমার্কা কথা ছিল তেনার। তিনি ছিলেন জমিজিরাতের খাস টহলদার। এখন তিনি ৪২০ ফুটানি করা ছত্রধর সেনাপতি, কার্তুজবাজ।

একদা আতা বাংলা কংগ্রেসের অজয় মুখার্জির নাসিকাধ্বনি করে নকল বক্তৃতা করতেন ব্যঙ্গসুরে, তখন করতালি ছিল তাঁর জয়ধ্বনি। সেই আতা এখন টুলম্যান, তার মঞ্চের চেয়ার চলে গেছে।

আতা বলে উঠল—রোকো।

গরু এবং আমরা দাঁড়িয়ে পড়লাম। আতা গরু গুনতে লাগল। আতা আতা এইট পাশ, নামতা জানে, শতকিয়া পড়েছে, সাক্ষরতার অভিযাত্রী, বিদ্যাবৎসল। আতা হ্যারিকেন কুমার, আলোর দিশারী, আতা আতাগাছে তোতাপখি, শৃঙ্খল ছাড়া তার হারাবার কিছু নাই, গরুর গলতানি অর্থাৎ গলার দড়ি, নথদড়ি অর্থাৎ নাকের দড়ি চেপে ধরে ধরে গুনছে।

গোনাগুনতি শেষ হলে টুলে এসে বসল আতা। টুলে বসা আতা, ওর দাবনা 'পরে হেলে পড়ে রয়েছে বেতের ডাঁটিঅলা ছাতা। ও নোটবইতে হিসেব কষছে, কর গুনে সংখ্যা বসাচ্ছে। মুখে রোদ লাগছে বলে একজন একচোখো কমরেড ছাতা ফুটিয়ে মাথায় ধরল।

বোন! এরা সেই খরে দজ্জাল। আখরি জমানায় গাধার পিঠে চড়ে আসবে। গাধার ডান চোখ এবং তার বাঁ চোখ কানা। গাধার পিঠের দু'পাশে ঝুলবে দুটি প্রকাণ্ড থলে। একদিকে বেহেস্ত অন্য দিকে দোজখ। মসিউল অর্থ মোসী বলে—একপাশে থলেয় থাকবে সমাজতন্ত্র। অন্য পৃষ্ঠে ঝুলবে ফ্যাসিবাদ। দজ্জালের কপালে লেখা থাকবে কাফ ফেরে = কাফের। কিন্তু তখন সাক্ষরতার বান ডাকবে, পিদ্দিম জ্বলবে ঘরে ঘরে, কিন্তু কেউ পড়ে উঠতে পারবে না কাফের শব্দটি। সমস্ত সৎগ্রন্থের পৃষ্ঠা মুছে যাবে। সমস্ত বাংলার কুটির হবে পর্নো-কুটির। শরৎচন্দ্রের মলাটে বাঙালি সেক্স-গাইড পড়বে।

তখন কী হবে আসমানতারার? কীভাবে যাবে তুমি শ্বশুর-ঘর! পায়ের আলতা ধুয়ে দেবে নদী। চোখের সুর্মা মুছে দেবে শিশির-কণিকা। ধুলায় আচ্ছন্ন হবে গোধূলি।

গাধার কপালে বসানো থাকবে একটি ছোট চৌকোনা বাক্স। কাঁচের পর্দায় ভেসে উঠবে স্বর্গের দৃশ্যাবলী। নরকের খাঁড়ি-যুদ্ধ। মাটির তেল ধুইয়ে উঠবে অতি লম্বমান, ঊর্ধ্বগগণে আকাশের হাবিলদার আজাজিল তৈয়ারি করবেন ডানাঅলা বিছা। কী হবে তখন আসমানতারা?

খরে দজ্জাল বলবে—আসো। স্বর্গের শর্টকাট রাস্তা আছে আমার কাছে। কাঁচের পর্দায় চেয়ে দ্যাখো সন্ত্রস্ত নগরী, ধর্ষিত গ্রাম। একজনকে পাঠাব আমি সমাজতন্ত্রের থলিকায়, আসো।

লোকটা নরকগামী হবে, সে পৌঁছাবে আতা এম. এল. এ-র টোলে। যাকে পাঠানো হবে ফ্যাসিবাদের থলিকায়, সে পৌঁছাবে উদার গণতন্ত্রের সুমহান পতাকাতলে কর্মবিনিয়োগ কেন্দ্রের ধাপায়। তাকে বুনতে দেওয়া হবে বেকারভাতার হ্যান্ডলুম। তার নাম হবে শ্রেষ্ঠী, মাথায় থাকবে ময়ূর পালকের টুপি, সে চামর দোলাবে কপালীটোলায় জোড়া থানার কাছে। তার পদবী হবে হোমগার্ড, সে নারীধর্ষণ করবে কি করবে না, বোঝা যাবে না। আমাদের দেশে তখন প্রচুর শিউলি ফুল ফুটবে আসমানতারা। গাধার এক

লাথিতে বার্লিনের প্রাচীর ধসে যাবে।

আতা হিসেব মিলিয়ে বলল—আড়াই শো। পঞ্চাশ গরু ইনটু পাঁচ।

—পঞ্চাশ গরু। হিদে হিদে হেট, কী বুলছেন শেঠ! পেটের গুলানও ধরছেন নাকি বাপা?

—না।

—লেকেন পচাশ কঁহাসে মিলতা?

—দ্যাখো, নবীমুক্তারের চেলা দাঁড়িয়ে রয়েছে, তর্ক করতে পারব না। আমার হিসেবে কখনও ভুল হয় না।

—জো হুকুম।

—অ্যাই কানা নফরা বিডিও, গুনে দেখা!

বিডিও, কানা ছত্রধারী ছেলেটার ডাক-পদবি। ও ছাতা বোজায় এবং ছাতা তুলে তুলে গুনতে থাকে।

—অ্যাই, বাউস খেলবা না আসর বিশ্বাসের বউমা, সিধা হও, খাড়ো থাকো। এই বলে কানা বিডিও আমাকে এবং বোনকেও গুনতির মধ্যে ফেলে কষে দেয় অঙ্ক।

—আমি মানুষের মাগ আতাবাবু! আমি অবলা, দুখপিয়ারি সখিনা ওরফে আসমানতারা , তুমি আমার টিকরহদের বড় কুটুম তোতাভাই।

—তোতা? কে তোতা?

—আপনি মোদের হাতে-হ্যারিকেন পঞ্চাৎ পেরধানের ভাইপো, ডাইডোলের গমে, মাটি কাটার মাস্টার লিস্টিতে ব্যভিচার করলেন, এলসি-র নিম্বার...

—কিসের মেম্বার?

—আপনি মোদের কুয়েতের আগুন। আপনি মরিচ গুড়গুড়ি পাখি, খাঁড়ির জটায়ু।

—অ।

—জি। পাঁচ পাঁচ দশ টাকা দিতে পারব না। মোহড়ার মুদিখানায় হাসমতের কাছে সেই টাকায় পুথল কিনব, নোলা কিনব...

—অ্যাই কানা নফরা, চালা গুপ্তি। কাউন্টার কর। কাউন্টার রেভলুসন কর। টাকা দিব না, পুথল কিনব! পুথল! নোলা? গায়ে নাই চাম, হরেকিষ্ট নাম।

—আমি শত হোক বিশ্বাস বাড়ির বউ, জেনারেল বডি।

এবার আতা সাহেবের গা ভয়ানক রি রি করে উঠল। তার পার্টির নামে মেয়েটা বদনাম করছে।

বিড়বিড় করে বলল—ইংরাজি মারাচ্ছে চাষার মাগ। তুই মাগ কিসের? কার মাগ? সোয়ামি ভাত দেয়? জোর করে পাত পাড়তে আসতে হয় কেনে? নেয় না কেনে? দোষ আছে। লুকিয়ে লুকিয়ে আসিস। মাঠে মাঠে আসিস। কেনে রে?

—থোও! বলে আমি পকেট থেকে বার করে দিই দু'খানি তাজা পাঁচ টাকার

নোট। বোনের হাত ধরে টানি, চলে আয়।

আতা সহসা অতি ভয়ংকর, নির্দয় বাক্যটি পেশ করল—তোর বোনকে মুঙ্গের যেতে হবে বিছাদি। বোনের রূপ বেচে চাকরি জুটালি। ধিক্!

গরুস্রোতে চলেছি আমরা। বড় আঘাত খোদা গো! এত অভিমান কোথায় রাখি! আতা নয়, অন্য এম. এল. এ কোটায় আমার চাকরি। কিন্তু সেই চাকরিতেও কু ইঙ্গিত আছে। গরিব আমরা, রূপ আমাদের মানায় না। আমাদের জীবনও বেমানান।

বোন পুতুল আর নোলা কেনে, তা-ও কি মানায়! কার জন্য কেনে বোন? ওর সতীনের খোকার জন্যে কেনে। বিশাল গতর সেই সতীনের, কালো মেচেতা পড়া মুখ, দাঁত পড়েছে চারটি, পিতলের তার দিয়ে বাঁধানো দাঁত, চোপা অসুন্দর নয়, কিন্তু পুরুষালি, থুতনিতে জড়ুল, তাতে দাড়ি গজায়, এক গুছি। বড়ই ভক্তিমতী, তছবিহসার জীবন, তছবিহ অর্থ জপমালা, খোদার কলাম তার মন্ত্র তার কলিজা, কল্ব। ওর নাম জিকিরা।

জিকিরা বিশ্বাস করে হজরত নবী চাঁদের গায়ে করাঘাত করে চাঁদকে দ্বিখণ্ডিত করেছিলেন, নবীর হাতের পাঞ্জার ছাপ লেগে রয়েছে চাঁদে, সেই ছাপ হল চাঁদের কলঙ্ক, চাঁদের দেহে রয়েছে চিকন দ্বিখণ্ডনের দাগ। জিকিরা তার খোকাকে আকাশে রাতে রকেট দেখায়, তারাসম স্ফুৎনিক। খোকার হাতে নোলা ধরিয়ে দেয় আসমানতারা, কাঁখে করা খোকাকে নিয়ে কোমর দোলাতে দোলাতে সেই নোলা হাত থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেয় জিকিরা। এই ঘটনা ঘটার আগে আমরা দুই ভাইবোন বিশ্বাস বাড়ির পাকা লালরঙের দালানের সামনে দাঁড়াই, গরুপাল চলে যায় পদ্মার ঢালের দিকে, ধুলা যায় পিছনে ভাসমান। দালানের কপালে লেখা, আসুন বসুন তামাক খান। সেই কপালে কোঁদা কাস্তে হাতুড়ি তারা।

তখন সন্ধ্যায় আজান পড়ে মসজিদে। সংস্কারবশে বোন মাথায় ঘোমটা তুলে দেয়। আজান হলে মাথা খালি রাখতে নেই।

চোখ দু'টি ছলছল করে ওঠে বোনের। আমিই তার বাপমা ভাইবোন, আমি বুঝি কেন ওর চোখে জল ভরে আসে। দ্বিধায় দ্বন্দ্বে আসক্তিতে ভয়ে কামনায় ওর হৃদয় কাঁপছে।

আসমানতারা বলল—আমার কি জায়গা হবে ভাইয়া! মুঠায় আমি মক্কা-মদিনা ধরেছি। এক হাতে নোলা, এইতে আমার বসতি। অন্য হাতে পুথল, আমার কউম, আমার বংশের বাতি। কাকে কোথায় রাখি ভাইয়া! কী করে ধরব তুমি বলে দাও!

একথা বলে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলে আসমানতারা। আসুন বসুন তামাক খান, কাস্তে হাতুড়ি তারা ফব-কং তাকে ডাকছে। মাস্কেট-মুরলীধর স্বামী তাকে ডাকছে। তাকে ডাকছে মুঙ্গের, ভাগলপুর।

আমি জানি, আমার বোনের কী হবে। আমি জানি, কোন্ হাতের মুঠোয় কী ধরেছে বেচারি।

নোলা ফেলে দেয় জিকিরা। তা সত্ত্বেও বোনকে জায়গা খুঁজতে হয় এই ছাপমারা

কমরেড-দালানে। স্বামী যখন যখন খেতে বসে, তালপাখা হাতে করে ছুটে যায় হাওয়া করতে আসমানতারা। আসরের ছেলে হাসর, হাসর মানে রোজহাসর, মানে কেয়ামত, মানে খোদার জাজমেণ্টের দিন। এই নামে প্রাণ কাঁপে মানুষের। স্বামীর নামে প্রাণপাখি এতটুকু হয় ভয়ে। স্বামীকে হাওয়া করতে যায় লোডশেডিং হলে। স্বামী বলিষ্ঠ দেহ লেটিয়ে খেতে-বসে, রোমশ গা স্ফীত করে কাঁধে যেন কেশর ফোলায়, খাওয়ার সময় হাসর বিশ্বাসের কোলে শুয়ে নোলা চোষে খোকা। খেলা করে। ছেলেকে আঁশমাখা ভাত একটু আধটু মুখে গুঁজে দেয় হাসর।

আসমানতারা হাওয়া করতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে বাঁ হাতের আঙুল প্রসারিত করে শূন্যে তুলে, না বলে থামায়, যেন সে এক হাত তুলে রাস্তার বাস থামাচ্ছে।

অপমানে আসমানতারার মুখ কালো হয়ে যায়। এবার সে জিদ করে এসেছে, আর সে ফিরবে না। ভোরের চৌমাথায় মাচায় বসে থাকা নামাজি সৎ নানাকে বলে এসেছে—আখরি বার যাচ্ছি নানা, আর ফিরব না।

কুলকুচির পর স্বামী লুঙ্গিতে মুখ মোছে। হাত পাতে মুখশুদ্ধির। আসমানতারা ধনে দিতে যায়। হাতে নিয়ে মেঝেয় ফেলে দেয় হাসর।

—কেন অমন করেন বিশ্বাসের পো!

—দোষ আছে।

—কী দোষ আছে আমার?

—বুঝা যায় না। নারীর দোষ বুঝা যায় না। তুই হুরিনুরি, তোর কাছে জিনপরী আছে। দিনে দিনে যে সুন্দর হয়, মাত্রায় মাত্রায় যোবতী হয়, সে খারাপ, তার আছে পরীদোষ। বা, বুঝা যায় না। যাঃ!

—কেন শাদি করেছিলেন আমাকে!

—গুণ করেছিলি আমাকে। পরীতে টেনেছিল! তোর সহবাসে শুক্র নাশ হয়। এখন যুদ্ধের টাইম। আসমানে শকুন উড়ছে। বল চাই, সাহস চাই। তুই জিনের সাথে নষ্ট।

আকাশে এখন একখানি জেট-বিমান চলেছে, খড়ম পায়ে ফেরেস্তা পায়চারি করছে তারায় তারায়। ওলাবিবির থানে শেয়াল ডাকছে, শনি ঠাকুরের থানে ধুনি জ্বেলেছে পাঁচজন গরুর ব্যাপারি, গাঁজা খাচ্ছে তিনজন বাউলের সঙ্গিনী।

মধ্যরাতের নামাজ তাহাজুদ পড়ছে জিকিরা। একটি থামের কাছে বসেছে আসন পেতে, তছবিহ গুনছে, চোখ পাকিয়ে চেয়ে আছে আর একটি থামের দিকে। ওখানে কাঠ হয়ে বসে রয়েছে আসমানতারা। জিকিরা দেখছে একটি পরী বসে রয়েছে।

নামাজের আসন গুটিয়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এল জিকিরা। দ্বীনা ভাবীর গায়ের বসন টেনে আঁচড়ে খুলে ফেলে দিল আসমানের গা থেকে। খড়ম চলেছে তারায় তারায়। বোন আমার নগ্ন হয়ে যায়। ওর এক হাতে মক্কা, অন্য হাতে মদিনা।

দূরে একটা নদীতে নৌকা যায়। আলোর বিন্দু যায়। বাইরে জ্যোৎস্না ফটফট করছে। ওই নৌকায় করে বিয়ে করে এনেছিল হাসর আসমানকে। মরুভূমির সিঁথি চিরে

চলেছে ফোরাত। বোন আমার সুতা-কাটনি মেয়ে। অর্ধনগ্ন আসমানতারার চুলের মুঠি ধরে জিকিরা ঠেলে ফেলে দিল স্বামীর রুদ্ধ দোরের কাছে। বোন আমার পশুর মতন দোরের কপাট আঁচড়াতে থাকল সারারাত। দোর খুলল না। মসিউল লিখেছিল কবিতা :

একটি ছায়াপথ দুধের সরণি
ওই পথে হাঁটে স্বর্ণ-পাদুকা
লোহিত তারকা নেমেছে নদীজলে
ছইয়ের গহ্বরে জ্বলছে জোনাকি।

কে নাই কী যে নাই
    মল্ল বিভূঁয়ে
মাল্লা হাঁকছে জলের এ আঙিনা
দুলছে কানাতে অশ্রু-মদিনা
এ হেন জ্যেৎস্না এ হেন রজনী—

একটি ছায়াপথ দুধের সরণি।।

এ হাতে মক্‌কা ও হাতে মদিনা
মরুর জ্যোতিষে
ঘনায় সাইমুম
কে নাই কী যে নাই
সখিনা সখিনা
বুনেছে হ্যাণ্ডলুম, উড়েছে বোররাক
এ হেন যামিনী এ হেন জ্যোৎস্না—

লোহিত তারকা নেমেছে তড়াগে
গাঁয়ের কুটিরে জ্বলছে জোনাকি
ওই পথে হাঁটে স্বর্ণ-গোধিকা
একটি ছায়াপথ দুধের সরণি ॥

ছায়াপথে ডানাঅলা বৃশ্চিক একটি তারকা ছেড়ে একটি তারায় লাফিয়ে পড়ছে। আমার চোখের কোণে জল।

বাইরে তীব্র গগন-স্পর্শী শব্দে পর পর দু'টি বোমা ফাটল। আতা এম. এল. এ-র পলিটিকাল পার্টি এল গাধার পিঠে চড়ে, মুঙ্গেরি খচ্চর। তারা ইনকিলাব জিন্দাবাদ বলল, পার্টির নামে ঐক্যধ্বনি দিল শরিকের শরিকি ফাটলে, দাঁড়াল এসে উঠোনে।

খুব সহজ গলায় মাস্কেটঅলা দু'জন দজ্জাল সরল দাবি জানালো—রাতে তোর মাগের কাছে শোব হাসর আলি। ঘর সাজা।

একটা বাইরের কামরায় সুন্দর করে বিছানা পেতে দিল জিকিরা। আসুন বসুন তামাক খান। এভাবে হাসর অভ্যর্থনার হাসি হাসল, তিনজন ঢুকল আমার বোনকে হাত ধরে টেনে নিয়ে। সারা রাত বোনের উপর অত্যাচার করল ওরা। ভোররাতে দু'জন চলে গেল। একজন থাকল।

ঘুমিয়ে পড়েছিল লোকটা। বন্ধ দোরের বাইরে চৌকাঠের কাছে জেগে বিড়ি টেনেছে হাসর।

খুব স্বল্পস্ফুট গলায় ডেকেছে—জাগো নাকি সুমুন্দি?

আমার মুখ বাঁধা, দড়িতে বাঁধা দেহ, উঠানের কুলগাছের সঙ্গে। আমি প্রাইমারির মাস্টার। মৌলবি প্যাটার্নের চরিত্র, আমি জামাত করতাম, এখন মার্কসবাদী লোক। আমি দেখেছি একটি সরীসৃপ, যার ডানা আছে। কেউ দেখেনি।

লোকটা ঘুমিয়ে পড়েছিল আসমানতারার পাশে। দোরের বাইরে ঘুমিয়ে পড়েছিল বিড়ির আগুন। বোন তখন বাইরে এসে ঘরের শিকল তুলে দেয়। ও ভেবেছিল অন্তত এই লোকটার বিচার হবে। গ্রামের মানুষ ছুটে আসবে তার ডাকে। দোরে দোরে গিয়ে ডেকেছিল আসমানতারা। —জাগো ন্যাদা পোকা। জাগো গুবরে পোকা। জাগো হালশাহ্না। জাগো দফাদার বাবা। জাগো ইমাম। জাগো ইমান। রছুলফুপা গো। ইদ্রিশ চাচা গো! মৈমন মামী! হারুন ভাই। জাগো জাতি, জাগো ইসলাম। জাগো সমাজ।

এভাবে পথে পথে, দোরে দোরে, ঘুরে ঘুরে ধর্ষিতা বোনটি আর পারেনি, কেঁদে ভেঙে স্বর বসে যাওয়া ফেনাতোলা মুখে ডুকরে উঠেছিল—জাগো বৃশ্চিক।

এবং আসমানতারা ভোররাতে ঘরে ফিরে এসে সেই লোকটার পাশেই কী আশ্চর্য আবার ঘুমিয়ে পড়েছিল। কেউ তাকে সাড়া দেয়নি। পশুপক্ষী-মানুষ—কেউ না।

রোদ আসে, জানলা বয়ে উঠানে রোদ ঝলমল করে। লোকটা চলে যায় রোদ মেখে মেখে এল সি-র মিটিঙে। তখন উঠোনে তুলে আনা হয় বাইশ বিঘার আল থেকে জবাই হওয়া নরমাংস, সঙকালীর দেহ। বোনটি আমার কাঁদে না। ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে শস্য-প্রহরী দেবর জিয়ার কাফন মোড়ানো দেহের দিকে।

একটি কালো টাট্টু চড়ে আসে জানাজার নামাজে ভিখুপদ ওরফে জুম্মন খাঁ হকদার ম্যাস্কেটিয়ার। ভি. আই. পি।

—সালাম আলেকুম হাজিরে জুনাব। জানাজা-এ ইসলাম। বজরং বজরং ফব-কং ফব-কং, বৃশ্চিক চিকচিক, চামচিকা মস্তান, কমরেড মাকড়া, চটিতং আরবি, হা হা লাদরি, ইয়া নাফসি, ইয়া নাফসি, খোদা হামার কী হইবে!

জানাজা হয়ে গেল।

বোনটি তখনও বসে রয়েছে থামের হিল্লায়। কথা বলে না বোন। মাস্কেটিয়ার দু'খানি মাস্কেট রাখল কাঠামো ভেঙে পড়া হাসরের পায়ের কাছে। কেমন একটু নাড়া

খেয়ে উঠল হাসর বিশ্বাস। চোখ চকচক করে উঠল। মেঘের গুমরানির মতন ভ্রাতৃশোকে কাতর বুকটা গোঁ গোঁ করল বার কতক।

জুম্মন বলল—ঔরতের দাম ভাইসাব।

দুটি মাস্কেটের বদলে আসমানতারা বিক্রি হয়ে গেল।

আমি কেঁদে উঠি—তুই যাস না বোন!

বোন পাগলির মতন মুঠিবাঁধা হাত দেখিয়ে শুধালো—মক্‌কা কোন মুঠে কও! মদিনা কোন মুঠে কও! মসীভাইকে বুলো আমি খারাপ হইনি। কে নাই কী যে নাই বুলে মন খারাপ না করে। জিনে আমকে নষ্ট করেছে ভাইয়া। ওই তিনটা মানুষ ছিল না।

তারপর স্বামী হাসরের মুখের দিকে চেয়ে পায়ে সেলাম করে মাথায় হাত ঠেকিয়ে বলল—মোকে তালাক দ্যান! আমি যাই।

কালো টাট্টু চলেছে গ্রাম-পথরেখা ধ'রে, বোন আসমানতারা চলেছে বধূবেশে মুঙ্গের, জিনের স্পর্শে পবিত্র সে বোমা বাঁধা শিখবে। অথবা ওকে কিনে নেবে কুয়েতের শেখজি। দৈনিক পত্রিকায় ওর ছবি ছাপা হবে একদিন। শেখজি ধরা পড়বে বোম্বাইতে।

তখন হয়তো আসমানতারা বলবে—উনি আমারে জোর করেন নাই। আমি ওর দুলহিন, কলমা-পড়া বউ। আমি পরী।

উৎসর্গ

আকাশে উড়ছে ধুলো আর ছাই এবং সেই ভস্মধূলিরাশির ভিতর দিয়ে আগুন বইছে। মরুভূমির আকাশ যদি ইহবৎ, তাহলে পায়ের তলার মরুমর্ত্য কীভাবে বিদগ্ধ হচ্ছে, যে বেচারি পুড়তে পুড়তে চলেছে সে-ও কি সবখানি বলতে পারে! কোথায় চলেছে মিস্রীয় (মিসরীয়) দাসী ইগার? তার তলপেট উৎফুল্ল, কেন না সেখানে পুড়ছে তার জন্ম না-নেওয়া সন্তান। শুধু শাবকের জন্য তার গৃহপ্রেম ঘুচে গেল! তাঁর মরদ গোষ্ঠীপিতা অব্রামই কি তাঁকে তাড়িয়ে দেননি! শুধুই কি দাসী বলে এই হেনস্থা, সারির ঈর্ষা কি মরুপাবকের হুঙ্কার চেয়ে নিরীহ?

পুত্রশাবকই বংশরক্ষা করে, ধনুর্ধর হয়! পুত্র গর্ভে থাকলে নারী তার কোখ বিচার করে বোঝে এ পিণ্ডটি স্ত্রী নয়, এ পুং। উদরে পিণ্ডের স্থানযাপন, ঘাই মারা এবং সক্রিয়তা দেখে এবং স্বপ্নে তার উদয় দেখে বোঝা যায়, এ আলবৎ ছেলে হবে।

কেন মুখ ফুটে বললাম এ ছেলেই নিশ্চয়! তখনই গ্রীষ্মের মরুজিহ্বা সারির চোখে চিরে গিয়ে লকলক করে উঠল, ঈর্ষা মরুবৃশ্চিক অপেক্ষা জ্বালা দেয় মানুষকে— এই দাসীকে মারে, কাটে, তাড়ায়। ইগার চিন্তা করে এমত।

অথচ এই সারিই ইগারকে ঠেলে দিয়েছিলেন তাঁর স্বামীর বিছানায়, যাও শোওগে, আমি তোমার পেট থেকে পুত্র জন্মাব, এ হবে আমারই দাসীর জাতক এবং ক্রীতদাসীর সন্তান মনিবে বর্তায় এবং এভাবে যাযাবর তাম্বুধারীরা মরুতে কর্তৃত্ব রচনা করে, এছাড়া আর কী পথ, আর কীভাবে সুখী হব , বর্ধিত হব?

বৃদ্ধি, বৃদ্ধি, বৃদ্ধি। ক্রমাগত বৃদ্ধি, পশুদল আর গোষ্ঠী বিস্তারেণ, মানুষ বাড়াও, পশু বাড়াও, তাম্বু বৃহৎ হোক, সংখ্যাতীত হোক। কিন্তু অব্রামপত্নী সারি গতবয়স্কা হলেন, তাঁর তলপেট কিছুই উৎপন্ন করতে পারল না। এ ব্যর্থতা দুঃসহনীয় বটে, ব্যর্থতা প্রগাঢ় তখন হল, যখন সারির স্ত্রীধর্ম ফুরিয়ে গেল। মনে হল, ঋতু চিরতরে রহিত হয়েছে। তিনি চোখের জল ফেলতে ফেলতে দাসীকে স্বামীর অঙ্কে ঠেলে দিলেন!

এ পেট কি পুণ্যতোয়া নয়, এ কি কেবলই লোভার্ত! এলা বৃক্ষের শিকড়ে মাথা কুটলো দাসী ইগার। এলা এই মরুভূমির ঈশ্বর-বৃক্ষ। যেখানে বৃষদেব তথা বালদেবের প্রতিষ্ঠা সেখানেই এলা। এল মানেই তো ঈশ্বর। এই গাছের শিকড়ে মাথা কুটেও ভয় গেল না মন থেকে। ইগারের অন্তর লোভে উতলা হয়েছে, এ আমার, এ অন্তর-পিণ্ড আমার, এ ছেলে আমার! এখনও যার মুখ দেখিনি, যার আদুল গা ছুঁইনি, যার লিঙ্গ-উষায় চুম্বন করিনি, সে আমারই। আমি দাসী হলেও মিস্রিয় কিব্‌তি (মিশরের আদিবাসী) সুরূপা, আমি মার্জিত এবং অহংকারী।

ইগার গলাধাক্কা খেল, পিঠ বাঁকিয়ে মারখেল, কষ চেপে ধরলেন সারি। এই সারিই স্বামীকে বলেছিলেন, বিনয় করি, তুমি আমার দাসীতে গমন কর, কী জানি, হয়তো বা ইহার দ্বারা আমি পুত্রবতী হব!

আমি কি কর্ত্রীর জন্য তলপেট ভাড়া দিয়েছিলাম গোষ্ঠীপিতার কাছে! গোষ্ঠী অধিপতির অনুগ্রহ কি শুধু নির্বিচার শাবককে ফলিয়ে তোলায়, আর কিছু নয়? মরুভূমি অগ্নিস্রাব করে চলেছে। তাঁবু থেকে পালিয়ে এসেছে ইগার। কিন্তু কোথায় পালাবে, লুকাবে কোন গুহায়?

এই মরুগ্রীষ্মে আর পথ মাড়াতে পারে না ইগার। এলা বৃক্ষ দেখলেই তার তলে বসে পড়ে। রাত্রির আকাশও ভয়াবহ। আকাশপথে যেন এক একটি আগুনের ডুলি চলে যায়, উল্কাগুলি উটের গ্রীবা হয়ে উড়ে যায় পর্বতের দিগন্তে। মরুশৃগাল মরুঝড়ের গলায় হু-উ-উ করে কাঁদে। মরুনেকড়ের ধূর্ত ছায়া চলে যায় সমুখ দিয়ে, ইগারের তলপেট দিনে রাতে তবু বৃদ্ধি বৃদ্ধি রবে স্ফীত হয়। তার লোভ, তার অহংকার তাকে তাড়ায়, তাড়িয়ে নিয়ে চলে সুর দেশের মরুসরণির কিনারা ধরে।

সুরের এই পথেই একটি শীতল মরুপ্রস্রবণযুক্ত কূপ পায় ইগার। এখানেই ধসে বসে যায় গর্ভিণী। মাথার উপর এলাগাছের ছায়াও পেয়েছে দাসী। এখানে বসেই সে সূর্যাস্ত দেখছিল। সন্ধ্যাও ঘন আঁধার ছড়াতে ছড়াতে দূর বিস্তীর্ণ প্রান্ত থেকে এগিয়ে আসছে। তখনই রাত্রির আকাশের মরুতারকার মতো কিছু যেন কূপের ওপারে ঝলমল করে উঠল। ইগার জানে এই মরুমর্তে সদাপ্রভুর দূতেরা ঘুরে বেড়ায়। তারা দেখতে মানুষেরই মতো। ইগারের মনে হল, এ ঠিক আবসিনার মতো, তার সঙ্গে নরদেবতা কাবুস (ফরৌন)-এর দেশ থেকে এসেছিল। এই দাসটিকে কাবুস (ফরৌন বা ফারাও) অব্রামকে উপহার দিয়েছিলেন। উনি ছিলেন প্রথম কাবুস, যিনি অব্রামের সঙ্গে সুব্যবহার করেন, সারিকে সুন্দরী দেখেও ভোগ করেন না। অব্রাম সুন্দরী বউকে নিয়ে মিসরে কেনান থেকে নেমে গিয়ে ভয়ে ভয়ে ছিলেন, কাবুস বুঝি সারিকে গিলে খায়। কেনান (প্যালেস্টাইন)-এ তখন দুর্ভিক্ষে আবাদি বিনষ্ট, বেদুইন অব্রাম তাঁবু গুটিয়ে নিয়ে খাদ্যের খোঁজে মরুমর্তের গোলাঘর কাবুসের দেশে তাঁবু ফেললেন। প্রচার করলেন, সঙ্গের স্ত্রীলোকটি তাঁর ভগিনী। সারির রূপ অপরূপ। তাঁর রূপে মুগ্ধ হয়ে কাবুস অব্রামকে প্রাসাদে থাকতে দিয়েছিলেন। নারীর রূপ কী বস্তু সদাপ্রভুই জানেন।

কাবুস সারিকে ভোগই করতেন, হঠাৎ প্রকাশ হয়ে পড়ল সারি অব্রামের পত্নী। তখন কাবুস নিজেকে সংবরণ করে ভদ্রভাবে অব্রামকে তিরস্কার করলেন স্ত্রীর পরিচয় গোপন রাখার জন্য। অবশ্য সারি বিয়ের আগে অব্রামের কাকাত কি জ্যাঠতুত বোনই তো ছিলেন। বোন সত্য, আবার বোন মিথ্যাও তো বটে, এই চালাকিটা কেন করতেন অব্রাম সদাপ্রভুই জানেন! অর্ধাংশ মিথ্যা এবং অর্ধাংশ সত্য প্রাণের দায়ে, অন্নের জন্য, ব্যবসার খাতিরে গোষ্ঠী অধিপতিকে কতই না বলতে হয়েছে! একাধিকবার বিভিন্ন সময়ে সারিকে বোন বলে চালিয়েছেন গোষ্ঠী-মোড়ল অব্রাম। অবশ্য মোড়ল আর হলেন কোথায়!

ভাইপো লোটের সঙ্গেও পশুপালের থাকবার জায়গা নিয়ে ঝগড়া হল, দল ভাগ হয়ে গেল। মনোমালিন্যও হল।

কিন্তু সে যা হওয়ার হয়েছে, কাবুসের কথাই তো মনে পড়ছে আবসিনাকে দেখে। কাবুস সংবরণ করলেন, দোস্তি হল অব্রামের সঙ্গে। ইগারকে দান করে দিলেন গাধাগরুছাগলমেষের সঙ্গে অব্রামকে। সারিই ফরৌনকে মুগ্ধ করে ওইসব আদায় করেছিলেন, নইলে একজন বেদেকে অত খাতির কেন করবেন নরদেবতা কাবুস! নরদেবতা কাবুস ভিনদেশীদের বেদে ছাড়া জ্ঞান করেন না। তাঁবুধারী হলে তো অতি অবশ্য বেদে অর্থাৎ বেদুইন।

ওটা আবসিনা হতে পারে, ঘোমর হতে পারে, তেহর হতে পারে। দাস নিশ্চয়। নয়তো এ কোনও দেবদূত, অমন পোশাক কোথায় পাবে দাসেরা! ঠিক কী দেখছে ইগার? ঝলমল করে নড়ে উঠল দুধসাদা লোকটা।

অত্যন্ত নরম গলায় বলল—তুমি কে গো মেয়ে! সারির দাসী ইগার? চলো চলো, স্বামীর তাঁবুতে ফিরে চল! সারির বশ্য হও, কর্ত্রীকে অমান্য করে সুখ নেইকো মিস্রিয়া।

ইগার লোকটির কথা শুনে ঝাপসা অনুভূতি আর মরুসন্ধ্যার ঘোরে বুঝল, কূপের ওপারে ফরিস্তা বসে রয়েছে। ফরিস্তারা মানুষের বিবেকের সুরে কথা বলে। ইগারের মাথার মধ্যে মরুভূমির আগুনে পোড়ানো কটু ধোঁয়া ঢুকে গিয়েছিল, তাতে তার বুদ্ধিবোধ কেমন ঘুলিয়ে গেছে, সে দাস আর ফরিস্তার তফাত করতে পারছে না।

দেবদূত আবার বলে উঠল—তাঁবুতে ফিরে গেলে তুমি বাঁচবে, তোমার পেটের শিশুটাও বাঁচবে। নইলে এখানে একা একা কী করে বিয়োবে?

—স্বামী আমাকে নেবে না। কই একটা কোনও দাস কি দাসী আমাকে খুঁজতে এল না কেন? কতবার পিছনে ফিরে ফিরে দেখেছি, কেউ আসেনি। মন চাইলেও শরীর আর বইছে না। মনে হচ্ছে, এখানেই আমি প্রসব করে ফেলব। তুমি আমাকে সাহায্য করো ফরিস্তা!

দেবদূত বলল—তোমাকে তোমার মনিব কি ভালোবাসেন না? নিশ্চয় বাসেন। তুমি তার উষ্ট্রীর চেয়ে দামি, কাবুসের দেওয়া উপহার। আমরা তোমার মনিবকে অব্রাম থেকে অব্রাহাম বানাব। গোষ্ঠীবাবা থেকে মহাজাতির আদি জনক বানাব। তাকে ক্ষুদ্র থেকে মহৎ করব। সমস্ত জাতির পিতা হবেন অব্রাহাম। চেষ্টা করো, ওঠো!

—না, আমি আর পারব না। আমার শাবক ভিতর থেকে বাইরে আসবে বলে ধাক্কা দিচ্ছে, আমার কষ্ট হচ্ছে সদাপ্রভুর দূত। তুমি আমাকে সাহায্য করো!

—তবে তাই হোক। এই কূপটাই তবে সাক্ষী রইল। এর নাম হোক বের-লহয়-রোয়ী। অর্থাৎ দর্শনা কূপ। এখানে আমি তোমাকে দেখা দিয়েছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে পেয়েছিলে এবং প্রসব-মুহূর্তে, খুব বেদনার ভেতর ; তোমার জিভ ঝুলে পড়েছিল। মরুভূমি তোমাকে পুড়িয়ে দিয়েছিল, পায়ে দগদগে ফোস্কা পড়েছিল।

—উঁহ্, মা গো! আমাকে সাহায্য করো এল্‌-ইলোহে, হে খোদা, চির-অমর

ফরৌন! আমি মিস্রিয়া, আমি দাসী, নীল নদীর গমের শীর্ষ, আমি কেনানের নদী যর্দনের তৃণ।

—তোমার মা নেই মিস্রিয়া!

শরীর দণ্ধে ছিঁড়ে যাওয়ার এই তীব্র বেগের মধ্যেও হাসি পেয়ে গেল ইগারের। কী বলে ফরিস্তা! এক মরুখণ্ড থেকে অন্য মরুপ্রান্তে চলে যাওয়া কোনও গর্দভী কি উষ্ট্রীর কি মা থাকে!

ইগার দর্শনা কূপের শিয়রে দাঁড়িয়ে থাকা এলা গাছের তলে চিৎ হয়ে পড়ে গিয়েছে। তার মাথাটা কে যেন শিকড়ের উপর অত্যন্ত আয়েস হেতু হালকা ঠেলায় তুলে দিল। তখন তাম্বু থেকে পলাতকা লোভী ভীতা মিস্রিয়া দাসীটি মরুদিগন্তে দৃষ্টিক্ষেপ করে দেখল সন্ধ্যা-তমিস্রায় রক্তাম্বরী একটি অশ্বলাঙ্গুলবৎ ধূমকেতু উঠেছে। ধীরে ধীরে সেই ধূমকেতন রক্তরঙ ধূমল হয়ে আসে।

দেবদূত ইগারকে প্রসব করাতে থাকে। জালিকা ঠেলে শিশু যখন মরুমর্তে তার মাথাটি প্রকাশ করে তখন ফরিস্তা তার পবিত্র হাত দু'টি ব্যবহার করে শিশুর সর্বাঙ্গ বাইরে টেনে নেয়। ইহা অদ্ভুত যে, ফরিস্তা মানুষীর প্রসব দেখেছে এবং প্রসবে অংশ গ্রহণ করেছে।

প্রসব অন্তে দেবদূত ইগারকে বলল—তোমার বাচ্চাটি দামড়া বটে ইগার। এ নিশ্চয়ই তীরন্দাজ হবে, তার সমুখে ঢালী ইহার ঢাল বইবে, এর দ্বারা আমি মরুভূমির এক উত্তম জাতি নির্মাণ করব। আমি ইহার নাম দিলাম ইশ্মায়েল, ইহার অর্থ চাও নাকি ইগার?

ইগার উৎসুক দৃষ্টে চেয়ে দেখল দূর তারকার দিকে, ক্রমগত তার মনিবের মুখটাই মনে পড়ছিল, এ দাসী দেবদূতের স্পর্শ অপেক্ষা মনিবের মুখ মনে করে যন্ত্রণার অধিক উপশম অনুভব করেছে, এ কথা এল্-ইলোহের আদিপুস্তক লেখে না। কিন্তু ইগার মনিব ছাড়া কাকেই বা বুঝত!

দেবদূত বলল—ইশ্মায়েল অর্থ ঈশ্বরের কান। কেননা সদাপ্রভু এর জন্মের আর্তনাদ এই মরুমর্তে শুনেছেন। এ পুত্র তোমার বনগর্দভস্বরূপ মনুষ্য। মাফ করো দাসী ইগার, পুত্রের হাত সকলের বিরুদ্ধে উত্থিত হবে এবং সকলের হাত তোমার পুত্রের বিরুদ্ধ হবে—একে আমি একা এই মরুতে লুকিয়ে রাখব, বর্ধিত করব। ভয় পেও না, তোমার গর্ভের লোভ, তোমার আত্মার আসক্তি জয়যুক্ত হোক। তুমি মনিবের তাঁবুতে ফিরে যাও।

এই সব কথা পেশ করে মরুভূমির ফরিস্তা মরুআকাশে নক্ষত্রের ডানা মেলে উধাও হয়ে গেল। দর্শনা কূপের সন্নিকট ভূমরুতে পড়ে রইল মা আর ছেলে। ইগার শরীরে ব্যথা যা পেয়েছে তদুপেক্ষা অন্তরে কষ্টের ভাগ কম ছিল না। কিন্তু এখন একলা সুর-সরণিতে শিশুকে নিয়ে তার ভয় করতে লাগল।

ইগারের মনে হল, মরু-শৃগালই ইশ্মায়েলকে খেয়ে ফেলবে। হায়েনা এসে শিশুর পা চিবিয়ে দেবে। নেকড়ে এসে কোল থেকে টেনে নিয়ে যাবে। মরু-শকুনেরা ছোঁ মারবে। পথে যদি পলেস্টীয় ডাকাতরা নামে বর্শা চালিয়ে মাটির সঙ্গে গেঁথে ফেলবে। তা ছাড়া

এই কূপটার উপর বিশ্বাস রাখা যায় না, মরুঝড়ে এ বুঝি বুজে যেতেও পারে। কিন্তু একে অবিশ্বাস করা গোনাহ। কেননা এর নাম দর্শনা, এখানে ঈশ্বর এক দাসীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন।

সাতপাঁচ বিবিধ অনিষ্টের কথা ভেবে, লোভী ইগার মনিবের তাম্বুমণ্ডলীর দিকে এগিয়ে চলল। কত দূরে এসে পৌঁছেছিল বেচারি ইগার! সুর দেশের পথই বা কী করে খুঁজে পেয়েছিল সে! সে কি আর অত ভেবেচিন্তে পালিয়ে এসেছিল! মনিবের উপর তার কি অকথ্য অভিমান হয়নি!

সারি মনিবের চোখের উপরই ইগারকে মারত-ধরত, মুখে কুলুপ এঁটে থাকতেন গোষ্ঠীপিতা। এত প্রকাণ্ড বলবান মানুষ যিনি কিনা বাবিলনের উর নগরী ছেড়ে এসেছেন নিম্রোদের অত্যাচারে, যাঁকে কর্মকার ইবলিস হাপরের অনির্বাণ আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেবার পরামর্শ দিয়েছিল নিম্রোদকে, সেই আগুনে নিক্ষিপ্ত হয়েও যে অব্রাম বেঁচে রইলেন, যে-আগুন সদাপ্রভুর ইচ্ছায় শান্তিনিকেতন হয়ে গুলবাগিচায় আগলে রাখল মোড়লকে, সেই তিনিই ইগারকে, গর্ভবতী ইগারকে অত্যাচারিত হতে দেখেও চুপ করে থাকেন?

অথচ আড়ালে দেখা হলে ইগারের গর্ভদেশে তিনিই কি গোপনে চুম্বন দেন না! এই ইশ্মায়েলকেই কি তিনি জন্মের আগেই চুম্বন করেননি? এই বনগর্দভ শিশুটাই কি তেনার সন্তান নয়। বনগর্দভ মনুষ্য মানে কী? বলশালী একগুঁয়ে এবং সরল? ইশ্মায়েলের হাত সবার বিরুদ্ধ হবে, সবার হাত ইশ্মায়েলের বিরুদ্ধ হবে, ফরিস্তার কথা অদ্ভুত। মা ছাড়া তাহলে এই শিশুর আর কে রইল! অবশ্য মরুমর্তে শিশুর সঙ্গে মায়ের প্রেমই শ্রেষ্ঠতম, কারণ অন্য প্রেমগুলি হেরা পর্বতের সুর্মা ছাড়া কিছু নয়, মরুসূর্যে জ্বলে মাত্র, রাত্রি নামলে চোখের জলে ধুয়ে যায়।

ইগার নিজেকে প্রশ্ন করল—তুমি কেন এভাবে ফিরে চলেছ? কিসের তাড়না তোমার?

—আমার লালসা, আমার লোভ, আমার আকাঙ্ক্ষা। আমি পৃথিবীর সবচেয়ে ধনী দেশের মেয়ে, আমি দাসী হলেও রূপসী, আমি নির্বোধ নই, আমি কাবুসের হারেমে ছিলাম।

ইগারের অন্য একটি মন নিজেরই কথা শুনে হেসে ফেলল। বলল—জানি, জানি। শিশুতে পশুরও লালসা থাকে। গোষ্ঠীপিতাদের লোভ শুধু পুত্রে, কারণ তারা শত্রুর বিরুদ্ধে লাঠি ঘোরাতে পারে। অব্রাম নিশ্চয়ই লুব্ধ হবেন তোমার ছেলেকে দেখে। কারণ তিনি যখন জন্মস্থান উর ত্যাগ করে আসেন তখন থেকেই সদাপ্রভু তাঁকে নিরন্তর বলে চলেছেন, তোমার সম্মুখের বিশাল এই মরুমর্ত তোমারই হবে। তুমি বিজয়ী হবে। তুমি বেদুইন, তাঁবু ফেলতে গেলেও তোমাকে গ্যাঁটের কসিতা (মুদ্রা) গুনে দিতে হয় কেনানের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজাদের ; গ্রাম-মোড়লের সামনে মাথা নুইয়ে বলতে হয়, বিনয় করি মহাশয়, তাঁবু ফেলব, অনুগ্রহ করুন। তুমি তোমার তাঁবুস্থলীতে বড় জোর একটি এল্ বৃক্ষের চারা

পুঁতে সদাপ্রভুর নামে বলিদান করো ক্ষুদ্র একটি মেষ। বলতে পারো না, এই স্থান আমার হোক, এ বৃক্ষ আমারই।

সব যুগেই স্বপ্নের ভিতর দিয়ে মতবাদ আত্মপ্রকাশ করে। স্বপ্ন ছাড়া আদর্শ বা ঈশ্বর আসতে পারে না। স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ঈশ্বর বা জ্ঞানের নিয়ম মানুষের মাংসে গেঁথে যায়। অব্রামই সেই মানুষ যিনি প্রথম মরুবিশ্বে স্বপ্নের এই সদাচার উপলব্ধি করেন, স্বপ্নের আনাগোনায় তিনি তাঁর অস্তিত্বকে অর্থবান করেছিলেন। তিনি অপেক্ষা করতেন স্বপ্নের জন্য। স্বপ্নই তখন ধ্যানাশ্রয়ী, ধ্যানই তখন স্বপ্নের অন্তর্গত।

জীবনের চাপ থেকেই স্বপ্নদর্শী মানুষের চিত্তবৈকল্য ঘটে। তিনি সর্বদা ঘোরে থাকেন। বৃদ্ধি, বৃদ্ধি বৃদ্ধি! কিন্তু কীভাবে! বলুন সদাপ্রভু কীভাবে! দাসী ইগারকে তুমি কোথায় লুকালে হে করুণাঘন আকাশ-প্রতিভা ঈশ্বর!

ভাবতে ভাবতে সেদিন যর্দনের জলে সূর্যাস্ত হল। অব্রাম দেখলেন রাত্রির আকাশ ধ্রম্রকুটিল এবং উনানের মতো পুড়ছে, যেন এক একটি চুলা সবেগে কোথায় ধাইছে, এই সব কি আদি উল্কাশ্রেণী! ভূ এবং খ কি এমনই অজ্ঞাত, কুটিল, চঞ্চল এবং ধাবমান? ওই আকাশ থেকেই তো ধুলা, ক্ষার এবং শিলা ও অগ্নি নিপতিত হয়। মাটি কাঁপে, নগর বিনাশ করেন প্রভু। মানুষ মাটিতে পুঁতে গিয়ে গন্ধক-মূর্তি হয়ে অচির প্রাণীর মতো দাঁড়িয়ে থাকে, প্রাণ যায়, প্রাণ থাকে না। মহাপ্লাবন হয়, নগর-গ্রাম তলায়, দুর্ভিক্ষ আর মারী একসঙ্গে আসে। ইঁদুরের লালমুখে ধ্বংস বহন করেন এল-ইলোহে।

কিন্তু অব্রাম আকাশে চলমান চুলাগুলি দেখতে দেখতে ভয়ে-ত্রাসে ঘুমিয়ে পড়লেন। ত্রাস সেকালে ঘুম আনত, ভয় আর লোভ আর জীবন-পিপাসা তাম্বুধারীকে শুষে নিয়ে স্বপ্নে প্রক্ষিপ্ত করত, স্বপ্নে নিয়ম আর পথ বাতলাতেন ঈশ্বর।

সদাপ্রভু অব্রামকে বললেন—আমি তোমাকে মিশরের নীল নদী থেকে মহানদী ফরাৎ অবধি সমস্ত ভূ-চরাচর তোমাকেই দিলাম, দিলাম তোমার বংশের জন্য। কেনীয়, কনিষীয়, কদমনীয়, হিত্তীয়, পরিষীয়, রফায়ীয়, ইমোরীয়, কেনানীয়, গির্গাশীয় এবং যিবুষীয় লোকদের দেশ তোমাকে দিলাম।

ভোরে জেগে উঠে অব্রাম দেখলেন, তিনি বেঁচে রয়েছেন, আকাশের রং শান্ত হয়েছে। তাঁবুর দোরে খুঁটা ধরে দাসী ইগার দাঁড়িয়ে, কোলে তার অব্রামের বংশ মচকা ফুলের মতো লাল।

একটি ছোট তাঁবুতে ঠাঁই হল ইগারের। মনিবের চোখে চোখ রেখে ইগার অব্রামের আকাঙ্ক্ষা দ্রব করে শুষে নিচ্ছিল। এই দৃষ্টি ঘন আর প্রণয়ে নিষিক্ত ছিল। অপরাধ এবং গর্ব এক হয়ে মিশে যাচ্ছিল আঠালো চাউনিতে।

কিন্তু আর বিশেষ সময় নিলেন না ঈশ্বর। স্বপ্নদর্শীকে ফের স্বপ্নে হানা দিলেন। বললেন—সারির যে স্ত্রীধর্ম আমি বয়সক্রমে নিঃশেষ করেছি তা আমি স্বল্পকালের জন্য ফিরিয়ে দেব এবং সেই ঋতুদৈবে ইসহাককে উৎপন্ন করব, তোমার এই ঔরসই তোমার বংশকে আখ্যাত করবে। দাসীপুত্র থেকেও এক জাতি উৎপন্ন করব, এই মাত্র।

ইগার কি জানত দেবদূতের ক্রীড়াভূমি আরবি মরু কী লীলায় আচ্ছন্ন করেছে তাকে আর ঈশ্বর মনুষ্য-মাংসে গেঁথে দিয়েছেন নিয়ম আর অভিপ্রায়। অব্রাম উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং দুর্জ্ঞেয়। ভাগ্যকে চওড়া করার জন্য তিনি মিশরে স্ত্রী সারিকে ভগিনী বলে চালিয়েছিলেন, স্ত্রী রূপকে তিনি জাদুর মতন ব্যবহার করেছেন। অবস্থাগতিকে মানুষ স্ত্রীরূপের ইন্দ্রজাল দেখিয়ে অন্যের হতে আশ্রয় আর সম্পদ দুইয়ে নেয়, বেদুইন মাত্রই কি এত সজাগ?

তবু এই মনিবকেই স্বামীরূপে ভালোবাসত ইগার। মনিবের বয়সের মাপে সে তো নিতান্তই বালিকা। এখনও তার স্ত্রীধর্ম নীল নদীর পলল-মৃত্তিকার মতো উর্বর। তার বাসনা শস্যদায়িনী দেবী ইস্তারের চেয়ে নিবিড়। ইস্তার আর ইগার শুনতে একই।

কেন অব্রামের কাছে ফিরে এসেছিল ইগার? দেবদূতের আশ্বাস বুকে নিয়েই তো ফিরেছিল সে। কিন্তু সেই দেবদূতরাই অব্রামের তাঁবুর সামনে এসে দাঁড়াল এবং বলে গেল সারি গর্ভ ধরবেন। হলও তাই।

দেবদূতরা অব্রামকে বলল—আমি তোমাকে অব্রাহাম বানাব, তুমি এক ক্ষুদ্র গোষ্ঠী-অধিপতি থেকে হয়ে উঠবে সমস্ত জাতির মহাপিতা, তুমিই হবে জগদপিতা অব্রাহাম। সারি হবে রানি (সারা)। সারা হবেন মহাজননী।

—আর দাসী ইগার, তার ভাগ্যের কথা বলুন মহাপ্রভু। আমি তাকে ঠিক কতটুকু ভালোবাসব?

—ইগার স্ত্রী সমতুল্য হলেও দাসী মাত্র, তাকে তুমি প্রায় মাগনাই পেয়েছ, সারির রূপে মুগ্ধ হয়ে ফরৌন তাকে উপহার দিয়েছে, তোমার ভালোবাসার জন্য সে জন্মায় নাই। তবু ইগারকেও আমি ফলবতী করব, দাসীপুত্রের বংশে বারো জন সারগন (মহারাজা) উৎপন্ন করব। তোমার চোখেরই সামনে আবাদ করবে ইশ্মায়েল। কিন্তু দাসীর প্রেম যাযাবরের পক্ষে বাড়তি বোঝা অব্রাম। দুঃখ করো না।

—ইশ্মায়েল আমারই মাংস।

—হ্যাঁ, আমি সেই মাংসে আমার নিয়ম চিহ্নিত করব। যেন সে মরুমর্তে হারিয়ে না যায়। তুমি সবুর করো।

—শুধু ভালোবাসা পাবে বলে পলাতকা মিস্রিয়া আমার তাঁবুতে ছেলে কোলে করে ছুটে এসেছে মহাপ্রভু!

ঠিক এই সময় পাশের বৃহৎ তাঁবুতে সারির গর্ভ-প্রসবের নাদ শোন গেল। ক্ষুদ্র এই তাঁবুতে এককোণে ইগার ইশ্মায়েলকে বুকে চেপে ধরে বড় অসহায় চোখে অব্রামের পায়চারী লক্ষ করছে। তাঁবুগুলির সামনের প্রাঙ্গণে অব্রাম কেমন বিচলিতভাবে এদিক ওদিক করছেন। একবার এ তাঁবুতে ঢুকে পড়ছেন, একবার বড় তাঁবুতে ছুটে গিয়ে খোঁজ নিচ্ছেন কী হল!

তারপর ইসহাক জন্মাল। এবং যেদিনই এই পুত্র সারির স্তন্যপান ত্যাগ করল, সেইদিনই মোড়ল অব্রামের সংসারে মচ্ছব বসল, খানাপিনার ধুম পড়ে গেল। অনেক ছাগ,

মেষ, উট্র বলি হয়ে গেল। সারি দাসীপুত্রের দিকে অপাঙ্গে চেয়ে দেখে ঠাণ্ডা সুরে বললেন—এই মুহূর্তেই ওই ছোঁড়াটাকে আর ওর মাকে বিদায় করা হোক।

দাসী ইগার ক্ষুদ্র তাঁবুটুকু পেয়ে ভেবেছিল, এ বুঝি স্থায়ী কিছু। তাঁবু পোঁতা যায়, আবার তার খুঁটা উপড়ে ফেলে গুটিয়ে ফেলাও যায়। তার পুত্রগর্বের স্থায়িত্ব তাঁবুর চেয়েও পলকা। অথচ মরুবিশ্বের প্রাচীন দাসী ইগার বেদুইন-ধর্ম-কিছুই বোঝেনি। মচ্ছবে সে-ও বিষণ্ণ চোখ মেলে অংশ নিয়েছিল, সে বাটনা বেটেছে, গমের রুটি পাকিয়েছে, খর্জুর কাঁদি থেকে খেজুর পাতে পাতে ভাগ করে বেঁটে দিয়েছে। তার ঘাগরায় হরিদ্রার দাগ, উড়নিতে সুরুয়া প্রলিপ্ত।

ইগার যেন কোন মেহমানের পাতে খানা দিচ্ছিল, এমনই সময়ে সারি এসে আচমকা পিছন থেকে তার চুলের পশ্চাৎ খামচে ধরলেন, কেশগাছ পাকড়ে ধরে টেনে আনলেন মহাভোজ থেকে অন্যত্র।

সারি বললেন—ঢের হয়েছে এবার বিদায় হও। তোর ছেলে আমাকে টিটকিরি দেয় দেখেছিস! ভেবেছে তাঁবুঅলার সম্পত্তিতে ভাগ বসাবে, অত সিধে নাকি! তুই যদি মুল্লুকদারি করবি তো লাল মরুভুঁইতে তাঁবু বাঁধগে যা, এই কালো মাটিতে তেড়ে এসে আমার ছেলের হক পয়মাল করতে চাস! এ আমি কিছুতেই হতে দেব না!

—তোমার বয়েস হয়েছে রানিদিদি, আমি তোমার সেবা করব, তোমার বাছাকে কোলে নেব, সংসার সামলে দেব তোমার, আমাকে বসত দাও রূপমতী, তাড়িয়ে দিও না। আমি কোনও হক চাইব না। আমি মিস্রিয়া বাঁদি বইতো না!

—তাহলে পালিয়ে গিয়েছিলি কেন মরুভূমিতে! এখন বলছিস কিনা ফরিস্তা তোর সঙ্গে কথা বলেছে, ছেলের নাম বাতলে গেছে। কূপের নাম দর্শনা। দাসীর খুয়াব তো, বানিয়ে বললেও দোষ নেই। যা, চলে যা। ফরিস্তা পথেই বসে আছে, ভয় কিসের! বলে সারি ফুঁসতে থাকলেন।

অব্রাম দেখলেন, ইগার মিথ্যা স্বপ্ন না বললেও দেবদূতের সব ইঙ্গিত বেচারি বোঝেনি। তার ঈশ্বর মরুভূমিতেই কোথাও অপেক্ষা করছেন.। এই হেথায় তার আশ্রয় নেই। ওই উৎসবের মধ্যেই দাসী বিদায় করলেন স্বপ্নদর্শী অব্রাম। ইশ্মায়েলের মায়ের মাথায় চাপিয়ে দিলেন রুটি, মাংস, খর্জুর আর জলপূর্ণ কুপা। ইশ্মায়েল কথাই শেখেনি ভালো মতো, এই ক্ষুদ্র বালক, ক্ষুত্র শিশুই সে, কাউকে টিটকিরি দিতে পারে! বুনো গাধাটা ভাষাই শেখেনি, ভাষার বক্রতা জানবে কোথা থেকে! যাই হোক, ইগারকে রাখতে পারলেন না অব্রাম।

যখন অব্রাম ইগারকে বিদায় দেবার জন্য জলভর্তি কুপা, এবং খাদ্যাদি ইগারের কাঁধে চাপিয়ে দিচ্ছেন তখন উৎসব উপলক্ষে সুসজ্জিতা দাসীর শরীর থেকে এক অতীব মাদকতা পূর্ণ সুগন্ধ ভেসে এল। মিস্রীয় আতর। মেয়েরা কখনও কখনও এমনই অক্ষয় আতর গোপন কাষ্ঠপেটিকায় লুকিয়ে সঙ্গে রেখে দেয়। অবশ্য এমনটি কেবল মিস্রীয় নারীই পারে, কারণ এমন আতরীয় সভ্যতা অন্যের জানা নেই। পূর্বদেশীয়রা আতরের এই

জাতের সূক্ষ্মব্যবহার কখনও শেখেনি। শিকড়কে ঘষলে এই সুগন্ধ মহকে উঠত।

নীল নদী মিশরীয়দের জন্য সদাপ্রভুর দান, এই নদীতীরের নগরে বন্য আতর জন্মায়। আতরের এই বিশেষ গোপনীয়তার মধ্যে এবং ব্যবহারে নীল নদীর স্মৃতি মিশে থাকে। আতর অতি প্রাচীন দ্রব্য, সভ্যতার সকালবেলা এর আবিষ্কার। নরদেবতা কাবুসের দেশে মৃতদেহ মমি করার জন্য বৃক্ষলতাগুল্মাদির ভেষজ ব্যবহার ছিল, তখনই পুষ্প, বৃক্ষবল্কলশিকড়ের নির্যাস সম্বন্ধে মানুষের চৈতন্য অধিক উর্বর হয়। তার আগে থেকেই নির্যাসকে মানুষ চিনতে শেখে, সেই গন্ধকে বৃক্ষত্বক এবং পুষ্প ও শিকড় থেকে আলাদা করে টেনে নিতে না শিখলেও সুগন্ধী-শিকড়কে সঙ্গে রাখতে পছন্দ করত। একটি সৌরভময়ী বৃক্ষের ত্বক বা শিকড় ইগার সঙ্গে করে এনেছিল নীল নদীর বসতি থেকে, কাবুসের দেশ থেকে। ইগার মরুভূমিতে নির্বাসিত হল, কিন্তু একটি শুষ্ক অথচ অক্ষয় বৃক্ষঘ্রাণ ছড়িয়ে রেখে গেল অব্রামের তাঁবুতে। যেদিন কাবুস ইগারকে উপহার দেয়, সেদিনই প্রথম এই গন্ধের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় অব্রামের। তাম্বুধারী পশুপালক বেদুইনের পক্ষে এই সুগন্ধি এক বিশেষ অভিজ্ঞতা।

কিছুতেই এই গন্ধকে মনের ভেতর থেকে তাড়াতে পারেন না অব্রাম। পাগলের মতো তিনি তাঁর সবচেয়ে বলবান উটের পিঠে ডেবে বসে মরুমর্তে ছুটে বেড়ালেন। উটের গলা শূন্যে আকুল আন্দোলন তুলে এল্-ইলোহের পানে মুখ তুলল। আবার ছুটতে লাগল। সুরের পথ ধরে ছুটল আত্মত্যাগিদে অব্রামের বিপুলাকায় উট, যেন উন্মাদ চলেছে। শুষ্ক অথচ অক্ষয় বৃক্ষঘ্রাণ কী মদির, কী বাঙ্ময়, কী জাদুকরী, কী তীব্র।

দর্শনা কূপের এলাতলে এসে দাঁড়াল উট। ইগারের সজল চোখ দু'টি এখানে কোথাও নেই।

গলা শুকিয়ে কাঠ। ইশ্মায়েল আর পারছে না। এতটুকু বাছা, একেবারে সরল বুনো গাধা। এই শৈশবেই যেন পলেস্টীয় ডাকাত! হাতে পায়ে প্রচণ্ড জোর, লাথি মারলে এখনই মরুমর্ত ডেবে যায়।

তারপর মা আর ছেলে কোথায় এল? দর্শনার পথ এবার মাড়ায়নি তারা। ইগারের মতি বড়ই বিচিত্র। তাঁবু থেকে বিতাড়িত হয়ে পথে যেতে যেতে ভেবেছে দর্শনায় গেলে মোড়ল যদি সত্যিই খোঁজ করে কখনও? তাই কি করে নাকি কেউ? আপন ঔরসের পুত্তলি পেয়েছে গোষ্ঠীবাবা, সঙ্গে রয়েছে রাজেন্দ্রানী সারা, তবে আর কিসের তাড়না। ইগার তবু ভেবেছে, যদি আসে!

বীরশিবা পৌঁছে ইগার দেখল, কোথায় দিব্যকূপ, এ তো অতীব নীরস স্থান! একটি খাটো ধূসর পাহাড় বর্ষার পানি না পেয়ে খড়ি উঠিয়েছে গায়ে। উপত্যকাটিও ঊষর, নেড়া। এরই নাম বীরশিবা অথবা বের-শেবা। বিশ্বাসই করা যায় না, এই স্থানটাই সেই স্থান, যেখানে গোষ্ঠীপিতা অব্রাম পলেস্তীয় সর্দার অভিমালিকের (অবিমেলক) সঙ্গে বিবাদ-নিষ্পত্তি করে সন্ধি করেন। শোনা যায়., এখানে একটি উষ্ণ-প্রস্রবণযুক্ত সুন্দর কূপ আবিষ্কার করেছিল অব্রামের গোপাল-লাঠিয়ালরা কিন্তু সেটি অভিমালিকের দাসেরা জবর-

দখল করে নেয়, তাই নিয়ে অব্রামের কথা কাটাকাটি চলে সর্দারের সঙ্গে। মহৎ সর্দারটি কূপের দখল ছেড়ে দেয় শর্তবিশেষে। বেশ কিছুসংখ্যক গরুমেষ অভিকে উপঢৌকন দেন অব্রাম, তারপর বলেন—মহাশয় এই আমার বাঞ্ছা যে, আপনি এইসকল গ্রহণ করুন, আমার খোঁড়া কূপ আমার দখলে থাক, দখল আর কী, আমার নামটা মুছে যেন না যায়, নামটা আমি দিচ্ছি বের-শেবা, অর্থাৎ কিনা কিরে-কসম হল, তাই এটি দিব্যের কূপ অভিধায় রইল।

স্বামীপ্রতিম মনিবকে কি কিছুতেই ভুলতে পারছে না দাসী ইগার! কেন সে টুঁড়তে টুঁড়তে এখানে এসে থামে? তার পোড়া পা কি অন্য স্থল দেখতে পায় না? মরু-যাযাবর অব্রাম তো সত্যিকার কোথাও কোনও দখল পাননি। একটুখানি নামের জন্য প্রার্থনা করেছেন যেখানে, মিস্রিয়া দাসী যে সাধের খোকনকে নিয়ে সেখানেই পৌঁছবে মরু-ঈশ্বর কি তা জানতেন?

কিন্তু সেই দিব্যকূপ কোথায়, শুধু নামটাই বলে গেল, এই হেথা বলে চলে গেল পশুপাল খেদানো বালকেরা। এই শূন্য প্রান্তরে রাত্রি নামল। মরুভূমির শীত ডাকাতেরও নাক কেটে দেয়। আগুন জ্বালাবার নাড়াপোয়াল কি খড়, হেথা কিছুই নেই। রাত্রি কী করে পোয়াবে ইগার?

যদি এখানে কূপটা সত্যিই থাকত, তাহলে উষ্ণ জলের আঁচে রাত্রির শীতকে কোনও মতে ঠেকিয়ে দিত তারা। একটি জ্বলজ্বলে বৃহৎ তারা ইশ্মায়েলের ঠিক মাথার উপর যেন নেমে এসেছে। তেষ্টায় চিৎকার করতে করতে মাটির উপর ভয়ানক দাপাচ্ছে, তার লাথির চোটে পায়ের তলার পাথুরে মরু কিছুটা ডেবে যায় সহসা। বুনো গাধাটা যে সদাপ্রভুর কান, ওর চিৎকার কি এল্ শুনবেন না?

পায়ের কাছে ঝুঁকে নেমে ছোকরা অবাক হয়, কেমন গরম আর ভেজা। ইশ্মায়েল অতি উল্লাসে কোমর বেঁধে দাপাতে থাকে। তার পক্ষে আপাতত অল্প মেহনতেই কাজ হয়। উষ্ণ জলের দেখা মেলে। গর্ত মতন হয়েছে, তলে এক মরুবিস্ময় অপেক্ষা করে রয়েছে। জলরুটি পেটে পড়বামাত্র দস্যি ছেলে কূপটাকে সারা রাতের চেষ্টায় আকাশের তলে উদোম্ করে দেয়, রাতভর মাথার উপরকার তারা নেবে না।

নৈঋতের ভূমধ্যসমুদ্রের কালো মেঘ খাড়া হয়ে ছুটে আসে শীতের শেষে গ্রীষ্মের পাহাড়ে। বর্ষা নামে। সবুজ হয়ে ওঠে বীরশিবার পাহাড়-উপত্যকা, প্রান্তর। ইশ্মায়েল একদিন প্রান্তরে হারিয়ে যাওয়া একটি গর্দভীকে দেখতে পায়, পাহাড়ের খাঁজে পড়ে আটকে পড়েছে। সেটিকে উদ্ধার করে সে। গর্দভী যমজ বাচ্চা প্রসব করে ইশ্মায়েলের জন্য। এই ঘটনা ঘটে বীরশিবার বসতি গড়ার তিন বছরের মধ্যে। ইশ্মায়েলের গতর লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ে।

ওই পাহাড়ের খাঁজে আরও দু'বার পশু পেয়েছে ইশ্মায়েল। তাদের পালাপোষা করছে মা ছেলে। এভাবে ধীরে ধীরে তারা সমৃদ্ধ হচ্ছে। পাহাড়ে লুকিয়ে থাকে ছোকরা। মা তো খুঁজে হয়রান। মায়ের সঙ্গে লুকোচুরি খেলায় বয়স বাড়ে পুত্রের। পাহাড়ের ওই

খাঁজে একবার ইশ্মায়েল একটি দুর্ধর্ষ জীবকে দেখতে পেল।

কালো কুচকুচে গা। দারুণ গতর, চকচক করছে। লেজটার গোছ ঝলমল করছে। অতি কষ্টে ঘোড়ার বাচ্চাটাকে সামলে তুলে আনে ইশ্মায়েল। এটা পাগলা ঘোড়া। এটি বাচ্চা। কোনও হিব্রোনীয় পাহাড়ি লোকরা অশ্ব তাড়িয়ে এই উপত্যকা পেরিয়ে গেছে। ওই উত্তরের সুদূর পাহাড় পেরিয়ে হালিস নদীর উপত্যকায় চলে গেছে, একেবারে কৃষ্ণ সমুদ্রের কোলে। বাচ্চাটাকে ছেড়ে চলে গেছে, এই ভুলোটা মাথা দোলাতে দোলাতে, লাফাতে লাফাতে নিশ্চয়ই খাঁজে পড়ে গেছে।

মরুভূমি মানুষকে নদী দিয়েছে, কূপ দিয়েছে, উদ্যান-উপত্যকা দিয়েছে। এমন চমৎকার ঘোড়াও দিয়েছে। দ্রাক্ষা, খোবানি, ডুমুর, তমাল-খর্জুর কী নেই এখানে! খানিক দুরেই পরান-প্রান্তর, মাটি কালো, পাহাড়ের বর্ষার ঝোরা জল গড়িয়ে পড়ে। অশ্বকে পোষ মানাতে পারলে কানে খোকা স্বর্ণকুণ্ডল পরবে, ধনুর্ধর হবে, ভাবে ইগার স্বর্ণকুণ্ডলই হবে ইশ্মায়েলের তেজের চিহ্ন। মোড়ল তো উট খেদায়, অশ্ব চেনেই না।

বয়স যখন তেরো, কেবলই তেরোতে পড়েছে ইশ্মায়েল, ঠিক তখন মরুদিগন্তে দূরে একদিন একটি দীর্ঘকায় উট গলা তুলল। এই উট দেখলেই ইগারের মন আনচান করে। ক্ষুদ্র বালিঝড়ে দিগন্ত ঝাপসা। তবু এদিকেই এগিয়ে আসছে উটের গ্রীবা। কখনও কি আসবে সেই মানুষটা, স্বপ্নদর্শী প্রায় বৃদ্ধ মনিব, সেই উচ্চাকাঙ্ক্ষী দুর্জ্ঞেয় মানুষ-বিধাতার সমকক্ষ তাম্বুধারী, সেই তৃষ্ণার্ত মরুচারী যাযাবর!

সত্যিই উপস্থিত হলেন অব্রাম। চোখে তাঁর ব্যথিত তৃষ্ণা,ঘর্মাক্ত মুখে গভীর উদ্বেগ আর বিষণ্ণতা, কতকাল যেন তিনি ঘুমাতে পারেন না। কেমন যেন বিধ্বস্ত নমনীয়তা পবিত্র চোখে ছলছল করছে। মাথার পাগড়ি ধুলিধূসর, দাড়ি বালুকা-পীড়িত, গায়ের বস্ত্রখানি বালিরই রেতে মলিন। মনেই হয় না, ইনিই স্বপ্নদর্শী অব্রাহাম। স্বপ্নই তাঁকে মতবাদ দান করে, জাতিভাষা জোগায়, কীসের তাড়না শুধু, কিসের তাগিদে বীরশিবার এই পরিত্যক্ত দাসীকে খুঁজে ফেরা?

—তুমি ভালো আছ? মুখে কেন শুধুমাত্র এই সহজ কথাটি এসে পড়তে চাইছে। কেন ইগার বলতে পারছে না, আবার কেন, যাকে রাখতে পারোনি, তাড়িয়ে দিয়েছ, তার কাছে কী চাও, কেন এসেছ? তোমার দেওয়া নামটাই খালি ছিল, এই কূপ বুজিয়ে দিয়েছিল কারা, দাসীপুত্র তাকে জাগিয়েছে, তবু কি এখান থেকে তাড়িয়ে দিতে চাও আমাদের?

ভয় এবং ভালোবাসার এমন জোড়া আঘাত দাসী কখনও সহ্য করেনি। কে তাকে এমন করে মারছে!

মনিবকে কোলে আশ্রয় দিল ইগার, মাথাটা কোলে তুলে নিয়ে সস্নেহে শুধালো—কী স্বপ্ন দেখে এমন করে ছুটে এসেছ তুমি?

—হ্যাঁ, ইগার! তোমার কাছে এভাবে রাত কাটবে, আমি সেই শিকড়ের গন্ধটা আবার পাব ভাবতে পারিনি! ভাবছিলাম, ইশ্মায়েল আমারই মাংস। তাই না?

—তো? অবাক চোখে মনিবের মুখের কাছে তাড়ির গেলাস আনে ইগার। দ্রাক্ষারসে মেশানো খর্জুর তাড়ি অত্যন্ত সুস্বাদু ঠেকে অব্রামের। তিনি দাসীর বিস্ময় নিবৃত্ত করেন চুম্বনযোগে এবং বলেন—দেখো ইগার, সদাপ্রভু বলেছেন, তিনি আমার মাংসে নিয়ম গাঁথবেন, যেমন ধরো কাঁচি দিয়ে আমরা পশুর পিঠের লোম কেটে চিহ্ন দিই, এইগুলি আমার, তাই না, সেই রকম...

—সেই রকম কী?

—ব্যবস্থাটা হল, যাতে ইশ্মায়েল মরুভূমিতে হারিয়ে না যায়!

—বুঝলাম না!

—তুমি জেদ বা অবিশ্বাস কোরো না। কথা দাও, আমার উপর তোমার...

—বিশ্বাস করি গোষ্ঠীপ্রভু, তুমিই আমার সর্বস্ব।

—তাহলে কাল ভোরেই ছেলেকে নিয়ে যাই, ওর মাংসে সদাপ্রভুর অনুজ্ঞা চিহ্নিত হোক। কী বলো?

—কীভাবে?

—তুমি চাও না, সে আমারই হোক!

—চাই! বলে কেমন অজানা আশঙ্কায় মুখে আঁচল চেপে কেঁদে ফেলল দাসী ইগার।

ইশ্মায়েলকে উটের পিঠে বসিয়ে ঊর্ধ্ববেগে ভোরে উটকে ছুটিয়ে দিলেন অব্রাম। তিনি নিজের এবং পুত্র ইশ্মায়েলের একই দিনে একই সঙ্গে লিঙ্গাগ্র ত্বক ছেদন করলেন হাজাম দ্বারা।

লিঙ্গাগ্রের ক্ষত শুকিয়ে উঠতে না-উঠতেই ইশ্মায়েল তার মায়ের কাছে বীরশিবা পালিয়ে এল, ওর চোখে স্বপ্ন সে কালো ঘোড়াকে তাঁবে এনে পিঠে চড়ে দিগন্তে উড়ে যাবে। কানে দুলবে স্বর্ণকুণ্ডল। বাপের মাংসচিহ্ন ছাড়া সে কীই বা পেয়েছে! সে যেন গুনতিতে পড়ে তাই এই ব্যবস্থা! কী জানি, বাবা হয়তো তাকে ভালোও বাসেন।

ইগার বুঝেছিল মাংসের চিহ্নই যথেষ্ট, একটা কসিতাও বাপের থেকে পাবে না বেচারি ইশ্মেল!

তবু কী বোকা দাসী ইগার, এই চিহ্নের জন্যও তার গর্ব হল। কিন্তু এক বছর ঘুরতে না ঘুরতেই সশরীরে উপস্থিত অব্রাম তাঁর নির্বাসিতার কাছে। এবার সঙ্গে এনেছেন কিছু পোষা দাস এবং তিনখানা গো-শকট। মরুস্থলী থেকে তাঁবুর কালো দেশে নিয়ে যাবেন ইগারকে। এই রকম সমাদর কেন?

মুখ খুলতে চাইছেন না জাতির জনক অব্রাহাম। তাঁর চাউনি কেমন মরু-কুয়াশার মতন দুর্বোধ্য এবং উদ্ভ্রান্ত, মানুষটা বুঝি পাগলই হয়ে গেছেন। শকটের মধ্যে চুপচাপ বসে রয়েছেন। এই গো-যানে ইগার ছাড়া অন্য কোনও প্রাণী নেই। একটি কাফেলা চলেছে এগিয়ে। সব শেষে চলেছে অব্রাহামের এই গাড়ি, যার চালক অবধি নেই। দলকে আপনা থেকেই অনুসরণ করছে তাঁবেদার গো-যুগল।

এই গাড়ির পিছনে সেই নিঃসঙ্গ কৃষ্ণ অশ্ব। দড়িতে বাঁধা, গাড়ির সঙ্গে এবং অপূর্ব বাধ্য পশুটা।

—ইগার! বলে কেমন চাপা আর্তনাদ করে ডেকে উঠলেন অব্রাহাম। ইগার মাথা নিচু করে বসেছিল, মনিবের অদ্ভুত এই ডাকে সে আঁতকে উঠল। শকটের ছইয়ের পিছনে অশ্বের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রয়েছেন আগামী দিনের জাতির মহাত্মা। ঠোঁট দুটি তাঁর থরথর করে কাঁপছে।

মনিবের চোখে আর্ততৃষ্ণায় চেয়ে রইল ইগার। ঠোঁট কাঁপছে স্বপ্নদর্শী মানুষটির। কোনও প্রকারে পাগলের মতো উচ্চারণ করলেন—দখল!

—সদাপ্রভু তোমাকে অনেক দিয়েছেন, তোমার অনেক তাঁবু, অনেক পশু, দাসদাসী অনেক।

—কিন্তু দেশ! আমার দেশ চাই। সদাপ্রভু বলেছেন, এই সব আমার। এই ভূমরু, চরাচর, কতকাল ধরে বলে আসছেন। হিব্রোনের এলোন বনে দেখা দিয়ে এবার বললেন, বলিদান কর অব্রাহাম। এই যতদূর দৃষ্টি কর, যত দূরে সূর্য যায়, সবই তোমার। উৎসর্গ কর তোমার প্রিয়তম জীবকে। তোমাকে পরীক্ষা দিতে হবে অব্রাম!

—তোমার অনেক আছে প্রভু।

—আমার প্রিয়তম কে, ইগার তুমি বলে দাও!

—তোমার প্রচুর পশু, অনেক সম্পদ হয়েছে মনিব।

—বলি দিয়েছি অনেক, শত শত। আত্মার শান্তি মেলেনি মিস্রিয়া। সদাপ্রভু আমাকে স্বপ্নে তাড়িয়ে ফিরছেন, দাও দাও, আরও দাও। ভেবে দেখ কে তোমার প্রিয়তম।

—তোমার অফুরন্ত রয়েছে প্রিয়তম। বলে ফুঁপিয়ে উঠল ইগার। আকাশে সূর্য ঢলেছে।

পিছনে একা একা মাথা দোলাতে দোলাতে এগিয়ে আসছে পাগল ঘোড়াটা।

—আমাকে তুমি প্রিয়তম বললে ইগার!

—সদাপ্রভু আমার হৃদয়কে সংযত করুন, আপনি ক্ষমা করুন, আমি লোভী, এই নির্জনতায় বেয়াদবি করলাম। নির্বাসনে থেকে আমি অন্তরে ক্ষুধার্ত হয়েছি গোষ্ঠীবাবা, আমি দাসী বই তো নই!

—আমার প্রিয়তম কে ইগার?

—আমি নই।

—ইশ্মায়েলকে আমার চাই ইগার! চাইতে গিয়ে অব্রাহামের গলা কেমন গাঢ় আর ফ্যাসফেসে হয়ে ভেঙে গেল।

—না, না, এ আমি কিছুতেই পারব না। আমাকে নামিয়ে দাও।

—সদাপ্রভু খাদ্য চান ইগার। আমি জানি, তোমার পুত্রই আমার প্রিয়তম।

—এ চিত্তভ্রম তোমার, তোমার স্বপ্ন এত নিষ্ঠুর হতে পারে না। আমি এই মাত্র জীবনে এই প্রথম তোমাকে প্রিয়তম বলে ডেকেছি, এই লোভকে ক্ষমা করে দাও। আবার

বলছি, আমি দাসী, আমাকে মরুভূমে ফেলে দাও, ছেলেকে নামিয়ে দাও! বলে ডুকরে উঠল দাসী ইগার। অথচ সে গো-শকট থেকে নেমে পড়তেও পারল না।

তাঁবুমণ্ডলে পৌঁছে কাফেলা থামল। রাত্রির আকাশে লালমুখো নক্ষত্ররা উড়ে বেড়াতে থাকল। যেন এক একটা উনুন চলে যেতে থাকল এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত। দাসী ইগার তার সাধের পুত্রকে সকালবেলায় স্নান করালো, নতুন পোশাক পরাল।

বন্যগর্দভস্বরূপ মনুষ্য-বালক হাসতে হাসতে স্নান করল। নতুন পোশাকে অত্যন্ত খুশি হল। ইগার পুত্রের শরীরে লিপ্ত করে দিল তার গোপন ক্ষুদ্র কাষ্ঠপেটিকায় সুরক্ষিত শুষ্ক অথচ অক্ষয় বৃক্ষত্বকের নীল সুগন্ধি। এ এক আশ্চর্য গন্ধমদির সুপ্রভাত। ইগার পুত্রকে চুম্বন করে ছেড়ে দিল। এবং বলে দিল—বাবা যা বলবেন, তাই করবে।

বাবা অব্রাম পুত্র ইশ্মায়েলের স্কন্ধে চাপিয়ে দিলেন হোমকাষ্ঠ। নিজে হাতে নিলেন অগ্নি আর খড়গ। ইগারের চোখ দু'টি মরু-শুকতারার মতো সিক্ত স্নিগ্ধতায় পবিত্র, অনিদ্রা-যাতনায় এবং পতিপ্রেমে উদ্ভাসিত, মনিবকেই সে স্বামী বলে জানে এবং জানে অব্রাম আজ অব্রাহাম হতে চলেছেন—মরু-অধিকারে সব দিতে হয়।

ইশ্মায়েল কেন খুশি তা সে নিজেও জানে না। একটু-আধটু বুঝতে পারছে মারি পর্বতে বাবা তাকে সদাপ্রভুর কাছে নিয়ে যাচ্ছেন, সেখানে বলিদান হবে। কী সে বলিদান, তা সে জানবে কী করে? কত পথ হাঁটতে হবে, কত দূর সেই পাহাড়, কত দূর উঁচু? বাবা তাকে নিয়ে সেখানে উঠবেন। বাবা কত দূর উঠতে চান। লম্বা মানুষরা কি শুধুই উপরে উঠে থাকেন? এই সমতলে কি বলিদান হত না!

পিছন পিছন পাগলের মতো ছুটে আসতে থাকল পুত্রবতী মিস্রিয়া রমণী ইগার। সে দেখল, সারা তার ছুটে যাওয়ার পাগলামি দেখে খিলখিল করে হেসে চলেছে। নিষ্ঠুর সেই আনন্দ ইগারকে ভেতর থেকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছিল। ইগার আর অগ্রসর হতে পারল না, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে সারার হাসির উত্তরে অদম্য বেগে পাগলের মতো হেসে উঠল। তারপর মাটিতে পড়ে গেল।

ছেলেকে নিয়ে পাহাড়ে উঠতে থাকলেন অব্রাহাম। ছেলে পরিশ্রান্ত হয়েছে, হোমকাষ্ঠ আর কাঁধে করে বইতে পারছে না। বললে—আমরা তেষ্টা পেয়েছে বাবা। দেখ, আমি কেমন ঘেমেনেয়ে যাচ্ছি। তোমার কষ্ট হচ্ছে না?

—তা হচ্ছে খোকা! কিন্তু বলিদান যে করতেই হবে। নাও, জল খেয়ে দম নিয়ে আবার ওঠো!

—বলিদানের পশুটা কোথায় বাবা! কথা বলছ না কেন?

—সে ঠিক আসবে ক্ষণ বাপু, এখন চলই না!

ঈশ্বরের নির্দিষ্ট স্থানে পুত্রকে নিয়ে পৌঁছনোর পর অব্রাহাম একটি পাষাণের দিকে দেখিয়ে কী যেন নির্দেশ করলেন। ইশ্মায়েল বুঝতে পারল না আঙুল তুলে বাবা তাকে কী বলতে চাইছেন। সরলচিত্ত বালক শুধালো—কী করব বাবা?

অব্রাহাম থরথর করে কাঁপছিলেন। তাঁর হাতের খড়্গ সূর্যালোকে চকচক করছিল।

ভাবছিলেন, এই মরুমর্তে এক বালক তারই হোমার্থ বলিদানের কাঠ নিজের কাঁধে করে বয়ে এনেছে, হাঁপিয়ে পড়েছে, পাহাড়ের খাড়াই ঠেলে উঠতে তার জিহ্বা ঝুলে পড়েছে, তবু সে কিছুই বলেনি বাবাকে। কোনও ওজর তোলেনি। জননী তাকে বলে দিয়েছে, বাবা যা বলবেন, তাই করবে।

অব্রাহাম বললেন—ওই পাথরের উপর শুয়ে পড়ো, তারপর গালাটা একটু বাইরে ঠেলে ঝুলিয়ে দাও, এটাই হোমের বেদী ইশ্মায়েল।

—আর পশুটা, বাবা?

—তুমিই তো সেই গর্দভ-মনুষ্য ইশ্মায়েল, সদাপ্রভুর দূত তোমার এই বিবরণ দিয়েছেন তোমার জন্য, তুমি ঠিক তাইই হয়েছ।

ইশ্মায়েলের মুখটা এই এতক্ষণে মুহূর্তের জন্য কেমন ম্লান হয়ে গেল। তারপরই এই আশ্চর্য বালক আকাশে চোখ তুলে চাইল। তার সুর্মা-অঙ্কিত চোখ দু'টি সামান্য ছলছল করে উঠল। ক্ষণিকের জন্য তার প্রাণে ভয়ও দেখা দিল। একবার সে ভাবল, ছুটে পালাবে নিচের দিকে, বুড়ো বাবা তাকে ধরতেই পারবেন না। কিন্তু মা? মা যে বলেছেন, বাবা যা বলবেন তাই যেন করি। মায়ের অবাধ্য হলে সদাপ্রভু প্রাণে ব্যথা পান। তা ছাড়া আমি কি সবখানি ঠিক মানুষের মতো? আমার আর ঘোড়ায় চড়া হল না। নাই বা হল, ইসহাক তো রইল, হাত্তির (হিটাইট)ঘোড়া ঠিক ওর বশ মেনে যাবে। হালিস নদীর ঘোড়াটা তাঁবুর খুঁটায় বাঁধা রইল হে ঈশ্বর!

পাথুরে পাটাতনের কাছে এগিয়ে এল ইশ্মায়েল। তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে সুন্দর করে নিঃশব্দে হাসল, সেই হাসি জ্ঞানীরা হেসে থাকেন, তখন তাকে আর বনগর্দভ বলে মনে হল না। অব্রাহাম বালকের শরীর থেকে অক্ষয় বৃক্ষের সুঘ্রাণ পেলেন। স্নেহে আর প্রেমে তাঁর শরীর সিরসির করে উঠল।

তিনি চিৎকার করে উঠলেন—আমি পারব না ইশ্মায়েল। তুমি নও, তুমি নও!

পাষাণের উপর শান্ত মনে বসে পড়ল ইশ্মায়েল। তারপর বলল—তা হলে কে বাবা?

—ইসহাক। আইজাক, আমার প্রিয়। আমি এখনও স্থির করতে পারছি না ইলোহে!

—আমি তোমার কেউ নই বাবা!

—তুমিও প্রিয়। তুমি নেমে এসো। উৎসর্গের অনেক দাম ইশ্মায়েল, তোমার মাকে আমি নির্বাসন দিয়েছিলাম কেন জানো! তুমি বুঝবে না, মানুষের ইতিহাস কী কুটিল, কী দুর্বোধ্য!

—আমি শুয়ে পড়েছি বাবা। দ্যাখো, আমি হাসছি।

—না, তুমি নও, হাসি যার নাম, সেই ইসহাক, আমার প্রিয়তর, তোমাকে আমি ভালবাসিনি, তোমাদের ভালবাসিনি কখনও। দাসীপুত্র ইতিহাস হবে, এই খড়্গ তা সহ্য করে না প্রিয়তম।

বলতে বলতে আকাশ ভেদ করে কেঁদে উঠলেন অব্রাম; সেই মুহূর্ত আসন্ন যখন তিনি অব্রাহাম হয়ে উঠবেন। মনে মনে তিনি অব্রাহাম হয়ে উঠলেও, ঈশ্বর প্রকাশ্যে এখনও সেই উত্তরণ অনুমোদন করেননি। কাল আসন্ন, মরুমর্তে ঝড় বইছে। সেই বায়ুবিক্ষোভে ইতিহাসের দুর্বোধ-কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে।

চোখ বুঁজে জ্ঞানীপুত্র ইশ্মায়েল পাষাণে শায়িত এবং প্রস্তুত। পিতাকে আহ্বান করে বলল—তুমি চোখে পট্টি বেঁধে নাও অব্রাহাম।

অব্রাম চমকে উঠলেন, এ কার কণ্ঠস্বর! এ কি সদাপ্রভুর নির্দেশ? বুঝতে না পেরে উদ্‌ভ্রান্ত পিতা নিজের চোখে কাপড়ের পট্টি বাঁধলেন। তারপরই তাঁর মনে হল, আমি কি অন্ধ? কিসের অন্ধত্ব? কামনা আর আকাঙ্ক্ষা কি মানুষকে চোখে পর্দা টাঙিয়ে অন্ধ করে, আমি কি নিজেই এই অন্ধত্ব রচনা করিনি? সারি যে সারা (রানি) হতে চায়, উত্তরাধিকার চায় তার সন্তানের, এই মরুবিজয় চায়, ইতিহাস হতে চায়। তার প্রতি আসক্তিই কি সেই অন্ধত্ব, আমি কী করছি নিজেই জানি না!

খড়্গ তুললেন মাথার উপর অব্রাহাম, তাঁর সর্বাঙ্গ কম্পমান হল এবং বিবশ হয়ে এল। বিড়বিড় করে বললেন, এই মরুতে এখনও আমি সাড়ে তিন হাত ভূমিই অধিকার করতে পারিনি, কেউ মরলে সমাধির জন্য মানুষের পায়ে পড়তে হবে, মাটি চেয়ে ফিরতে হবে মানুষের দ্বারে দ্বারে। সেই আমি পুত্রকে হত্যা করছি, কেন?

শেষ অবধি পারলেন না অব্রাম। খড়্গ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাটিতে নতজানু হয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে মহা আর্তনাদ করে উঠলেন—এই অধীনকে তুমি ক্ষমা করে দাও প্রভু। আমি আর একবার চেষ্টা করব, আর একটিবার! বলতে বলতে অব্রাম লক্ষ করলেন তিনি তাঁর অন্ধত্বকেও বুঝতে পারছেন না, দু'হাতে মুখ ঢেকেছেন কেন? তাঁর দৃষ্টিই তো কাপড়ে নিবদ্ধ, কাউকে, কিছুকে তিনি দেখছেন না। তাঁর লজ্জা কিসের!

এমন সময় আকাশ-প্রতিভা মহাকাশ থেকে বললেন—তুমি চোখের আচ্ছাদন উন্মোচন কর অব্রাহাম। তোমার পরীক্ষা শেষ হয়েছে। এই দেশসমূহ তোমাকে দিলাম। তুমি এখন ঝোপে আবদ্ধ একটি মেষকে দেখো, তাকেই হোমার্থ বলিদান দিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাও।

চোখের কাপড় সরিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে পুত্র ইশ্মায়েলকে বুকে টেনে নিলেন অব্রাহাম আর তখনই তাঁর হৃদয় অব্যক্ত কষ্টে মোচড় দিয়ে উঠল। তাঁর মনে হল আমি যার পুত্রকে কোল থেকে টেনে এনেছি এই ঐতিহাসিক পর্বতে সেই জননী দাসী ইগারকে কী বলব?

একেবারে ভেঙে পড়লেন অব্রাহাম, চিৎকার করে বলে উঠতে চাইলেন—আমি পারিনি ইগার, দেখো আমি পারিনি! ধীরে ধীরে এই কথাই স্ফুট হয়ে উঠল মহাপিতার কণ্ঠে, তিনি অতঃপর পাগলের মতো করতে থাকলেন।

পিতার চোখের অশ্রু মুছিয়ে দিয়েই ইশ্মায়েল অব্রামের বাহুবন্ধনী ঠেলে বেরিয়ে এল, তারপর তীরবেগে পাহাড় ছেড়ে ছুটে যেতে লাগল। তাম্বুস্থলীতে এসে মাকে সে

খুঁজে পেল না। সে ভয়াভহ্ আর্তচিৎকারে মাকে ডেকে আকাশ মথিত করল।

কোথায় মা? কোথায় দাসী ইগার? অশ্বপৃষ্ঠে চেপে বসল ইশ্মায়েল। অব্রাম অব্রাহাম হয়ে উষ্ঠযোগে মরুদিগন্তে চাইলেন, 'আমি যে পারিনি ইগার, বিশ্বাস কর, আমি হত্যা করিনি মিস্রিয়া', এই কথাটুকু বলার ছিল যে তাঁর!

কিন্তু তামাম আদিপুস্তক খুঁজলাম আমরা। কোথায়ও আর ইগারকে তালাশ করা গেল না। মরুতে নির্বাসিতাকে মরুভূমিই তবে কোথাও লুকিয়ে ফেলল, এসো আমরা অশ্বারোহী ইশ্মায়েলের স্বর্ণকুণ্ডলের ছটায় তাকে খুঁজি।

ছোটগল্প

চালকুমড়োর গায়ে চুন পড়তে শুরু করেছে। এ বার মজু পাগলকে বার-উঠোনে হঠাৎ একদিন দেখা যাবে। কুমড়োর গায়ে গোয়ালের পড়ে থাকা মুড়ো ঝাঁটার খিল দিয়ে সে এসে লিখে রাখবে, মজু হ্যাজ কাম। আই অ্যাম নট এ থিফ। নট এ ম্যাড অ্যাট অল। আই অ্যাম এ পি পি, আই হ্যাজ এ হুইপ, বাট হ্যাভ নো হর্স।

তারপর সে লিখবে সত্যমেব— জয়তে—। মানুষটা ৬ ফুটের উপর লম্বা। মাথার চুলে সামান্য পাক ধরেছে বটে, কিন্তু বয়স বোঝার উপায় নেই। শরীর বেশ দড়, মুখের মাড়ি শক্ত, দাঁত ঝকঝকে। পরনে খাঁকি ফুলপ্যান্ট, একটা পা বেশি করে গোটানো, পা খালি। গায়ে জামা নেই। বুক মাঝারি ধরনের লোমে ভরা। পেট সবসময় পড়ে থাকে। বোঝা যায় পেটে খিদে রয়েছে, কখনওই ঠিক মতো খেতে পায় না। খেতে কে দেবে?

খেতেও চায় না পাগলটা। পগলকে কে জোর করে খাওয়াবে! অবশ্যি ওকে খানিকটা সেধে বলতে হবে। আত্মীয়কে বা কুটুমকে মানুষ যেমন করে খেতে বলে।

পাগল শিক্ষিত হলে বাবা তাকেও সমীহ করে কথা বলতেন। শুধু ঠাকুমা মজুকে দেখতে পারতেন না। মাচার ঝুলন্ত চালকুমড়োর গায়ে ঝাঁটার খিল দিয়ে মজু লিখেছে দেখে তিনি খেপে যেতেন।

—ওহে মজু, এ তুমি কী করলে! গেরস্তের ফল এই ভাবে নষ্ট করে দিলে! ও কি আর বাড়বে? পাগলের হাত পড়লে ঘরের ফল কখনও বাড়ে! তোমার কী আক্কেল মজু, খিল দিয়ে খুঁচিয়ে দিয়েছ! শোনো, কী লিখেছ এর গায়ে?

—ইংরেজি লিখেছি গ্র্যাণ্ডমাদার। মাই প্রফেশনাল ল্যাঙ্গয়েজ মাদার! শুনবেন কী লিখেছি? দাঁড়ান বলছি তা হলে। আই অ্যাম পি পি। পাবলিক প্রসিকিউটর, মাই ওল্ড গ্র্যাণ্ডমাদার। সরকারি উকিল আমি। আই হ্যাভ এ হুইপ, বাট নো হর্স। আমার চাবুক আছে, ঘোড়া নেই ঠাকুমা!

—সে তো দেখতেই পাচ্ছি। প্যাঁকাটির ঘোড়া আর ফেঁসোর চাবুক।

সত্যিই তাই। ঠাকুমার চোখের ওপর দু'পায়ের ফাঁকে একখানা প্যাঁকাটি ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে মজু। হাতে অন্যএকটি প্যাঁকাটির সঙ্গে ঝোলানো দড়ি। হি হি করে হেসে চলেছে পাগলটা।

বাচ্চাদের সঙ্গে এই একটা ব্যাপারে মজুর আশ্চর্য মিল দেখতে পাই। পাটকাঠির উপর সোয়ারি করা, মনে হয় ওটি ওর কাছে মোটরবাইক গোছের কিছু। ঠিক তাই। একদিন বাদলার মধ্যে রাস্তায় ওকে দেখা গেল, মাটির উপর লাথি মেরে মেরে পাটকাঠির

যানবাহনটিকে স্টার্ট দিচ্ছে, মুখে আওয়াজ করছে সহজে স্টার্ট নিতে না চাওয়া মোটরবাইকের মতো। বাচ্চারা এই কারণেই মজুর পিছনে লাগত।

রাস্তা দিয়ে মজু যাচ্ছে, ওর পশ্চাতে খলবল করছে এক দঙ্গল ছেলেমেয়ে। মজু সহজে বিরক্ত হত না। বরং সে বাচ্চাদের ইংরেজি শুনিয়ে যেত আর বাচ্চারা তাতেই মজা পেত। একটা কথা স্বীকার করতেই হবে,. মজু ভুল ইংরেজি প্রায় বলতই না।

বাবা বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গে বলতেন—মজু ইংরেজিটা ভালই শিখেছিল। এত শিক্ষাদীক্ষা ওর কোনও কাজেই লাগল না।

—মজু পাগল কেন হল বাবা?

—বলতে পারি না। নানান কথা বলে লোকে, কোনটা যে ঠিক, কী করে বলব! এর পিছনে পারিবারিক বঞ্চনা থাকতে পারে, আবার শোনা যায়, কোনও একটা বিশেষ মামলায় তার মক্কেলকে জেতাতে না পেরে রাতারাতি ওই বেচারি নাকি পাগল হয়ে গিয়েছে।

—বিষয়-সম্পত্তির মোকদ্দমা বাবা?

—হবে। তবে শুনেছি ফৌজদারি কোর্টের উকিল ছিল মজু। খুনখারাবির মামলা লড়ত।

—খুনখারাবি?

—হ্যাঁ, খুনখারাবি, রাহাজানি...আরও কত কি, সে সব বুঝবি না এখন।

মজুকে কোনও দিনই বুঝে উঠতে পারিনি আমরা, তার অতীত কোনও দিনই দিবালোকের মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠেনি। তার সেই পাগল হয়ে যাওয়া মোকদ্দমার পিছনে খুনের ঘটনা ছিল এবং নিশ্চয় কোনও নারীঘটিত সমস্যাও ছিল। সেই নারীটির সঙ্গে মজুর ব্যক্তিগত সম্পর্কও হয়তো ছিল। আমার এই সবই কল্পনা হতে পারে, আবার এই অনুমান সত্যও হতে পারে। মজু কখনও তার অতীতের ঘটনা কারও সামনে বলেনি। তার বউ তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। আইনি বিচ্ছেদ হয়েছিল তাদের। শোনা যায়, মজুর জমিসম্পত্তি তার আত্মীয়রা ভোগ করে । তাকে কিছুই দেয় না।

পাগলকে ঠকানো সংসারে সহজ। বিদ্বান পাগলকে ঠকানো সহজতর। সে ভদ্র, মুখচোরা এবং শান্ত প্রকৃতির পাগল। খেতে ডাকলে লজ্জা পায়। যেন সে আত্মীয়বাড়ি এসেছে, যেন সে কারও কুটুম।

লক্ষ করেছি, মজুর পাগলামি বিভিন্ন ঋতুতে বাড়ে কমে। কখনও কখনও মনে হয়, ও ঠিক আর পাগল নেই,সুস্থ হয়ে উঠেছে। যেমন খোলামকুচি সংগ্রহ করাটা ওর বাতিক। তাই দিয়ে পুকুরের স্বচ্ছ জলে খেলা করা, ছুঁড়ে মেরে জলবিনুনি করাটা ওর নেশা। ও যখন ছোঁড়ে, তখন মুখের ভাষায়, কী উল্লাস, ‘ছইল মারো, গুটুগুটু’—।

জলের উপর দিয়ে সবেগে ছুটছে খোলামকুচি। যেন এই চলার ভঙ্গিই ছইল, অর্থাৎ তির্যক। বোঁ করে তেরছে গেল একদিকে। ওর সমস্ত খেলাই বাচ্চাদের মতো। গুটিগুটি তির্যক খেলা খেলে ওর ভারী আনন্দ। ও দেখতে অনেকটাই যিশু খ্রিস্টের মতো।

লম্বা, ফর্সা, প্রশস্ত ললাট, নির্লিপ্ত আনন্দের ছোঁয়া দু'চোখে, মুখের দাড়িগোঁফে সারল্যের স্পর্শ। খালি গা, খালি পা, পরনে খাঁকি ফুলপ্যান্ট। শীতকালেও অন্য কোনও পোশাক নেই। ওর হয়তো ঠাণ্ডার অনুভূতি কম। ওর উষ্ণতাকেও ভয় কম। মুখপোড়া খাবারও গোগ্রাসে গেলে। ওই গেলার ভঙ্গিটাই পাগল পাগল। খাওয়ার সময় চোখমুখে ফুটে ওঠে ওর খিদের তাড়স।

ঠাণ্ডা-গরমের অনুভূতি, খিদের অনুভূতি, এই রকম অনেক অনুভূতি তত জোরালো নয় বলেই তো সে পাগল। ঠাণ্ডার প্রকোপে নির্বিকার, গরমের প্রচণ্ড দাহে, খিদের প্রবল মোচড়ানিতেও সে অবিচল বলেই না মজু পাগল! অথচ তার লজ্জা আছে।

—আজ আমার এখানেই তোমার নেমন্তন্ন মৃত্যুঞ্জয়, চাট্টি খেয়ে যাবা। সারাদিন টো টো করে ঘুরছ, হাপসে গেছ বইকি। বিশ্রাম নাও।

—ওয়েল মিস্টার হেডমাস্টার। আই অ্যাম হাঙ্রি। ও কে। থ্যাঙ্ক য়ু। বলে বাইরের দাওয়ায় বসে পড়ল মজু মোড়া টেনে নিয়ে। তারপর হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে পড়ে কলতলায় চলে গেল। পরম যত্নে হাত পা, মুখচোখ গলা-কাঁধ ধুয়ে নিয়ে ফিরে এল। ফিরে এল গ্রীবা সটান করে এবং শরীরে একটা হৃষ্ট ভঙ্গিমা ফুটিয়ে তুলে সম্মানীয় অতিথির মতো।

মা একটি নরম ঝাড়ন নিয়ে বাইরের দাওয়া সাফ করে একটি রঙিন শেতলপাটি পেতে দিলেন। বারবার মজুকে সস্নেহে দেখতে থাকলেন।

—বউ! আমাকে কলাপাতায় সার্ভ করবে না। থালায় করে দেবে, লাইক ইওর হাজব্যান্ড। বিকজ আই অ্যাম ইওর রেসপেকটেড গেস্ট।

মৃত্যুঞ্জয়ের একথা শুনে মায়ের কিছু বলে ওঠার আগেই বাবা বলে উঠলেন—হ্যাঁ নিশ্চয়। আমি যা খাব, তুমি তাই খাবে। কলাপাতা কেন, থালাতেই খাবে তুমি।

—সিওর?

—অবশ্যই সিওর। ভেরি ভেরি সিওর মৃত্যুঞ্জয়। মাঝ দিয়াড় তোমার আত্মীয় গ্রাম। এখানে তোমার মামাবাড়ি ছিল এক কালে। মামারা নদীর ভাঙন ছেড়ে মধুরকুলে বসত করে উঠে গেলেন। আমরা আছি। আমরা তোমার...

—লতাপাতায় রিলেটিভ হবেন। আই নো ইট। গাছের একটা পাতা যেমন অন্য আর একটি পাতাকে ছুঁয়ে থাকে, তাকে ছুঁয়ে থাকে অন্য একটা, সেই রকম।

—খুব বেড়ে বলেছ মৃত্যুঞ্জয়। সবই তোমার ঠিক ছিল। খালি...

—খালি?

—না, থাক।

—তবে থাক।

বাবা হেসে ফেললেন। তা দেখে মজুও হেসে ফেলল শব্দ করে। এই হাসিটাই পাগলের মতো। লক্ষণীয়ভাবে পাগলের মতো। আর কেউ এই হাসি হাসবে না। বাবা গম্ভীর হয়ে গেছেন। মজুর হাসি থামতে চাইছে না। মনে হচ্ছে, ওর চোখ দিয়ে ফেটে বার

হবে অশ্রুর বদলে শোণিত। হাসিটাকে সে উচ্চ গ্রামে তুলছে, নাটকীয়ভাবে নিম্ন স্বরগ্রামে নামাচ্ছে, আবার তুলছে, এই কাণ্ড দেখে ঠাকুমা ধমক দিয়ে উঠতেই আচমকা মজু বোবা হয়ে গেল। বুঝতে পারল তার অপরাধ হয়েছে। তারপর মজু সত্যিই কেঁদে ফেলল। দু'চোখে বাস্তবিক সামান্য জল।

মজুর চোখের জলের দিকে লক্ষই করলেন না ঠাকুমা। হঠাৎ নির্দেশ দিলেন—ওকে কলাপাতায় করে ভাত বেড়ে দাও বউমা। পাগলের আবার থালা কিসের! তোমরাও কি পাগল হয়েছ নাকি! যা বলছি করো, এত আদিখ্যেতা ভালো নয়। আমি মাটির থালায় করে খাই, মজু কেন কাঁসার বাসনে খাবে?

ঠাকুমার নব্বুই ছুঁই ছুঁই বয়েস। লাঠিতে ভর দিয়ে চলাফেরা করেন, ধনুকের মতো বেঁকে গেছে দেহ। যেন তিনি মাটিতে পড়ে হারিয়ে যাওয়া যৌবনকে খুঁজে ফিরছেন। কথা বলার সময় কোমর খানিকটা সটান করে লাঠিতে অতিরিক্ত ভর দিয়ে মুখ তোলেন। তাঁর নির্দেশকে উপেক্ষা করা কঠিন। বৃদ্ধা মাকে বাবা আঘাত দিতে চান না। বাবা ঠাকুমার কথায় আশ্চর্য আঘাত পেয়েছেন মনে মনে। কিন্তু কিছুই বলতে পারছেন না।

ঠাকুমার আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগবে মজুকে কাঁসার থালায় খেতে দিলে। কারণ তিনি নিজে মাটির থালায় করে খান। সত্যি বলতে কি, আমাদের মাথায় রাখা এই বিস্ময়কর তথ্যটির এ মুহূর্তে বিস্মরণ ঘটেছিল। ঠাকুমা মাটির থালায় কেন খান, আমরা তো কেউ তাঁকে এ ভাবে খেতে বলিনি। লক্ষ করি, ঠাকুমার কথায় মায়ের মূর্তিটা কেমন বিস্ময়-নির্বাক হয়ে ঈষৎ বেঁকে গেল। তাঁর চোখে একটা চাপা রুষ্টভাব ফুটে উঠল দেখতে দেখতে। তিনি কাঁসার ঝকঝকে বড় একখানা থালা জল দিয়ে ধুয়ে সাদা পরিষ্কার ন্যাকড়ায় মুছে দিলেন। শেথলপাটির গা-ঘেঁষে সম্মুখে রেখে দিয়ে বললেন—মাটির থালায় আপনি খান, সে তো সাধ করে মা! কেউ তো বলেনি খেতে। কেন খান?

—ওই যে বললে সাধ করে! বললে না?

—হ্যাঁ বললাম। আপনার সাধ কী, ইচ্ছে কী, সে আপনিই জানেন!

—তোমরা জানবে না? কেন খাই? বয়েস হয়েছে, মাটিতে, জলে, পঞ্চভূতে মেশবার আগে দামি পাত্রে লোভ রাখাটা ঠিক না। মাটির মানুষ আমরা, মাটিই তো হব শেষে। আবার কী রূপে কোথায় কবে জন্মাব ঠিক নেই। এই বেলা মাটিই ভালো বউমা! তাই খাচ্ছি।

—খান না, কে মানা করেছে। কিন্তু অন্যে কিসে খাচ্ছে দেখতে যাচ্ছেন কেন? হিংসে কিসের আপনার? মাটি মাটি করলেই কি ঠাকুরের সব করা হল!

—তাই বলে তুমি পাগলকে কাঁসার থালায় দেবে?

—দেব না?

—না, দেবে না। এতে আমার অপমান হয়, তোমার বোঝা উচিত। সঞ্জয়, তুমি কি আমাকে দেখবে না বাবা! এ কী অপমান নয়? ঠিক আছে, আমি দেখছি। কেউ দেখবে না। কেউ দেখে না,এ আমি জানতাম। কিসে খাই, কেন খাই, কে বুঝবে! হা ঈশ্বর, কে

বুঝবে!

এ যে শুরু হল, সারাদিন এখন আভাসে-ইঙ্গিতে মাকে দুষতে থাকবেন ঠাকুমা। কেউ দেখবে না, কেউ দেখে না—এটাই মূল অভিযোগ, অথচ ঠাকুমা পরনের কাপড় মলমূত্রে মেখে রাখেন অনেক দিন, মা নিজে হাতে সেই সব কেচে পরিষ্কার করেন। মায়ের ঘৃণা হয়, তবু মা করেন। তবুও ঠাকুমাকে প্রসন্ন করা যায় না। অবশ্য অপ্রসন্ন মুখে যন্ত্রের গলায় ঠাকুমা মাঝে মাঝে মায়ের উদ্দেশে বলেন—তুই আমার আগের জন্মে মেয়ে ছিলি বিজয়া। নইলে এত কেউ করে না!

—বলছেন!

—হ্যাঁ, তোমাকে আমি সার্টিফিকেট দিচ্ছি বউমা!

—দিন, বাঁধিয়ে তো রাখব না। আপনার ভয় নেই।

আজ মা, 'কেউ দেখে না' বলাতে কেন যেন রেগে গেলেন। ওদিকে ঠাকুমা লাটিতে ভর দিয়ে বাইরের তাঁর কুঁড়েতে ঢুকে গেলেন দ্রুত। বার-উঠোনের এক পাশ ইটের দেয়াল দিয়ে ঘেরা, অন্য পাশে পাটকাঠির ঘের। বৈঠকখানাটি বার-উঠোনের এককোণে ইটের দেয়ালের সঙ্গে লাগোয়া। বৈঠকের পাশে ঠাকুমার চালের কুঁড়েঘর। বৈঠকখানাটির চাল টালি ছাওয়া, দেওয়াল বাঁশকঞ্চির বেড়াতে মাটি লেপে তৈরি। বার-উঠোনের পুব দিকে পাটকাঠির ঘেরের সংলগ্ন কুমড়ো-শশার মাচা, মাচার যেখানে শেষ সেখানে একটি পুরনো পাতকুয়ো। তারই পাশে একটি শানবাঁধা টিউব-ওয়েল।

বাবা কী বলবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। খানিকটা বিমূঢ় ভঙ্গিতে বলে উঠতে চেষ্টা করেন—ওরে মুকুট, যা তো বাবা হেঁসোখানা নিয়ে...

আমার ভাই মুকুটকে নির্দেশ দিতে চাইলেন বাবা, কলাপাতা কেটে আনার জন্য। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে কেড়ে নিয়ে মা বলে উঠলেন—কোথায় যাবে মুকুট? কলাপাতা আনতে? না, যাবে না।

বাবার নির্দেশ মুখ থেকে খসামাত্র ছোটবোন শিউলির হাত-দু'খানি উঁচু পাকা দাওয়ার শেতলপাটির কাছে রাখা কাঁসার থালার দিকে চলে গিয়েছিল। সে ওখানেই বসে ছিল। দু'হাতে করে তুলে সে বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছিল থালাটা, মায়ের দৃঢ়স্বর তাকে দমিয়ে দিল। 'না, যাবে না'—শোনা মাত্র শিউলি থালাখানা বুক থেকে নামিয়ে ধীরে ধীরে আগে যেমনটি ছিল সেই ভাবে রেখে দিল।

মোড়ায় বসে থাকা পাগলের দৃষ্টি বৈঠকখানার চালার পিছনের কলাপাতার দিকে চলে গিয়ে শিউলির বুকে ধরা থালার দিকে চকিতে ফিরে এল। দৃষ্টিতে এক ধরনের অসহায় ধূর্ত আলো এবং তীব্রতা। যেন সবই জলে পড়ে যেতে চলেছে। কিছুক্ষণ আগেও ছিল মোলায়েম লোভ, এখন তীক্ষ্ণ অসহায়তা শকুনের চঞ্চুর মতো করেছে তাকে।

মজু তার লম্বা একখানা কাঁধের পাশে ঝুলে থাকা হাত অদ্ভুত মুদ্রায় নেড়ে চাপাভাবে অস্ফুট সতর্কতায় শিউলিকে বলল—রাখো! অর্থাৎ মা যখন বলছেন, রেখে দাও জলদি। আমি খাব ওটায় করে, রাখো, রাখো! এই ফাঁকে রেখেই দাও, ওগো খুদে

মেয়েটা! লক্ষ্মী মেয়ে, এই তো বেশ করলে, আহা, কী ভালোই করলে!

এই ধরনের সমর্থন এবং কাহিল আশ্বাস, অবুঝ লোভের উজ্জ্বলতা মজুর চোখে খেলা করে গেল। মনে হচ্ছিল, এ নিশ্চয়ই একটা মর্মান্তিক ঘটনা। অতিথি হওয়ার পর অভিমানটুকুও বেচারি বিসর্জন দিয়েছে কখন নিজেই জানে না। সে এখন হয়তো খিদের আঁচড়ানি পেটের মধ্যে স্পষ্ট অনুভব করতে পারছে। খিদের অনুভূতি অত্যন্ত লোভী কাঙালের মতো হলেও অনুভব করতে পারাটা নিশ্চয় সুস্থতার লক্ষণ। পাগল একমাত্র খিদের খাদ্য পেলে সুস্থ থাকে। তার ধৈর্যশক্তি বেড়ে যায়।

মজু উনুনের ফুটে ওঠা তরকারির গন্ধ পাচ্ছে। সে আর নড়তে পারল না। মা জলভর্তি গেলাস এনে রাখলেন কাঁসার বড় থালাটার পাশে। বললেন—বসে পড়ো মজু। আমি তোমাকে খেতে দেব।

মজু খেতে বসে গেল। তখনই কোথা থেকে আকাশে ধেয়ে এল কালো মেঘ। সূর্যের মুখ ঢেকে দিয়ে অত্যন্ত শুকনো বিদ্যুৎ চমকালো আর চড়াত করে বাজ হেঁকে উঠে থেমে গেল। ঝিরঝিরে বৃষ্টি হল কিছুটা। ওই বৃষ্টির মধ্যে বসে বসে খাচ্ছে মজু। তার মাথার উপর ছাতা ধরলেন বাবা। মেঘ হঠাৎ আবার সবে চলে গেল কোথায়। ফটফটিয়ে রোদ বর্শা হানতে লাগল কাঁসার থালায়। কাঁসার আলো এসে লাগছিল আমার চোখে। ভীষণ দুঃসহ সেই আলো। আমি চেয়ে থাকতে না পেরে ওই আলোর বাইরে ছায়ায় সরে এলাম। তখনই একা মহা আর্তনাদ শোনা গেল ঠাকুমার গলায়। তা শুনে ছুটে গেছে শিউলি। কী হল আবার! মা বললেন।

একদণ্ড বাদে শিউলির চিল-চেঁচানি শোনা গেল—ঠাক্‌মা মাটির থালা ভেঙে ফেললে গো!

আর্তনাদ করেই ঠাকুমা থালাটাকে ইটের উপর ঠুকে দিয়েছেন, তার একটা ফট্ করে ভাঙার শব্দ মজুও শুনত পেয়েছে, আমরাও প্রত্যেকে—কোথাও তার চেয়ে বড় কিছু যেন ভেঙে গিয়েছে। কী সেটা, আমরা জানি না।

অবশ্যি ঠাকুমা ভেঙে পড়েছেন, তাঁর কান্না শোনা যায় তাঁরই কথার মধ্যে—আমি আধার ভেঙেছি, মাটির আধার ভেঙে দিলাম ভগবান। হায়! একী করলাম সঞ্জয়! ওরে বিজয়া, এ আমি কী করলাম মা রে! আমি আর কিসে করে খাব!

ফট্ করা শব্দটা, সঙ্গে 'কিসে করে খাব' আর্তনাদ তির বেগে এসে লাগল মজুর দাঁড়ায়, সে বিঁধে গেল। সটান করল নিজেকে, হাতটা মাখা-ভাত মুখের কাছে এনে থেমে গেল, সে গিলতে পারল না। এঁটো হাত নিয়ে অতঃপর লাফ মেরে ছুটে গেল কলতলায়। হাত ধুয়ে, মুখ ধুয়ে মুনিষের মতো কুলকুচি করে কলের মুখে তালু লাগিয়ে জল খেল, গেলাস চাইল না। হঠাৎ মজু আমাদের আর চিনতে পারল না। কারও সঙ্গে কথাও বলল না। চুপচাপ ঘাড় নিচু করে কাঁধে ছেঁড়া নোংরা গামছাটা ফেলে বেরিয়ে চলে গেল পথে।

মজু চলে যাওয়ার পর আমাদের পৃথিবীতে আশ্বিনের আঁধি শুরু হল। কী ঝড়, কী বাদলা, কী গুমরানো বৃষ্টি!

মা শুধু আমাকে বললেন—দ্যাখ তো রোহিত, পাগলটা কোথা যায়, কী করে!

তখনই ঘোর হাওয়া দিল আকাশ। রাস্তায় ধুলার ঝড় বয়ে গেল। ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি দিল মেঘ। প্রথমে বোঝা যাচ্ছিল না, আঁধি আসছে। ওই ঝড় আর আর বৃষ্টির মধ্যে মজু একটা ধুসর রহস্যময় মূর্তির মতো পথে হেঁটে চলেছে। আমি চলেছি তার পিছনে। পাণ্ডেদের শুকনো-প্রায় ডোবার কাছে ঝড়ের ঝাপটা খেয়ে মজু পড়ে গেল। ডোবার গায়ে দাঁড়িয়ে থাকা বড় আম গাছটার শিকড় ডোবার দিকে বেড়ে নেমেছে। পড়ে যেতে যেতে ওই শিকড় ধরে মজু নিজেকে সামাল দেবার চেষ্টা করছিল। তীব্র আর্তনাদ করে আকাশে চেয়ে বলে উঠছিল—ভগবান! আমাকে পাগল করে দাও ভগবান!

পাগলের এমন আর্তি কে শুনেছে কবে! আকাশে দুর্যোগ আরও ঘনিয়ে উঠতে লাগল। পাগলটা কী করে বাঁচবে জানি না। ঝড়বৃষ্টির ভয়ে আমি মজুকে একলা ফেলে পালিয়ে চলে এলাম বাড়ি।

ওই আঁধির মধ্যে কী করেছিল মজু? সে কথা পরে জেনেছি। আঁধির মধ্যেই সে পথ হাঁটতে শুরু করে। তীব্র গুমরানো হাওয়া, বাজের ভয়ংকর হাঁক, বৃষ্টির ঘূর্ণি মাথায় করে মজু হেঁটে গিয়েছিল তেঁতুলিয়া পালপাড়া। ওখানকার মাটির পাত্র টেকসই। প্রসিদ্ধ মাটির দেশ।

সুধন্য পালের সামনে হাত পেতে মজু পাগল বলেছিল—সঞ্জয় পালিতের মায়ের বাসন ভেঙে ফেলেছি পালবাবু। মানুষের আধার ভাঙলে পাপ হয়, আমাকে বাঁচান। ঠাকুমা না খেয়ে শুকিয়ে থাকবে।

সুধন্য পাল কঠিন-হৃদয় ব্যক্তি। কাউকে মাগনা কিছু দিতে চায় না। পাগলকেও না। বলল—দাম এনেছ মজু? কী লাগবে বলো! আঁধার, কিসের আঁধার বাবা! আঁধি চলেছে, আঁধার তো হবেই।

—সে কথা নয় পালবাবু! অন্নের আধার, ভাত গেলার পাত্তর, মাটির থালি একখানা। চান তো একবেলা বেগার খেটে শোধ দিব।

—থালাকে আঁধার কয় পাগল! বিদ্বান পাগল তো! যাও, পেত্তলের ডোল তুলে আনো। ওরে কে আছিস, বড় ইন্দারা (কুয়ো)-টা দেখিয়ে দে!

মজু অবাক হল। কিছুই সে বুঝতে পারছে না। আঁধির তীব্রতা একটুও কমেনি। মহাপ্রলয়ের আতঙ্ক আকাশ দাপিয়ে চলেছে, নিকট দূরের গাছপালা বৃষ্টি-ঝড়ের আঘাতে নুয়ে নুয়ে পড়ছে। পৃথিবীর সমস্ত শিকড় ছিঁড়ে যাচ্ছে যেন। হু হু করে দীর্ঘশ্বাস বইছে আঁধির ধমনী থেকে। কে যেন নিঃসঙ্গ অবয়ব অদৃশ্য অস্তিত্ব আঁধি-লুপ্ত আকাশের মধ্যমায় কেঁদে চলেছে। সেই কান্না শুনতে পেল মজু।

শিউরে উঠে বলল—কে কাঁদে পালবাবু!

—কই, কে কাঁদে! কেউ না। তুমি কুয়োয় গিয়ে নামো। যাও, আমার হেড-কিষেন তোমাকে দেখিয়ে দিচ্ছে। আজ তিন সপ্তা ডোলটা দড়ি ছিঁড়ে গিরে গিয়েছে, জলকাঁটা মেরে তোলা যায়নি। মাটির কাজ, সায়র সায়র জল লাগে কিনা। খালি একটা

কলের জলে কুলান হয় না। ডোলে করে তোলো, মাটি মাখো। কপিকল ঘোরাও, বালি মাখো। এই না হলে ইন্ডাস্ট্রি!

সুধন্য পালের অহংকার আছে, মৃৎপাত্রের কারবারকে সে 'ইন্ডাস্ট্রি' নাম দিয়েছে। কারবারটা অবশ্য বিশাল। হাঁড়ি, কলসি, কোর, বড় জালা, খুরিবাটি, কাতাড়ি, থেলো, থালা, ঘটি-ঘট সবই যেমন হয়, সঙ্গে হয় টালি। বৃহৎ ব্যবসা। কলের ছাঁচে টালি, কলে চলে চাক-পাহি। কল মানেই তো ইন্ডাস্ট্রি। কিন্তু জল তোলার পুরনো কুয়ো এখনও বুজিয়ে দেয়নি পাল। মরা নদীর পাড়ে জলটান হয় বলে ওটা এখনও বেঁচে আছে।

মজু পাগল বুঝতে পারল, তাকে কুয়োর জলে নামতে হবে। টালির চালার তলে মাটিতে লেটিয়ে বসা মজু চোখ তুলে আকাশের কাঁদুনে নিরবয়বকে বিড়বিড় করে বলল—অবজেকশন ইওর অনার, আই ডিড নট ডু দিস ইন মাই লাইফ, আই অ্যাম পি. পি—আমি পারব না। কুয়োর জলকে ভয় পায় মজু! আমাকে পাগল করে দাও, আমি মৃত্যুঞ্জয়, আমি পাগল নই ইওর অনার।

বলল বটে, কিন্তু কথাগুলি স্পষ্ট হল না। আমার বিশ্বাস, এইভাবেই মজু বিড়বিড় করেছিল। কারণ সে কুয়োর জলকে সত্যিই ভয় পেত। সেই জলকে আরও বেশি ভয় করত, যা বৃহৎ-মুখ কুয়োর তলায়, একেবারে পাতালবৎ গভীরে তলানো। অনেক পাগল শুনেছি, ঘুমের মধ্যে স্বপ্নে পাতাল-সমান শূন্যহৃদয় কুয়োর জলে পড়ে যায়, দীর্ঘ সময় ধরে পড়ে যেতে থাকে তার দেহ। দীর্ঘ সময় যেন অনন্ত কাল। যখন দেহ ডুবে যায়, তখন সে জেগে উঠে বসে কাঁদে।

বাইরে আঁধি, ভিতরে পাতাল। প্রবেশ করতে হবে। পেতলের প্রকাণ্ড বালতি তুলে আনতে হবে। মজুকে সাহস দিতে লাগল চালার তলে দাঁড়িয়ে থাকা মাটির শ্রমিকরা। একজন শ্রমিক শুধু কুয়োর গায়ে এসে দাঁড়াল। আঁধি-প্রমত্ত আকাশে চেয়ে থাকতে থাকতে পাগলটা ঝাঁপ দিল কুয়োয়, সে ধাপ মেপে নামার বুদ্ধি করতে পারল না। সে এক অতি ভয়ংকর মৃত্যুছোঁয়া আর্তনাদ পাক খেয়ে খেয়ে পাতালে নেমে গেল। জলে যেভাবে ছাগল-ভেড়া নামতে চায় না, সেইভাবে মজু প্রথমে গোঁ ধরে রইল। তারপর কী হল কে জানে, ঝাঁপ দিয়ে বসল। তার গতর ছিঁড়ে গেল। জলের আঘাতে বুক ফেটে যেতে চাইল। তবু মরল না মজু। সে কি আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল? সে কথা ভেবে আবশ্য সুধন্য পালের মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল।

লোহার গোঁজ-অলা ধাপ ধরে ধরে মজু উঠতে লাগল। এক হাতে ধরা বালতি। গা বেয়ে রক্ত ঝরছে। ভাগ্যিস, লোহার গায়ে মাথা পড়েনি, নইলে মৃত্যু অবধারিত ছিল। বাঘের মতো করে বাইরে লাফ দিল মজু। চোখে তার নারকীয় তীব্র ভয়। অন্ধকূপ থেকে যেন সে ফিরে এল জীবনের দিকে।

ওই আঁধির মধ্যেই হেঁটে ফিরতে লাগল মৃত্যুঞ্জয়। হাতে ধরা মাটির থালা। কালো রং। সে যেন পৃথিবীটাকেই হাতে করে ধরেছে। প্রবল বৃষ্টির ঝোড়ো ঝাপটায় মাঝে মাঝে কাত হয়ে গেলেও, পা পিছলে পড়ে যেতে যেতে সামলে নিয়ে পথ চলছিল মজু। সে

এইভাবে এক হাজার বৎসর আঁধির মধ্যে হেঁটে এল। পিছলে পড়তেও হল তাকে, বার কতক সামলাতে পারল না। কাদা মেখে গেল গায়ে, খাঁকি প্যান্ট কাদায় ভরে গেল। চোখে মুখে কাদা। মৃত্যুর ভয় থেকে সে বেঁচেছে কিন্তু তার সমস্ত হাড় গুঁড়িয়ে গেছে। আলগা হয়ে গেছে শরীরের কাঠামো। পা নড়বড় করছে, হাতে শক্তি নেই। ধপ্ করে হাত থেকে থালাখানা খসে পড়ে গেল কাদায়। গা দিয়ে তার রক্ত ঝরছে।

কী হল! কী যেন হল? থালা খসে পড়ে গেছে, বুঝতে পারেনি মজু। মজু হেঁটে চলেছে। একখানা হাত শূন্যে ধরা, যেন সে এখনও কিছু ধরেই রয়েছে। কিছু দূর আসার পর মনে হল, হাতে তার কিছু নেই। থালা পড়ে গেছে। সে তারপর পিছনে ফিরতে লাগল।

আঁধি আরও কালো হয়ে উঠেছে। বৃষ্টির চিটে রঙ, বেড়ার মতো তার চারদিকে ঘেরা। পথে জল। কাদার উপর দিয়ে জল গড়াচ্ছে। থালা ডুবে গেছে। পাগল বুঝতে পারছে, থালা ডুবে গেছে। সে তার দৃষ্টিকে তীব্র করে ঠাঁই দাঁড়ায়। কোথায় থালা, মানুষের আধার কোথায়?

হঠাৎ থালার কানার শিরা জেগে থাকতে দেখতে পায় মজু। ধপ্ করে বসে পড়ে। হাত বাড়াতেই শিরা সরতে থাকে। এ! থালা সরে যাচ্ছে কেন? চেপে ধরবা মাত্র পিছলে চলে যায়, তারপর ফোঁস করে ওঠে। এটি চন্দ্রচূড়া, খড়মখুরা নয়. এটি কাল-নাগিনী বা এটি অভিশাপ। তুই কি আমাকে খাবি মহাকালী! তুই কি বেহুলার বরকে কেটেছিস মাগী! পাগলকে খা, সংসারকে খা। থালাখানা দে মা!

ফনা নামিয়ে সাপটা আঁধিতে চরতে থাকা ডিহির গাভীটার দিকে চলে যায়। একটি লাল ঘোড়া চুপচাপ দাঁড়িয়ে ভিজছিল। তার দিকে যায়। এইভাবে সাপটা চলে যায়। তখন তাল গাছে বসে ভিজতে থাকা নখঅলা অদ্ভুত পাখিটা শিকার করে সাপটাকে, ছিন্নভিন্ন করে দেয়। বেজিরা আসে। কাটে চলে যায়। পাখিরা শিকার করে। সাপটাকে ঘিরে ডিহিতে ভোজ হয় শিকারি পাখিদের। পাখিগুলো যেন কোথা থেকে এসেছে। গাভীটা ঘাস খেয়ে যাচ্ছে ডিহির উপর। পাগল অবাক হয়, তাকে যে খেত, তাকেই খেয়ে গেল অন্যে। কী অদ্ভুত দুনিয়াটা! কিন্তু তার থালা? ঠাকুমার থালাটা কোথায়? ঠাকুমা যে থালার অভাবে উপোস দিচ্ছে।

হঠাৎ মজু দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে জলকাদার উপর পড়ে যায়। চিৎ হয়ে আঁধির মধ্যে শুয়ে থাকে। তার নাম মৃত্যুঞ্জয়। সে মরবে না। হাতখানা কিসে গিয়ে লাগে যেন। কিসে লাগে জলের ভিতর! বিস্মিত হয় মজু। ঠাকুমার থালা এভাবে রয়েছে, কোথাও যায়নি।

থালা নিয়ে আঁধির মধ্যে হেঁটে আসে মজু। পাঝরা পাড়ার বাঁশবাগানের পথ ধরে। মাথার উপর বাঁশপাতার ঘনিষ্ঠ ছাউনি, ঝড় নেই এখন, শুধু বৃষ্টি। এখানে অন্ধকার হয়েছে, কিন্তু পথ চলা যায়, দেখাও যায় ঘোর মতন সব। তার মাথার ভেতরের রহস্যময় গলির মতন পথ। কোথায় চলেছে মজু, কিসের ভিতর দিয়ে? সন্ধ্যা হচ্ছে নাকি! কারা ওরা? কী

করছে ওখানে? থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে মজু পাগল। বেশ অবাক হয়েছে পাগলটা।

ছাতা মাথায় দু'জন ওরা কিছু কি খুঁজছে! না, দু'জন কোথায়? ভুল দেখছে মজু। একটি মেয়ে বোধহয়। না, দুটোই মেয়ে, ছাতা ধরেছে একজন। অন্যজন কী একটা ধরে রয়েছে। বাঁশের মুড়োর মধ্যে কী একটা রেখে দিচ্ছে। উপরে বাঁশপাতার ছাউনি। রেখে দিয়ে দ্রুত ওরা চলে গেল। যেন পালিয়ে গেল। কী রেখে গেল ওরা?

এগিয়ে এল মজু। তারপর পাগল হলেও চমকে উঠল। বাঁশবনের মুড়োর মধ্যে ন্যাকড়া জড়ানো সদ্যোজাত শিশু একটা। কাঁদছে না। হাতপা নেড়ে খেলা করছে, শিশুর গা থেকে মায়ের গর্ভের ভাপ উঠছে এখনও বৃষ্টির ধোঁয়ায় মতন। গন্ধ পাচ্ছে মজু। মজুর কী যে আনন্দ হল! সে তার থালার উপর তুলে নিল শিশুকে। তারপর মাথায় নিয়ে হাঁটতে শুরু করল। বৃষ্টি তখন থেমে গিয়েছে।

এই আঁধিতে ঠাকুমা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তাঁর হাঁপের টান অত্যন্ত বেড়ে গেল। বাবাকে হাঁপ টেনে টেনে বললেন—আর তো বাঁচা যায় না সঞ্জয়!

বাবা বললেন—তুমি যে এভাবে খাওয়া বন্ধ করবে, ভাবতে পারিনি মা। একটা পাগলের ওপর এত অভিমান করলে চলে!

—আমার আধারটা ভেঙে গেল ছোট খোকা। আমি আর বাঁচব না। খাব কিসে?

—নতুন থালা আনবো মা।

—না বাবা, নিজে হাতে ভেঙেছি, ও আর আসবে না।

এই সময় থালায় করে বাচ্চা বয়ে এনে, সামনে দাঁড়িয়ে পড়ল মজু। ঠাকুমার চোখের সামনে মেলে ধরে বলল—খাবে নাকি গ্রান্ডমাদার। দ্যাখো, সদ্য জন্মেছে, ফুলের মতন শোভা পাচ্ছে! খাও! খেয়ে দাও। শিকার করো তুমি!

—আমি কি ডাইনি মজু! কিন্তু এ তুই কোথায় পেলি বাবা! কে একে এমন করে নাড়ি ছিঁড়ে ফেলে দিল? তুমি তো মৃত্যুঞ্জয় পি পি! কী করে একে বাঁচাবি পাগল! এ যে মরে যাবে তোর কাছে!

—মরবে না। আধার পেলে মানুষ মরে না। তোমার থালটা খোকাকে দাও, আমি চাইছি, ইট ইজ এ প্রেয়ার গ্র্যান্ডমাদার। আপিল করছি, তুমি থালাটা দাও। এই থালা তোমাকে দেব না। এ দিতে পারি না তোমাকে।

—নাহ্, এ আমার ! আমি খাব। খুব খিদে পেয়েছে মজু! বলে কঠিন লোভার্ত হাত শিশুর দিকে হঠাৎ করে তুলতে চাইলেন ঠাকুমা। শূন্যেই উঠে রইল হাতটা, ঠাকুমার প্রাণ বেরিয়ে চলে গেল। শিশু তখন নিজের মুঠি খাচ্ছে, খিদেয় চুলবুল করছে। এবার কেঁদে উঠবে। তার দুধ চাই। চুষিকাঠি চাই। এই বাচ্চার একদিন মুখে ভাত হবে। হবে নাকি!

শিশুকে থালাসুদ্ধ নিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পড়ল মৃত্যুঞ্জয়। তারপর শিশুকে কোলে করে নিয়ে থালাটা মানুষের সামনে এগিয়ে ধরে বলল—বাচ্চার দুধ চাই ইওর অনার। মাই লর্ড, আমার বাচ্চা খেতে চাইছে! আই অ্যাম নট এ ম্যাড অ্যাট অল। আই অ্যাম নট এ

থিফ্। আমি পাবলিক প্রসিকিউটর। হেল্প্ করুন. সেভ দ্য চাইল্ড ইওর অনার। আমার ঠাকুমার থালায় দু'চারটি পয়সা ফেলবেন দয়া করে। আমি এই থালা পাতাল থেকে তুলে এনেছি বাবা, লাইক অ্যান অ্যাঞ্জেল। প্লিজ ডু হেলপ, সেভ দ্য চাইল্ড। বলতে বলতে দরদর করে দু'গাল ভাসিয়ে কেঁদে ফেলল মজু পাগল। এই কান্নাটির নাম ছোটগল্প।

এই গল্পের এটাই বৈশিষ্ট্য যে, শিশুর মুখে কোনও খাবার খুঁজে দেওয়ার আগে, মজু জিভে ঠেকিয়ে দেখে নিত, কেউ তার শিশুর খাদ্যে বিষ মিশিয়ে দিয়েছে কিনা। তারপর শিশুকে খাওয়াত ; কালো পাত্রে ঝকঝক করত জনগণের পয়সা। সত্যমেব জয়তে—।

কালো মেঘ যেন সাজিল রে

বাপের মজুতের ব্যবসা। রাঢ়ের ধানচাল মজুত করত বাবা। একই জেলার পূর্বাঞ্চল হল ভড়, পশ্চিমাঞ্চল রাঢ়। আরও একটা অঞ্চল আছে, কালান্তর। মাটির এই তেভাগা বিন্যাস। ভড় নেমেছে নিচু হয়ে পদ্মার ঢালে। রাঢ়ের জমি উঁচু, ঢেউ খেলানো। ওখানে ধান ভালো জন্মে। শাক-সবজি কম ফলে। কালান্তর হল আরও গাঢ় ধানের জায়গা। মাটি নাকি কৃষ্ণমহিষের চেয়ে কৃষ্ণ। ভড়ের লোকরা কালান্তর যায় জন খাটতে। কালান্তর আসলে জেলা ছাড়িয়ে যাওয়া বিভুঁই। কালান্তর মানে কি তাহলে দেশান্তর? জেলার শেষ সীমা তো বটেই। তা বাদেও যেতে হয় কত দূর। কালান্তরে কি মানুষ সহজে যায়! পেটের দুঃখে যায়। যেত এক কালে। তখন জমি দু'ফসলি। আউশ আর আমন, নতুবা রবিখন্দের চৈতি।

অবশ্যি মজুতের ব্যবসা চিরকালই ছ্যাঁচড়া ব্যবসা। মহাশয় গোছের লোক এ ব্যবসা পারে না। বাবার হল কড়া সামন্তর মতো মেজাজ, খর স্বভাবকে মানুষ ভয় পায়, সে মানুষ চোপা সিধে করে কথা বলতেই পারে না, শুঁয়োপোকার মতো ঝুলো ভুরু, কানের লতিতে কুচি সাদা লোম, নাকের ছিদ্রে লোমের গুঁড়ো, চোখ না পাকিয়ে নিরীক্ষণ করে না কাউকে।

—কে র‍্যা বিছনখেগো মুল খাগির পুত, কী চাস? অ্যাই শালা পা ছুঁবি নে, খবর্দার!

—আমি আজ্ঞা, আপনের সুমুন্দির পো, কেতন পরামানিক, পিসা মোর মুয়ে জুতা মারুন , বিছন খাইছি মায়েপোয়ে, বড্ডই আকাল গেল, কিছুই রাখতে পারি নাই। দ্যান বাবু, একটি ধামা বেতাই।

—এ যে শালা মাউথপিসে রুমাল জড়িয়ে মুখ বাজায়, কে কার সুমুন্ধি মনে করি দাঁড়া, জুত করে মুখ তুলে ইদিক পানে চা, পষ্ট করে তাকাবি বেতায়ের পোতা! চলছে খরা আর উনি চাইলেন বেতাই।

—আজ্ঞে শীলের হাফ-পঞ্জিকে নিকেছে আগুতে বর্ষণ নাগবে। বান ডাকবে। নদীর কোলে বেতায়ের ছিটা মারবে পিতিবেশী সকলে, বেতায়ের বিছন কুথা পাই, আপনের বারাণ্ডায় ধন্না না দিলে যাই কুথা!

—তাকা, আগে গত সনের হিসাব চুকিয়ে তবে পেন্নাম করবি শালা, এক খুতি বেগুনবিচি শিশার ডিহায় পাকান কর নাই ডিহিদার বিছনখোর! ওই লাগানের কথা ক' আগে।

নিঃসাড় হয়ে গেল কেতন পরামানিক। হাফ-স্বর্ণকার, হাফ-চাষি। মাথার টাকে চুলবুল করছে ঘামের স্বেদ। কী অকাট্য ফাঁদে পড়ে গেল লোকটা। স্বর্ণকার হাফ নয়, সিকি। সূক্ষ্ম কারু হাতে আসে না। সোনা নয়, চাঁদির মোটা কাজের বানি নেয়।

বাবার তো শুধু মজুতের ব্যবসাই না। মজুত খোরাকের বাঁধাই-ব্যবসা। সেটা কী রকম বোঝা দরকার। তা বুঝতে হলে বিছনখোর কাকে বলে বুঝতে হবে। যে লোক হরসন ধানের বীজ ঘরে জুগিয়ে রাখতে পারে না, অভাবে খেয়ে ফেলে, সে হল বিছনখোর। বীজ হল গেরস্তির মূল। চরম অভাবেও মানুষ বীজ ধরে রাখে। রাখে আর কোথা, খেয়েই তো ফেলে। এই খাদক শ্রেণীকে বাবা বিছন দিত অর্থাৎ বীজ বাঁধাই করত, বলতে কি বাবার হাতে বীজ যেন 'বন্ধক' পড়ত। অবশ্য বাঁধাই কথাটা এ ক্ষেত্রে মজুতেরই হেরফের। 'বিছনখোর' শব্দটা দুনিয়ার সবচেয়ে বড় ভর্ৎসনা এবং অভিসম্পাত। শৈশবেই সে কথা বুঝে ফেলেছিল অন্নপূর্ণা।

সেই শৈশবেই সে চিনত বেতাই আর বেগুনবিচি। বেতাই ছিল কালো খোসাঅলা মোটা ধান। নোনা ধানের বীজও ছিল তাদের। তবে নোনা আর বেতাইয়ের পার্থক্য বুঝতে হবে। নোনা হল জলের ধান, বেতাইও তাই। দুটিতে তফাতটা কিন্তু সামান্য নয়। একটি জলে মরে না, জলের সঙ্গে তার সদ্ভাব ঠিকই, যদি জল অধিক চঞ্চল এবং স্ফীত না হয়—এ হল নোনা। সাধারণভাবে মোটামুটি স্থির জলে নোনা ফলে ওঠে।

বেতাইয়ের পাল্লা আলাদা। কেতা দেখবার মতো। অন্ন সেসব দেখেছে। তাদের দেওয়া বীজে নদীর কোল ভরে উঠত, নদীর জলের উপর গলা তুলে চেয়ে থাকত বেতাই। কেউ কেউ বলত এ হল বেতিধান। নদীর জল বন্যার তাগিদে বাড়ত যখন তখনই বেতিধানের কেরামতি দেখা যেত। জল যত বাড়ে, সে-ও তত গলা তোলে।

বেতাইয়ের গা-গতর ছিল মানুষের মতো গাঁটঅলা, হাঁটু, কোমর, বুক, গলা, এমনকি ঠোঁটও ছিল। খানিকটা বেতের মতো লতানে ভঙ্গিমা। ওর গাঁটে সরু সরু ঝুরো শেকড় গজাত সাদা সাদা, খোঁচা খোঁচা দেখতে।

উপরে বর্ষণ, নীচে বান। কোন্ দিকটা ঠেকায় বেতি। গলা ডোবে, ঠোঁট ডোবে, কপাল ডুবে যায়। তলিয়ে যায় জললতা বেতাই, ডুবে থাকে আড়াই দিন। বাবার সঙ্গে অন্ন নদী দেখতে আসে। নদীর লাগোয়া বিল জলে জলাক্কার, সব ডুবু ডুবু, সব ভরভর। নদীর বাঁধে ভাঙন, পথ জলমগ্ন, কোমরে কাপড় তুলে ছপছপ। এই আড়াই দিনে নদী যদি এক নয়,আধ বিঘত মরে, আকাশ যদি ক্ষান্তি দেয়, বেতাই নিজেকে জাগাবে। সে তার শীর্ষ দেখাবে সূর্যকে।

—হায় ঠাকুর তাই যেন হয়। নদী হোক মরমর, আকাশ হোক জরজর, বেতাইকে মৌকা দাও একটিবার। জলের দেবতাকে পেন্নাম করি, আকাশের দেবতাকে করি, নদীকে করি ; রক্ষা কর, বেতাই ওঠ্, মুখ দেখা...এইভাবে প্রার্থনা করেছে অন্নপূর্ণা।

বেতাই জলে ডুবে রয়েছে এ কথা ভাবলে আজও কষ্ট হয় অন্নপূর্ণার। বাবা মেয়ের মনের কষ্ট বুঝতে পারত। বলত—কষ্ট কী মা! বেতাই ঠিক উঠবে। ধানের এই

বিটি তিন-চার দিনেও মরে না। খানিকটা কাহিল হয়। তবে আড়াই দিনের দম ওর। কী করে যে বাঁচে!

—কী করে বাঁচে বাবা?

—এ হল মা গরিব চাষার খোরাক। ভারি, মোটা খসখচে চাল হয়, বাবুরা খায় না। বাবুদের ফাইন চাল লাগে। বাবুরা হজমই করতে পারবে না।

—তুমি কি বাবু বাবা, তুমিও তো খাও না!

—আমি বাবু নই অন্ন। আমি মহাজন।

—বাবুদের চেয়েও বড়!

—হ্যাঁ।

—কেন?

—কারণ বাবুরা বইয়ের অক্ষরই শুধু চেনে, বিছন চেনে না।

—আমি কী করব বাবা!

—তুমি তো অন্নপূর্ণা। অন্ন চাইলে ক্ষুধার্তকে ফিরিয়ে দিও না। বীজ চাইলে দিও।

—নোনা, পাথরকুচি, বেগুনবিচি, বেতাই, বাসমতি?

মেয়ের কথা শুনে বাবা সেদিন হা-হা করে হেসে ফেলেছিল। তারপর বলেছিল—বাসমতি এই গরির ভড়ে কেউ বোনে না, চারা করে না। বানবন্যার জায়গা, বাসমতির বীজ আমি বাঁধিনি মা অন্ন।

—বাঁধলে না কেন?

—বানে যদি সব বীজ খেয়ে যায়! বীজ হারিয়ে গেলে আমি যে অপরাধী হব অন্নপূর্ণা! মানুষ সকলে জানে আমার কাছে সব বীজ আছে এবং তা হারায় না। বিছনখেকোরা তাই নিশ্চিন্ত থাকে, মুলে খেলেও আমার গোলায় আসল মুল থেকে যাবে। আমি যে গোলোকপতি মজুতদার। আমি মানুষের গলায় গামছা বেঁধে দরকার হলে পাওনা বুঝে নিই। তুমিও নেবে। টাকায় এক আনি নাফা রাখবে, বেশি না, মাত্তর এক আনা। বীজের ধামা প্রতি ছোট হেটো বাড়তি নিবে ফিরত। এক ধামা বীজ দিলে ফিরত নিবে এক ধামা এক হেটো।

—পারব?

বাবা সেই ছোট্ট অন্নপূর্ণার মুখের দিকে চেয়ে মিষ্টি করে হেসে বলেছিল—নিশ্চয় পারবে।

—আমি যে মেয়ে! মনে মনে বিড়বিড় করে উঠেছিল কিশোরী অন্নপূর্ণা। সে জানত, বাপের সংসারে মেয়েরা চিরকাল থাকে না। বাবাও তার বিয়ে দিয়ে কোথায় যে দ্বীপান্তর দেবে ভগবানই জানে। কার ঘরে যাবে অন্নপূর্ণা? সে কেমন লোক!

কিশোরী অন্নপূর্ণার একটি জোয়ান ছেলেকে বেশ মনে ধরেছিল। সে কথা বাবার সামনে পাড়বে কে? আখেরিগঞ্জে বাড়ি ছেলেটার। ওখানকার নদী যে কী ভয়াবহ, বানভাসি হয়! ছেলেটা বস্তা হাতে করে এসেছিল তাদের বারান্দায় বেতাইয়ের বীজ

চাইতে। তাকে চাষিবাসির ছেলে বলেই মনে হচ্ছিল না। মনে হচ্ছিল এ ঠিক কৃষ্ণের মতো সুন্দর, কোথাকার যেন কে!

—কে তুমি? শুধালো অন্নপূর্ণা।

ছেলেটি লাজুক মুখে নাম বলল—ইন্দ্র।

—ইন্দ্র কী?

—আমরা ওঝা।

—মন্ত্র জানো?

—মন্ত্র!

—সাপে কাটার মন্ত্র জানো না?

—না।

—কী জানো?

ইন্দ্র চুপ করে রইল। কেমন যেন ভ্যাবাচ্যাকা খেয়েছে। তা দেখে অন্নপূর্ণা গলায় সুর তুলে খিলখিল করে হেসে উঠল। হাসির গমকে ছেলেটা কেমন আরও ভ্যাবলা হয়ে গেল।

থতমত গলায় ইন্দ্র বলে উঠল—ঠাকুদ্দা মন্ত্র জানত। শেঠের দিঘির ছোট চৌধুরিকে সাপে কাটল। ঠাকুদ্দা মন্ত্র ঝেড়ে বাঁচালে, সবাই জানে। ছোট চৌধুরি বেঁচে উঠে ঠাকুদ্দাকে ভূমিদান করলে। মন্ত্রের জমি এখন ভাঙনে খাচ্ছে, যা রয়েছে কষ্টেসৃষ্টে, তা-ও তো নদীর কোলে পড়েছে, বাবা বললে বেতিধানের বিছন আনো গে ইন্দ্রনাথ। তোমরা দেবে আধ মণ!

—তোমাদের বীজ নেই?

—না।

—কেন?

—বেতিধানের বীজ নেই।

—নোনা আছে?

—না, নেই।

—কী আছে?

—নেই।

—কিনবে বিছন?

—না। তোমরা বাঁধাই করো না?

—করি।

—তাইই দাও না আমাকে।

খুতি অর্থাৎ বস্তা প্রায় ভর্তি করে নিয়ে আখেরিগঞ্জ ফিরে গেল ইন্দ্রনাথ ওঝা। কিন্তু বৎসরান্তে আবার এল ইন্দ্র বিছন চাইতে। অন্নপূর্ণা বুঝল ইন্দ্ররা বিছনখোর। মনটা তার কেমন দমে গেল। বাবা বলল—তুমি তো বিছন পাবে না। অন্ন তোমাকে গত সন যা

দিয়েছে সেইডের হিসেব লাগাও আগে।

—আজ্ঞে বানভাসি হল যে কী করব বলুন! বেতাইয়ের জান, তবু পচে গেল, মাথা তুলতে পারল না। এই বচ্ছর দিয়ে দেখুন, দুই সনের একত্রে পাবেন। মা মনসার কিরা আপনার বিছন ফিরত দিব আজ্ঞে! বলে দাঁড়িয়ে রইল ইন্দ্রনাথ।

—ওহে আজ্ঞেচন্দ্র, তুমি গাড়ি বাইতে পারো? রাঢ়ে যাচ্ছে সাত সাতটা গাড়ি। গাড়োয়ানি করে এস তা হলেই হল, আবার পাবে বিছন। যাও। না হলে গোলা বন্ধ। তুমি মা অন্ন নতুন কুঠি খুলবে না। বলে গোলোকপতি ঘাড়ে রঙিন গামছা ফেলে মাঠের দিকে চলে গেল।

কপাট ধরে দাঁড়িয়ে ছিল অন্নপূর্ণা। বিছনখোর ইন্দ্রনাথকে সে ঠান্ডা দৃষ্টিতে দেখছিল। বাবা নতুন কুঠি অর্থাৎ মাটির গোলা, যাতে বিছন থাকে, খুলতে মানা করে গেল। বোঝা যাচ্ছে, বেচারি ইন্দ্রনাথকে বাবা বিশ্বাস করেনি।

অন্নের দিকে সভয়ে চেয়ে কাতর গলায় ইন্দ্র হঠাৎ বলল—আমি মন্ত্র জানি না অন্ন। তবে বাবা বিষ নামাতে পারে। ঠাকুদ্দার মতো বড় ওঝা নয়, তা হলেও মন্ত্র জানে। আমাদের দিগরে বাবার মান আছে। আমি যদি মিথ্যে বলি বাবার মন্ত্র কাজ দেবে না, মন্ত্র নষ্ট হয়ে যাবে।

—তুমি তো লেখাপড়াও করেছ!

—করেছি। যা করেছি, তাতে কিছু হয় না। কেন সে কথা?

—এমনি শুধোচ্ছি। মন্ত্র বিশ্বাস করো?

—আমি করি না। বাবা করে। তুমি করো না?

—না।

—ও, আচ্ছা! বলে ইন্দ্র ভীরু দৃষ্টি নামিয়ে ফেলে। তারপর ঘাড় নিচু করে বগলে ডেবে রাখা বস্তা নিয়ে ঘুরে দাঁড়ায়। পথের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে যায়। ইন্দ্র ফিরে চলে যাচ্ছে।

ইন্দ্র ফিরে যেতে যেতে বিষণ্ণ মনে কত কিছুই ভাববার চেষ্টা করছিল। মন্ত্রে কী হয় সত্যিই সে জানে না। বাপ-ঠাকুদ্দার মন্ত্রের জীবন। মন্ত্র তাদের কাছে ফক্কিকারি কিছু নয়। মন্ত্রের জোরে জমি মেলে। যদিও মন্ত্রের বদলে কারও কাছে কিছুই দাবি করতে পারে না ওঝা। ওঝার ধর্মমতে মন্ত্র বিক্রি হয় না, বিষ নামিয়ে প্রাণ দাও বিনিময়ে কিছু নেই। প্রাণতুল্য মন্ত্র আসলে অমৃত ফলায়, মানুষকে বাঁচিয়ে তোলার আনন্দই শেষ কথা। মন্ত্রবশ্যতা কী কঠিন বাসনা জাগায় মনে! বাবা ঠাকুদ্দার জমি ভালো করে কখনও আবাদ করল না। ছোট চৌধুরি দান করেছিলেন যে সম্পত্তি, তাকে ঠিক বিনিময় বলে না। সেই মন্ত্রের জমি-জিরেত নদীতে পড়েছে এখন, বাবা সেদিকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখে আর মন্ত্র আউড়ে ফেরে গ্রামে-গ্রামান্তরে। সে এক আশ্চর্য ওঝা, সংসারে থেকেও সংসারের নয়।

ফলে কলেজে ঢুকেও ইন্দ্রকে বিদ্যা উপার্জনের বাসনা ত্যাগ করতে হয়েছে, ধরতে হয়েছে সংসারের হাল মন্ত্রে তার সংশয়, তবু মন্ত্রকারকে সে কখনও কোনও কটু

কথা বলতে পারেনি। যদিও অন্যের প্রাণ বাঁচিয়ে ফিরছে বাবা আর তারা মায়েপোয়ে মরতে বসেছে, তথাপি বাবা তাদের কাছে যেন অলৌকিক প্রাণী। অলৌকিক এবং শ্রদ্ধা উদ্রেককারী।

গত সন বিছন চাইতে এসে ইন্দ্র অন্নপূর্ণার সামনে মন্ত্রের কথা উঠলেও বাবার কথা তোলেনি। এই আশ্চর্য বাবার কথা মানুষের সামনে সে আড়াল করতেই চায়। কারণ বাবার মন্ত্রই তাদের মারছে।

ঘাড় নিচু করে রাস্তায় চলেছে ইন্দ্র। রাস্তাটা মাঠের ভিতর ঢুকে অর্ধচন্দ্রাকার হয়ে আবার বার হয়ে গেছে। মাঠ বলতে শস্য-প্রান্তর। সেই দিকেই চলেছে ইন্দ্রনাথ। ওঝা। ছোট জাত। এবং বলা বাহুল্য সে ব্রতমন্ত্রহীন। গোলোকপতি চক্রবর্তী তাকে প্রত্যাখ্যান করেছে। কী ভয়ংকর কঠোর মানুষটা। নাকের, কানের, ভুরুর চুল মহাজনের দৃষ্টিকে করেছে কঠিন। ইন্দ্রকে 'আজ্ঞেচন্দ্র' বলে বিদ্রূপ করল মানুষটা। প্রণাম নিল না। সংসারের বীজ যারা আগলায় তারা কি বিধাতার মতো খেয়ালি, এই লোকটার গোলায় সমস্ত বিছন কী করে জমে উঠল?

এখন চৈত্র মাস। মহাজনের ক্ষেতে মিঠে কুমড়োর অপূর্ব রঙ ধরেছে। সাতখানা বলদের গাড়িতে বস্তা করে সেই কুমড়ো সাজিয়ে নেওয়া হচ্ছে। এই কুমড়ো নিয়ে রওনা দেবে গাড়ি রাঢ়ের দিকে। কুমড়োর বদলে ধান বস্তা ভরে ফিরে আসবে। ইন্দ্র দেখল সাতখানা গাড়ি কিন্তু ছ'জন গাড়োয়ান। ঠিক এই জন্যেই মহাজন তাকে অমন করে বলল তখন।

—কী হে যাবে নাকি? একজন গোড়োয়ান শর্ট হচ্ছে। বংশীর আবার আমেশা, বেতাইয়ের ভাতে আমেশা হয়, পেট গড়গড় করে, ভারী ভাত তো! বাবু বলচেন যখন, মাগনা-বেগার তো না। তাছাড়া তুমি হলে বিছনখোর, বাবুর কথা রাখ, চল ইটে-সরান যাই, পাচগাঁ যাব না। শর্টে শর্টে ফিরব।

গাড়োয়ানদের মুরুব্বি ইন্দ্রকে ফুসলাতে লাগল। ইন্দ্র বলল—আমার জামা কাপড় ঠিক নেই, অত দূর ভিনগাঁ যাব!

—ঠিক আছে, জামা-পিরহান দেওয়া হবে। মুনশির রেডিমেট আছে, উলোসপুরের মোহড়াতে দোকান, কী বলেন বাবু!

গোলোকপতি মাথা নেড়ে সায় দেয়। তারপর বলে—ইন্দ্রকে ভালো বলদের গাড়ি দিও সরদার। জামা-পিরহান যা লাগে মুনশিকে বলে...

—আজ্ঞে বাবু!

ইন্দ্রকে সবচেয়ে তাগড়া আর শিক্ষিত বলদ দেওয়া হয়েছে। তার গাড়ি চলছে দ্বিতীয় স্থানে। সম্মুখে শুধু মুরুব্বির গাড়ি। ইন্দ্র ভাবছিল, শেষ অবধি সে গাড়োয়ানি করছে, রাঢ়ের ইটে-সরান যাচ্ছে, কেমন আশ্চর্য ঘটনা। কিন্তু আরও বেশি সে আশ্চর্য হল যখন উল্লাসপুরের মোহড়ার দোকানে নেমে পোশাক নিতে হল। মুনশির দোকানের মেঝের উপর বসে রয়েছে অন্নপূর্ণা। হাঁটুতে ভর দিয়ে পিছনে পা ছড়িয়ে বসে তার জন্য

পোশাক পছন্দ করল মহাজনের মেয়ে।

মুরুব্বি গাড়োয়ান বিস্ময়কর খুশিতে বলে উঠল—তুমি যখন পছন্দ করে দিচ্ছ মা, ভালো জিনিসই কপালে জুটবে ছেলেডার। ওহে ইন্দ্রনাথ, ইদিকে আস দেখি! তবে মা বেশি ফাইন জিনিস দিও না, তা হল্যে পরতে নজ্জা পাবে উঝার পো।

—লজ্জা পাবে কেন, আমি যা দেব পরতে হবে। ও তো তোমাদের মতো গাড়োয়ান নয়। তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছে শখ করে! বলে একটি দামি পাঞ্জাবি হাতে উঠিয়ে অন্ন সুন্দর করে চাইল ইন্দ্রের চোখে।

ইন্দ্র বলল—আমি শখ করে যাব কেন! আমি সত্যিকার যাচ্ছি। এত দামি পোশাক কখনও পরিনি। আমাকে দিও না।

—কেন! আমি দিলে পরবে না তুমি? বলে উঠল অন্নপূর্ণা।

—মানে, তা নয়। আমাকে ঠিক মানাবে না। আমরা তোমাদের বীজ খেয়ে ফেলেছি অন্নপূর্ণা! এখন এইসব মূল্যবান জামাটামা পরলে নিজেকে খুব নির্লজ্জ মনে হবে। তুমি ঠিক বুঝবে না।

এ কথায় খুব একটা ধাক্কা খেল অন্ন। 'আমরা তোমাদের বীজ খেয়ে ফেলেছি অন্নপূর্ণা'—আশ্চর্য কাতর এই উক্তি অন্নের অন্তরে পাকিয়ে পাকিয়ে উঠতে থাকল। কখনও তার হৃদয় তার সঙ্গে এমন করেনি। খানিকটা সে কেঁপে উঠল যেন। কোনও দিন এমন এক বীজখেকোর সঙ্গে দেখা হয়নি তার। লাজুক, ভদ্র, কেমন নরম প্রকৃতির ছেলেটা। এত লজ্জা কেন ওর! যারা অভাবে-টানে বীজ খেয়ে ফেলে তাদের কি কোনও লজ্জা থাকে?

—আমি বুঝব না! গলার অত্যন্ত খাদে আপন মনে বলে ওঠে অন্নপূর্ণা। তারপর হঠাৎ পাঞ্জাবিটা ইন্দ্রের গায়ের উপর ছুঁড়ে দিয়ে বলে—আমি যা দেব, তাইই পরবে তুমি, কেউ কখনও আমাদের মুখের উপর কথা বলে না। নাও, এই ধুতিটাও পরো। জুতো? শোনো কিংকরদা, ওকে জুতোও দেবে সেনদের দোকান থেকে। বাবার নামে খাতা আছে, সেনরাই তাতে হিসেব রাখে। যাও, চলে যাও।

তারপর ধান নিয়ে ফিরে এল গাড়িগুলি। সাত দিনেই ফিরল। ধুতি পাঞ্জাবি জুতো পরা ইন্দ্রকে দেখাচ্ছিল জামাইয়ের মতো। ওকে দেখে গোলোকপতি প্রথমে অবাক হল। চিনতেই পারে না।

—ওরে কিংকর এডা কে র‍্যা! অদ্ভুত বিদ্রূপমাখা কড়া গলায় হাঁকল মহাজন।

কিংকর জবাব করল সভয়ে—আপনের গেড়েন আজ্ঞা!

অতি লম্বা বারান্দার দরজার মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল অন্নপূর্ণা। বাবার গলা শুনে চমকে উঠল।

—গাড়োয়ানের এই পোশাক! কে দিয়েছে ওকে? তোমার নাম কার্তিক? কী বাবা তোমার নাম?

—আজ্ঞে আমি ইন্দ্র। ইন্দ্রনাথ ওঝা। আখেরিগঞ্জের লোক। আপনার খাদক।

—তা এই 'বেশ' কেন বাবা!

—আমি চাইনি বাবু!

—চাওনি তো পরেছ কেন? গত সনের পাওনা বুঝিয়েছ?

—না।

—আচ্ছা বাবা কার্তিক তোমার লজ্জা করছে না? তুমি কি জানো, তুমি দেখতে কেমন হয়েছ?

হঠাৎ এই কথায় ইন্দ্রনাথের চোখের সামনে বীজময় পৃথিবীর অন্তঃকরণ কেঁপে উঠে অনুস্তুত অন্ধকার ছড়াতে লাগল। যেন সে এক অতল পাতালে ঢুকে যাচ্ছিল। পৃথিবীর স্বাদ বেতাইয়ের মতো ভারী, মোটা, খসখসে ঠেকছিল।

—তুমি খাদক। তা এখন আমার মাথা খাও। পোশাক খুলে বস্তা ধর ব্যাটা। ওরে কে আছিস বিছন মেপে দে। বলে মোড়া ছেড়ে উঠে মহাজন ভিতরে চলে গেল অন্য আর একটি দোর ঠেলে।

ইন্দ্রের মাথার ভেতরটা ঝাঁ ঝাঁ করছে। ঝিমঝিম করছে শরীর। গলা কাঠ হয়ে উঠেছে। তার বত্রিশ নাড়ি ছেড়ে যেতে চাইছে, কী করবে বুঝে পাচ্ছে না। দেখতে সে সত্যিই কেমন হয়েছে? এই অপূর্ব পোশাক সে মাত্র ক্রোশ খানেক আগে পরেছে। মুনশির দোকান থেকে বেরিয়েই অন্নের চোখের আড়াল হওয়া মাত্র সে পোশাক খুলে তার ছেঁড়া শার্ট পরে নিয়েছিল। লজ্জায় সারা পথ আর ওই অভূতপূর্ব পোশাক স্পর্শ করেনি। ফেরার পথেও অন্নের দেওয়া জামা-ধুতি-জুতো ছুঁতে চাইছিল না। গাড়োয়ানরা তাকে পরবার জন্য জেদাজেদি করেছে, ফের রসিকতাও করছিল, তাই সে খুলে রাখা ওইসব গলাতে চায়নি গায়ে অথবা পায়ে।

কেমন হয়েছ সে দেখতে? কার্তিকের মতো? গাড়োয়ানরা তাকে সারা পথ 'জামাই', 'জামাই' বলে ঠাট্টা করছিল। গ্রামেগঞ্জে এভাবে কেউ কেউ 'জামাই' আখ্যা পায়, নামটাই জামাই হয়ে যায়, আসল নাম চাপা পড়ে যায়।

আয়না বা জলদর্পণে মহাজনের পোশাকে নিজেকে দেখেনি ইন্দ্র। কারও চোখের দর্পণেও না। ইন্দ্রের লজ্জা করেছে। ইন্দ্রের লজ্জা করেছে আখেরিগঞ্জের পদ্মাভূমি থেকে জলবেতি বেতাইয়ের বীজ নিতে এই মাধবপুর পর্যন্ত দৌড়তে। বেতাই যে সবখানে পাওয়া যায় না। তা ছাড়া যাদের বা আছে, তারা জমির পরিমাণমতো বীজ রেখে বাকি সব গিলে ফেলে। গোলোকপতি মহাজনের সুনাম আছে, কাউকে সে বিছন না দিয়ে ফেরায় না। তার কাছে ভগবানও বীজ বাঁধাই করেন, কখনও ঈশ্বরের কোনও বিছন হারিয়ে গেলে, তিনি গোলোকপতির কাছে হাত পাতবেন।

মহাজনের এক হাজার একটা বিছন-কুঠি। মাটির সেইসব গোলা সাজানো রয়েছে গোলাবাড়িতে। প্রত্যেক কুঠির গায়ে ফুলখড়ি দিয়ে লেখা শস্যের নাম। লিখেছে মহাজনের মেয়ে অন্নপূর্ণা। শস্যের বানান নির্ভুল লেখার মতো বিদ্যা জানে মেয়েটা। একবার এখন সেই গোলাবাড়ি দেখার সাধ হল ইন্দ্রের। শুধু বীজ, শুধু বীজ, হা ঈশ্বর তোমার ছড়ানো

মহৎ বীজেরা এখানে ঘুমিয়ে রয়েছে পরম শান্তিতে।

দানার উপর অক্ষর লিখতে পারে ইন্দ্র। মহাজনের বহির্প্রাঙ্গণে ছ'গাড়ি ধান এল। একখানিতে এল বাসমতি চাল। চালের গাড়িটি খেদিয়ে এনেছে ইন্দ্রনাথ। কী আশ্চর্য সুবাস সেই চালের। বস্তার একটিতে অতি ক্ষুদ্র ছিদ্র ছিল। সেই ছিদ্র গলে চাল এল ইন্দ্রের মুঠোয়। কান্দীতে যখন এক রাতে গাছতলায় বিশ্রাম নিচ্ছিল ওরা, তখন কাছের একটি দোকান থেকে সোনামুখি সূঁচ জোগাড় করে নেয় ইন্দ্রনাথ ওঝা। সেটা দিয়ে তুলি বানিয়ে নেয় সে। চালের দানার ওপর আঁকে অক্ষর। 'বাসমতি তুমি আমার'। ন'খানা অক্ষরে লেখে কথাটা। তারপর ন'খানা চাল বাঁধে একটি সাদা ট্যানায় অর্থাৎ কানিতে। ন' অক্ষর ন'টা চাল।

এটা একটা মজা। কানিখানা হাতে নিয়ে বিষহরি গানের একটি কলি আউড়ে ফুঁ দেয় ইন্দ্র। 'কালিদহের কূলে কালো মেঘ যেন সাজিল রে'—এই হচ্ছে কলি। বিষহরি মন্ত্রই বুঝিবা। এই 'কালো মেঘ' আসলে কৃষ্ণ। এইভাবে সে যেন তুক করছে কাউকে। কাকে? অত বোকা নাকি ইন্দ্র! নাম বলে মরবে নাকি! মুঠো তুলে দেখাবে খালি। বলবে, এই ট্যানায় চাল আছে। চাউল। চাউল সেদ্ধ হলে যা হয়, তাকে সাধু করে বল, তাকেই তুক করলাম গো।

ইন্দ্রনাথ গায়ের পাঞ্জাবি খুলতে খুলতে পাকা দালানের মেঝেয় ফুঁ দিয়ে দিয়ে ধানশস্যের ধুলো সরায়। গাড়ির কাছে এসে তার গামছাখানা নেয়. তারপর আবার ফুঁ দেয় মেঝেয় এসে এবং গামছা দিয়ে জায়গাটা মোছে। পাঞ্জাবি এবং ধুতি খুলে পরিষ্কার জায়গাটায় রেখে দেয়। জুতো খুলে রাখে থামের গোড়ায়।

নিজের শার্ট আর পাজামা পরে নেয়। সেফটিপিন দিয়ে আটকানো ফিতের হাওয়ায় চপ্পল পায়ে গলিয়ে নেয়। চপ্পলের চটা উঠেছে, একটির খানিকটা এমন ক্ষয়ে পাতলা হয়েছে যে কখন আধখানা খসে যাবে বলে ভয় হয়। ভয় অবশ্য ইন্দ্রেরই হয়। তাই সে সাবধানে পা ফেলে হাঁটে এবং ভয়ে ভয়ে ভাবে সেফটিপিনটা বুঝি খসে পড়ে! ওই চপ্পলই ইন্দ্র যত্ন করে পায়ে পরল।

আধ-ময়লা শার্টটা লাইফবয় সাবান দিয়ে রাঢ়ে কেচে নিয়েছিল, সেটাও ব্যবহারে হালকা হয়ে এসেছে, কলারের কিছুটা ছিঁড়েছে, শার্টও গলিয়ে নিল সাবধানে। ইস্তিরিহীন ধোয়া পাজামার ফিতে বেঁধে নিল।

কপাট ধরে দাঁড়িয়ে থাকা অন্নের দিকে সসংকোচে চোখ তুলে চেয়ে ইন্দ্র বলল—আমার বস্তাটা দাও। বলেই লক্ষ করল অন্নের চোখ দু'টি কেমন ছলছল করছে।

ইন্দ্রের কথাটা শুনে হঠাৎ কেমন খটকা লাগল অন্নপূর্ণার। চমকে উঠল সে। তারপর কিছু ভেবে না পেয়ে বারান্দার কোণে পড়ে থাকা ইন্দ্রের বস্তাটা তুলে এনে হাতে ধরে রেখে বলল—নেবে না?

—কী?

—বেতাই।

—দাও তাহলে! বলে ইন্দ্র দু'পা ফাঁক করে দাঁড়াল উঠে মেঝের উপর এবং বস্তার মুখ ফাঁক করে পায়ের তলায় ফেলে ধরল বস্তা। অন্নপূর্ণা দাঁড়িপাল্লা আর বাটখারা এনে ধান মেপে দিল। আধ মণ বীজ। মাপা শেষ হলে দড়ি দিয়ে মুখ বাঁধতে গিয়ে ইন্দ্রনাথের আঙুল স্পর্শ করল অন্ন এবং কেঁপে উঠল। তার চোখ নত হয়ে এল।

নত চোখ হঠাৎ ইন্দ্রনাথের মুখের উপর মেলে ধরে মহাজনী গলায় অন্ন বলে উঠল—তোমার কাছে এক মণ দুই হেটো পাওনা হল ইন্দ্র। ধান উঠলে দিয়ে যেও। অন্নের বলার মধ্যে কোথাও যে একটা চাপা অভিমান বেজে উঠেছিল সেই সুর ধরতে পারল না ইন্দ্রনাথ ওঝা।

বাঁধা বস্তা ছেড়ে উঠে দাঁড়াল ইন্দ্র। অন্নের চোখের দিকে চাইতে পারল না। এক লাফে সে সিঁড়িতে নেমে এল। সিঁড়ি থেকে বাইরের এই আঙিনায় এবং ঘাড় গুঁজে হেঁটে চলল পথের দিকে।

পিছন থেকে ডেকে উঠল অন্ন—নেবে না?

কোনও উত্তর দিল না ইন্দ্রনাথ।

—নেবে না তুমি? আর্দ্র আর ব্যাকুল হয়ে উঠল অন্নপূর্ণার কণ্ঠস্বর।

—না।

—নিয়ে যাও ইন্দ্র। রাগ করো না। শোনো। যেও না। আমাকে বাবা বলেছে। কেউ যেন না ফেরে খালি হাতে।

যেতে যেতে হঠাৎ এবার দাঁড়িয়ে পড়ল ইন্দ্রনাথ। পিছন ফিরে বলল—আমি আখেরিগঞ্জের ছেলে অন্নপূর্ণা। আখেরি মানে শেষ, এরপর আর নেই। তারপর শুধু জল। মাটি নেই। ভারতবর্ষ নেই। আমরা কারও উপর রাগ করি না। আমি জানি মহাজনের বীজ আর ফেরত দিতে পারব না। হঠাৎ মনে হল, বিছনখেকো হয়ে বাঁচার চেয়ে মরা ভালো। পদ্মা আমার দিকে তেড়ে আসছে অন্ন। আমার আর সময় নেই। চলি।

চলে যেতে যেতে ফের ফিরে আসে ইন্দ্রনাথ। ন'অক্ষরী বাসমতির ট্যানা সে গোয়ালঘরের নিচু চালের বাতায় গুঁজে দেয়। তারপর ছুটতে শুরু করে পথের দিকে।

গোয়ালঘরের চালার কাছে ছুটে আসে অন্নপূর্ণা। বাতায় গোঁজা ন্যাকড়া টেনে বার করে নেয়। খুলে দেখে ন'খানা চাল বাঁধা ছিল। অবাক হয়। মাথায় তার কিছুই ঢোকে না। ন্যাকড়ার গিঁট বাঁধে চালসুদ্দো। তারপর ছুটে যায় পথে। ছুটে চলে যাচ্ছে ইন্দ্রনাথ। সেদিকে চেয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়া অন্নপূর্ণার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে।

হাতের মুঠো থেকে চালবাঁধা অতি ক্ষুদ্র পুঁটলিটা ফেলে দিল না অন্নপূর্ণা। আবার তা নিয়ে কী করবে ভেবেও উঠতে পারল না সারাটা সন্ধ্যা। রাত্রি বেড়ে গেল। চৈত্রের হাওয়া পাকা দালানের মস্ত ছাদে তরঙ্গের মতো বইছে। আশ্চর্য ধুলোয় আচ্ছন্ন আকাশের চাঁদ। সেই দিকে চেয়ে হঠাৎ মনে হল, মুঠোয় ধরা চালগুলি আসলে তুক। নইলে অমন চোরের মতো ন্যাকড়াটা গোয়ালঘরের চালের বাতায় গুঁজে দিয়ে পালাল কেন ইন্দ্র?

ভাবতে বসে অন্নের হাসি পেল। কাকে তুক করল বেচারি ইন্দ্রনাথ? অন্নকে? অন্ন

যেন তার হয়! এইসব ভাবনার আশ্চর্য পীড়নে চোখে জল এসে গেল। নীচে নেমে কাচের গেলাসে জল নিয়ে আবার ছাদে এল অন্নপূর্ণা। তারপর ন'অক্ষরী চাল, এই অক্ষর পড়ে উঠতে পারেনি অন্ন, কারণ ওতে যে অক্ষর এঁকেছে ইন্দ্র তা সে ভাবতেই পারছে না, সেই চাল জল দিয়ে গিলে নিল। মনে হল, তার কেমন আচ্ছন্নতা ঘিরে আসছে বুঝি! ভেবে আবার হাসি পেল তার! কান্নাও পাচ্ছিল।

সারা রাত ঘুমাতে পারল না অন্নপূর্ণা। বিছানায় শুয়ে ছটফট করল। ভোরে হঠাৎ মনে হল, ইন্দ্রনাথ মন্ত্র জানে না। তাহলে বাতায় কেন গুঁজল অমন করে এই চালের ন্যাকড়া? সে জানে না ঠিক, তবে তুক-করা লোক তো সংসারে আছে। তারাই কেউ ইন্দ্রকে ওই চালে মন্ত্র পড়ে দিয়েছে। বলেছে, বাতায় গুঁজে দিতে। যত অন্ন ভাবে, ততই মনে হয় সে কারও প্রেমে পড়েছে। মন তার আশ্চর্য চঞ্চল হয়ে উঠল।

নিজেকে বলল—আমার উপর তুক করেছে ইন্দ্র। অতএব আমাকে যেতে হবে।

—কোথায় যাবে তুমি? গোয়ালঘরের চালে বসে থাকা একটি লাল টুকটুকে মোরগ অন্নকে শুধালো। এই বদমাশ তুখোড় জীবটা বিছন খায়, কুঠি খুললেই তাক করে ছুটে আসে। ওকে সামলানো যায় না। ওর দু'পায়ে অদ্ভুত জোর, ডানায় আশ্চর্য সাহস। নখে তীব্র ধার। গলায় বীজ-খাওয়ার উল্লাস। এই মোরগটার নাম চুনিলাল।

চুনিলালকে অন্ন বলল—তোমার মতো সাহস নেই যার, তার কাছে যাব।

—কার কাছে কার কাছে! চোখ পিটপিট করে জানতে চাইল চুনি।

অন্ন বলল—যার তোমার মতো তুখোড় ডানা নেই, যে ঝাপটা জানে না, তার কাছে।

—কার কাছ বললে!

—যার তোমার মতো ধারালো নখ নেই, ঠোঁট নেই। আমি নিশ্চয় যাব। চিরকালের মতো যাব।

—বীজ নিও সঙ্গে। বেতাই। আড়াই দিনের দম।

—নিশ্চয়। আমি সব কিছুর বীজ সঙ্গে নেব। মানুষের সংসারে যা যা বিছন লাগে, সব নেব। আমি আর ফিরব না চুনিলাল।

—তুমি যে চক্রবর্তী মহাজনের মেয়ে গো! কালীদহে যাচ্ছ! মানুষের বীজে সইবে নাকি!

—তুমি চুপ করো। আগেই বলেছি, আমি আর ফিরব না। এই বলে গাড়োয়ান ডেকে গাড়ি সাজাল অন্নপূর্ণা। সাজাতে সাজাতে মনে হল, কোন আকাশে কালো-নীল মেঘ যেন সেজে উঠেছে। তার বর ইন্দ্রনাথকে সে মনের মতো করে সাজাবে।

'কালীদহের কূলে কালো মেঘ যেন সাজিল রে...'

অন্নপূর্ণার হাতে দুনিয়ার সকল বীজই যেন সেজে উঠল। ধান ছাড়াও সে সঙ্গে নিয়েছে ঝিঙে, লঙ্কা, করলা, শশা, কুমড়ো, ফুটি, বেগুন, চিচিঙ্গা—সব, যা লাগে। সে নিয়েছে সরষে, ছোলা, গম, যব, তিসি, তিল। ভড়ের মাটিতে যা যা সক্রিয় এবং শোভন

কিছুই যেন বাদ নেই। বীজেরা যেন মুকুট পরে আজ অন্নপূর্ণার সঙ্গে চলেছে।

সূর্য ডোবার আগে গরুগাড়ি করে আখেরিগঞ্জ পৌঁছল অন্নপূর্ণা। ভারত এখানে শেষ হয়ে এসেছে। পদ্মা এখানে গর্জ্জমান, বধির, চক্ষুহীন এবং একগুঁয়ে। ঢেউয়ের শত-সহস্র-লক্ষ্য জিহ্বা মানুষের বসতি-মৃত্তিকাকে ভিলেনের মতো লালসায় চাটে। চাটে আর খায়।

হরনাথ ওঝা মহাজনের মেয়েকে দেখে ভয়ে কেমন সিঁটিয়ে গেল। আরও ভয় পেল যখন হরনাথকে প্রণাম করল অন্নপূর্ণা। হরনাথের মাটির দেওয়াল গাঁথা চারচালা পদ্মার ক্রোধ-রসায়িত-হিংস্র হাওয়ায় মটমট করছে, ভেঙে পড়ে যাবে বলে কাঁপছে।

শস্য-বীজ গাড়ি থেকে নামাতে গেল গাড়োয়ান ; অন্ন বলল—আমি বেতাইয়ের বিছন এনেছি বাবামশাই, আপনার ছেলেকে ডাকুন।

থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল হরনাথ। মুখ দিয়ে বাক্যস্ফূর্তি হতে চাইল না। হঠাৎ কেমনই আটকা-শব্দ ছিটকে এল মুখ থেকে—থাক্! বলে হাত তুলল হরনাথ গাড়োয়ানের দিকে।

—কেন বাবা! এখানে আমি থাকব বলে এসেছি! বলেই দূরে চেয়ে দেখল অন্ন, পদ্মার দিক থেকে এগিয়ে আসছে ইন্দ্রনাথ। খালি গা, কাদার ছিটে লাগা। পরনে ময়লা লুঙ্গি। মাথায় মাথাল।

প্রথমে খুবই অবাক হল ইন্দ্রনাথ। চেয়ে দেখল অন্নপূর্ণার চোখে চাপা অশ্রু চিকচিক করছে। গাড়ির বস্তাগুলোর দিকে চোখ গেল ইন্দ্রনাথের। বস্তার মুখ খুলে খুলে বীজগুলি হাতে তুলে পরখ করল সে। সবগুলি দেখে উঠতে বেশ খানিকটা সময় লাগল তার। তারপর চোখ তুলল।

—নেবে না?

—না।

—একটা বীজও নষ্ট নেই ইন্দ্র। আমি বলছি, তুমি নেবে না? প্রত্যেকটির অঙ্কুর হবে। প্রত্যেক গাছে শিষ হবে। বেতাই মুখ তুলবে। আমি যাব না। কিছুতেই যাব না আমি। তুমি নাও।

হরনাথ বলে উঠল—সব বীজ মাটি পায় না মা। উড়ে বেড়ায়, ভেসে বেড়ায়, আঁধারে, কালীদহে, সব ন্যাংটো ; পোশাক পায় নাই, আত্মা পায় নাই, আর অন্তর পায় নাই, শুধু বীজ কী করব মা। যদ্দিন বিষহরির মাটি পদ্মা না খেয়েছে তদ্দিন বীজখেগোরা গেছে দরবার করতে। মাটি না থাকলে বিছন কেউ দেয়, তুমিই বলো! গতকাল ভোরে মাটি চলে গেছে। এখন আমাদের কালান্তরে যাত্রা। তুমি এস। ওরে ইন্দ্র, গরুর কাঁধে জোয়াল উঠায়ে দে।

—নাও, ধরো হে। হাত লাগাও। বলে গাড়োয়ানকে হাঁক দিয়ে উঠল ইন্দ্রনাথ ওঝা।

আশ্চর্য কঠিন দেখাচ্ছিল ইন্দ্রের মুখ, ইন্দ্রের বাহু।

গাড়োয়ান বলল—ছইয়ের ভিতরি ঘুসে যাও গো অন্নদিদি। সাঁঝ হয়েছে।

চোখের কোণের জল আঁচলে মুছে নিয়ে গাড়ির ছইয়ের ভিতর ঢুকে পড়ল অন্নপূর্ণা।

পিছনে চেয়ে বসে ছিল অন্নপূর্ণা। হঠাৎ ডাকল—তুমি আমাকে এগিয়ে দেবে না ইন্দ্র? পাকা সড়ক পর্যন্ত তুলে দিয়ে এস।

গাড়ির পিছুপিছু এগিয়ে চলল ইন্দ্রনাথ। সহসা বলল—আমারই শুধু একার যায়নি অন্নপূর্ণা। পদ্মা প্রতি সন ভাঙছে। গোটা বসতি, বাজার, দোকানপাট সবই গেছে। খবরের কাগজে মাঝে-মিশেলে খবর হয়।

—তুমি চলে এলে কেন?

—এসে দেখি বিষহরির জমি তলিয়ে গেছে, কষ্টের আর কী রইল! সবই এখন জলের মতন সমান।

—তুমি তুক করলে কেন ইন্দ্রনাথ!

—তুক!

—ন'টা চাল। শুনেছি। বলো, তোমার সাহস কী করে হল!

—চালের গায়ে আমি অক্ষর লিখেছিলাম। তুক কেন করব! আমি তো মন্ত্রই মানি না অন্ন।

—কী লিখেছিলে?

—তোমাকে বলব কেন?

—বলোই না। আমি তো চলেই যাচ্ছি।

—বাসমতি,তুমি কার?

—আটটা হল যে!

—ন'টা করবার সাহস কোথা অন্ন! ভাস্যিস জমিটা গেছে! নইলে কী করে ফিরতে অন্নপূর্ণা!

অন্নপূর্ণা বাড়ি ফিরতে ফিরতে ন'টা অক্ষরই ফিরে পায় দানায় দানায় চাউলে চাউলে মনে মনে তখনই প্রবল চিৎকারে নখরাঘাতে বুকের ভিতরে ছিঁড়ে রক্ত ঝরিয়ে দেয় চুনিলাল, ডানার ঝাপটা দিয়ে ঠোঁট বাড়ায় প্রতিটি অক্ষরের দিকে।

বাসমতি তুমি কার? বাসমতি তুমি আমার।

পথ

মোরামের লালমুখো সড়কটা গোয়াস-কালিকাপুর হয়ে হরিরামপুর ঘাট পেরিয়ে লালবাগ যাওয়ার সময় খোদাদিলের উঠোন দু'ফাঁক করে চিরে বেরিয়ে গেল। রাস্তার দু পাশে শোয়ার দু'খানি ঘর পরস্পর বিচ্ছিন্নই শুধু হল না, হেঁসেল এল দক্ষিণে তো ঘোড়ার ভুসিঘর রইল উত্তরে। ঘটনা ঘটল আরও অদ্ভুত। খোদাদিল বেশ অবাক হয়ে খেয়াল করল, স্থানাভাবে ঘোড়াটা উত্তরে পা ঠুকছে দাঁড়িয়ে, দক্ষিণে পড়ে রয়েছে তার গাড়ি। ঘোড়াকে জুতবার সময় উত্তর থেকে দক্ষিণে টেনে আনতে হয় রাস্তা পার করে লাগাম ধরে এবং লক্ষ করতে হয় রাস্তায় কী আছে না আছে, লোক, সাইকেল কিংবা গরুগাড়ি অথবা অন্য কিছু। জীবন যে একটা মস্ত ঝকমারি সন্দেহ নেই।

লোকে কেউ কেউ খোদাদিলকে ঘোড়াদিল বলে ডাকে,তাতে অবশ্য তার মুখ বেজার নেই ; মনে মনে সে ভাবে, অমন করে কেউ ডাকলে খোদারই অপমান হল, তার তো কিছু নয়। আসলে সে দিলু টাঙাঅলা। এই ঘোড়া করেই ইমাম হোসেন কারবালার যুদ্ধ সেরেছেন, পেকান্ড একটা জং-এ-কারবালা, তিয়াসা আর লহু, রক্ত আর পিপাসা, আসমানের নিহরে ভিজে গেছে অশ্বের কেশর, ঘামে ভিজে উঠেছে ঘোড়ার পেট, ঘোড়ার নিঃশ্বাস-শ্বাসে ঝরেছে জরিনা কি আসগরের শোক।

ডাইনে সাপা বাঁয়ে শৃগাল
ধীরে চালাও পা,
আসগার যেন রণে যায় না—
ওরে মা সারেভান
ঘোড়ার কাঁপে গা,
আসগার যেন রণে যায় না।

দিলুর হচ্ছে জং-এ-সংসার, তাকে নিত্যই রণে যেতে হয়, লহু-তিয়াসা-পাসিনার টাট্টুর পাহিতে অর্থাৎ চাকায় বাঁধা গেরস্তালি ; ডাইনে সাপ, বাঁয়ে অলক্ষুণে শেয়াল পড়লই বা পথে, তাকে প্যাসেঞ্জার টেনে গঞ্জে যেতেই হবে। লাল সড়কের খোয়া গুঁড়ো হয় পাহিতে, ঘোড়ার লেজে লাগে লাল ধুলা, বর্ষায় লাল কাদা, শীতে লাল শিশির, তবু বাঘা দুলদুলির ঘন্টাধ্বনি থামে না।

দিলুর মুশকিল হয়েছে, সে কাউকে কিছু বলতে পারছে না। লাল পথটা যে তাকে এভাবে চিরে দিল, ট্যানা বানালো, কার কাছে নালিশ জানাবে। সে এমনিতেই ঘোড়াদিল, পথই তার জীবন। পথ আছে বলেই তার ঘোড়া আছে, সে আছে। পথটা কাঁচা ছিল, মোরাম পড়ে হটরমটর লাল হল, তাতে মস্ত সুবিধাই হয়েছিল তার। কাঁচা পথে শুকনোর

সময় বর্ষা পেরোলে, সারাটা শীতগ্রীষ্ম গঞ্জ থেকে রিকশা ঠেলে ঢুকত গাঁয়ে। মোরাম পড়ে পথ গেল ভেঙে, আধলা ইট এবং গাভলা-গর্ত এবড়োখেবড়ো করে দিল কাঁচা পথের আয়েস।

পথের গা-লাগা ভৈরব নদী বান-ডুবানি করত পথের আর্ধেকটা, বর্ষাবানের দকি-নুনে অর্থাৎ বালিপলিজলে পথটার চোয়াল এবং টাকরা খেয়ে দিত, পথ রিকশার পক্ষে হয়ে উঠেছিল বিপথ। বর্ষা নেমে গেলেও রাঙা পথটা কিছুতেই সুতরো হত না। এই যে গাল-খাওয়া পথ, চোয়াল-ভাঙা, টাকরা-দলানো পথ এ বেশ বাঘা দুলদুলির পক্ষে চুস্ত ; কাত মেরে, হড়কে, হকচকিয়ে চমকে মচকানি-মোচড়ে প্যাসেঞ্জার টানত। গোপাল হাজীর নাদুস বিবিকে গঞ্জ থেকে টেনে এনে বাঘা তো বেচারির মেদবহুল কোমর ছেঁচে দিয়েছিল গত সন। পাহি ভাঙো-ভাঙো হয়েও ভাঙেনি, বিবির হাড় চটে গিয়েছিল।

জিভের চাটকি আর হাতের ছিপটি হচ্ছে বাঘামুণ্ডা দুলদুলিকে খেদানোর চাল। পথটা যদি কখনও কালো চৌরশ হয়, হাতের তালুর মতো মসৃণ, তা হলে রিকশা নেমে পড়বে কাতারে কাতারে। এই পথটাই ময়ালের মতো তাকে টাঙাসুদ্দো, ঘোড়াসুদ্দো গিলে ফেলবে। লাল যেন কালো না হয় খোদাবন্দ। হায় রসুল এ কেমন কথা গো!

—কী ভাবছ মোড়লের পো?

—পথ।

—পথ তো কুথাও যায়নি শ্বশুরের ছাওয়াল! আছেন বটে সিঁথানমুখো। মুন বুলে, এক্কেরে গভ্ভে ঢুকে যাবে, নিদের মহুতে চমকায় ছানাপুনা। একখানা পথ ডিঙোয়ে মাগের কাছে নিশুতে আস রেতের বেলা, তুমার সিনায় লাগে না? ইজ্জতে বিঁধতে না, তুমি না কমরেড। পথডারে বাঁকায়ে দিতে পারো না, ন্যাজডারে মুচড়ায়ে দিতে পারো না? মুচাড়াও দিহিনি, দেখি মুরাদ কেমুন! পারবা?

—না, সুনাভান, পারব না! গলার খাদে পরাস্ত স্বর খেলে উঠে একটা দীর্ঘশ্বাস টেনে বার করে দেয় খোদাদিলের। খোদাদিল মুনশি তার ঘোড়ার মুখের দিকে চেয়ে থাকে।

দিলু জানে, ঘরের বাচ্চারা যে চেরা পথের ঘরে ঘুমোয় তা নিদের মহু অর্থাৎ নিদ্রার মউ, কিন্তু মধু-মাখনি ঘুমেও চমকে ওঠে ছ্যানাগুলান, কারণ সারারাত পথে হাটুরে মানুষ; দালাল, সাইকেল চলে, এরা না চললে চালানি গরুর দল বাংলাদেশে পাচার যায়। সারারাত্রি এ লাল সড়ক খটখটায়, ঘুমের ভেতরে শিশুরা চমকে ওঠে। এই বিঘ্নিত ঘুমের মধ্যে স্ত্রীসহবাস খিঁচড়ে দেয় পথ। এই পথ মানুষের যৌনকেন্দ্রে জিহ্বা চালিয়ে দেয়। বউয়ের গর্ভেই যেন ঢুকে পড়তে চায়।

অথচ এ পথ ছিল বাড়ির পাশে, সরকারি জরিপে বাড়ির মাঝখানে দখল নিয়ে ঢুকে চিরে বার হয়ে গেল। খোদাদিল কিছুই করতে পারল না। পি ডব্লু ডি-র হিসেবে বাধা দিয়ে কোনও নিশেনই টাঙাওলা ওড়াতে পারে না। পঞ্চায়েতে কোনও অভিযোগ দাখিল করতে পারে না। নেতা বলেছেন, পথ হচ্ছে প্রগতি, পথ না দিলে, লোকে আর আমাদের

পুছবে না মুনশি ভাই, তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে। চিন্তা কোরো না, তোমার ঘোড়ার জন্যও তো পথ দরকার।

—পথডা কদ্দিন লাল থাকবে শিবেনদা?

—কালকেপুরের বাজারের গোড়ায় পিচ ফেলে রোলার টানা হয়েছে, শিগগির কালো হবে। শহর যখন গাঁয়ে ঢুকবে তখন লালমুখো সড়ক নিয়ে ঢুকবে, তারপর কালো হয়ে যাবে। এইই হচ্ছে প্রগতির নিয়ম। লাল তারপর কালো। তোমার ঘোড়ার কী রঙ দিলু ভাই?

—কুচকুচে কালো শিবেনদা।

—তাহলে ভাবছ কেন? কালো ঘোড়া প্রগতির লক্ষণ ভেবে মনে সাহস রেখো।

—ঠাট্টা করছেন?

—না। এই যে তুমি মুখ বুজে সহ্য করছ, এটা আমরা মানুষকে বলছি।

—আমি বাপ-মা মরা এতিম। বাঘামুণ্ডা আমার বাপ-মা। কালো তো কী? আমিও কালো, পথটাও কালো হবে শিবেনদা। তারপর সব মিশিতে লেপে যাবে। ভালোই হচ্ছে দাদা। বউ সোনাভান ঘোড়ার কপালের সাদা চিতেয় মেহেদি লাগিয়ে লাল করেছে দেখে আপনি একদিন বেজায় তারিফ করলেন মুনে আছে?

—তা আর নেই! তুমি ক্ষতিপূরণ পাবে দিলু।

—কত?

—দেখা যাক।

হাজার দেড়েক টাকার ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা হয়েছিল বটে, কিন্তু শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসল খোদাদিল। সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়ে বলল—ওই টাকা আমি প্রগতিকে দিনু শিবেনদা! উঠানডা দান করছি। লিখে দ্যান সমাচার, আমি দিচ্ছি। বলে অফিস থেকে বুক ফুলিয়ে বার হয়ে চলে এল টাঙাঅলা। নবসাক্ষরিত দিলু টাকার অঙ্কের পাশে নাম সই করল না।

পথে বেরিয়ে একা একা মতিলালতলার পাকুড়ের ঠেকে এসে চায়ের দোকানের বাতার বেঞ্চে বসল, এখানে তার ঘোড়া পাকা রাস্তার ধারে চরছে, গাড়িটা পড়ে আছে পাকুড়ের ছায়াতলে। গুম মেরে বসে থেকে দোকানে এক গেলাস চা চাইল এবং গরম চায়ে ডুবিয়ে একখানা গোল পাঁউরুটি খেল। তারপর বেগনি সুতোর বিড়ি ধরালো চাকতি লাইটারে। ওর ঝোলা গোঁফ ছাপিয়ে ধোঁয়া গলগল করে ছুটতে লাগল, ঘাড়ের গামছা দিয়ে সে মুখ-ঘাড়ের ঘাম মুছে নিচ্ছিল। কেমন যেন গরম ধরে গিয়েছে, পায়ের হাড়মটমটি স্যান্ডেলে ঘাম নামছে। গলার কালো ডোরবাঁধা তাবিজে সূর্যের আলো ঝিলমিল করছে।

খেঁকুড়ে ঘোড়া হলে প্যাসেঞ্জার ওঠে না। ভালো দানাপানি না করালে ঘোড়া তাগড়া হবে কিসে! চালের তুষগুঁড়ো, খইল, ফ্যান, ভুসি, ঘাস, চিটেগুড়, চাপাতি এবং চানা। কাঁচা মটরশুঁটি, খেসারি খাইয়ে ঘোড়ার গায়ে বিজলি ছোটাতে হবে। গা-ধোয়ানি

ছোবা, চুলচাটের খুরপি সব আছে। কেশরের যত্ন চাই। ঘোড়ার চোখ থাকবে সাফা, পিচুটি পড়বে না। সারাক্ষণ মেহমানের মতো রাখো, আপনি-আজ্ঞে করো, একটা মাত্র চুটকি কি জিভের আড়, টরর-টরর করলে কি বাঘামুণ্ডা গতরে বেগ ধরিয়ে ছুটবে।

না হলে কী হবে! হাঁটতে হাঁটতে ঝিমুনি দেবে, চাকা গর্তে সেঁধোলে দাঁড়িয়ে পড়বে, ঘাড়খানি লতপতাবে, ছিটকি মেরে পিঠ বাঁকায়ে দিলেও ঘোড়াটি আর যাবেন না। শুধু চিঁচি করবে। ইনি হলেন কারবালার কাসিদ, অর্থ হচ্ছে, যুদ্ধের খবর আনেন এই জীবটি, কাসিদ হচ্ছে দূত, সেইজন্যে বলে না, ঘোড়ার মুখের খবর। ঘোড়া খবর দেয় ইনসানকে, লহু-পিয়াসা-পাসিনার খবর, রাহী কোথায় গেলেন, বীর কোথায় কহরে পড়লেন, কোথায় মরে পড়ে রইলেন, মুণ্ডা দুলদুলি খবর কি দেবে না সংসারকে! লাল সড়কের কালো ঘোড়া এই একটা জবরদস্ত বাঘ, এনার মুখে জীবনের ফেনা জাগছে হে খোদাদিল্।

তার ঘোড়াটিকে খোদাদিল্ কখনও বাঘা কখনও মণ্ডা নামে ডাকে। মণ্ডা সে উচ্চারণে আনতে পারে না, মুর্শিদাবাদি ভাষায় মুণ্ডা কয়।

চায়ের গেলাস ফেরত দিয়ে ফুলশার্টের পকেট থেকে খুচরো পয়সায় দাম মিটিয়ে ঘোড়ার দিকে এগোল খোদাদিল। মুণ্ডাকে সর্বক্ষণ সাজিয়ে রাখে দিলু। মাথায় বেড় দিয়ে রেখেছে একটি লালফিতায়, চিতের কাছে একটা সোনারঙ করা রুপোর পদক ঝুলছে, ফিতার সঙ্গে প্লাস্টিকের ঝুরো ফুল আগুনের মতো জ্বলছে। গলায় বেল্টে গাঁথা ছোট ছোট ঘন্টা। মাঝে মাঝে গাঁদাফুল ইত্যাদির মালা পরিয়ে দেয়। লেজ চমৎকার করে আঁচড়ানো। সমস্ত শরীর তেল চকচকে লাবণ্যে ছটফট করছে।

—মুণ্ডা! সতেজ সোহাগে ডেকে ওঠে দিলু মুনশি।

রাস্তার পাশের ছোট ছোট ক্ষয়াটে ঘাসের ডগা চিবুচ্ছিল বাঘা। মনিবের ডাকে মুখ তুলল। খোদাদিলকে একবার শুঁকল। তারপর ঘাড় বাঁকিয়ে মনিবের কাঁধে গলাটা ফেলে একটা আদুরে আয়েস করল প্রাণীটা, যেন দিলুর কানে মুখ রেখে পরামর্শ দিচ্ছে।

—ওই টাকা আমি নিনু না বাঘা। সরকারকে খয়রাত দিনু ভিটার আগুনে। ভালো করি নাই?

বাঘা যেন মনিবের কাঁধে রাখা মাথাটা এপাশ-ওপাশ নাড়িয়ে কথার সমর্থন করল।

—ঘোড়াওলার গুমোর দেখবে লোকে।

—চিঁহিহি।

—সুনাভান কী বুলে সেইডে চিন্তা বাপা রে।

—হুসো-হুসো! মণ্ডার জবাব।

—চ, গোয়াস-কালকেপুরের মোহড়ায় প্যাসেঞ্জার ধরব। নলবাটার বেপারি, ঈশাননগরের ডিমঅলা, হাড়িভাঙার পিরহানওলা, বালুমাটির ভাঙড়িঅলাকে পাব। চ দেখি, তাগদদার।

ঘোড়া গলাটা নামিয়ে নিল। মুণ্ডা বুঝতে পারছে, এবার তাকে যেতে হবে।

আজকে গোয়াসের হাট। দুপুর গড়ালেই হাট মরে যায়। চক-ইসলামপুরের মতো সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে না। ওখান থেকে এখন এই গড়ানে দুপুরে হাটুরে লোক পাওয়া যায়। মানুষ পিছু সাত টাকা, পাঁচ টাকা, দশ টাকা পর্যন্ত প্যাসেঞ্জারি। বেপারিরা দর নিয়ে কচলায় না।

আজ খোদাদিল গোয়াস যাচ্ছে আরও একটা তলবে। পিচ কতটা পড়ল। টাকাটা অস্বীকার করে মনটা গুমোরে আছে আবার নিস্তারেও নেই। টাকাডায় সই করলে একখানা মজবুত পাহি হত। ঘোড়ার জন্য চিটেগুড় আর খইল নিতে পারত। চকজমার বিশ্বাসবাড়ির ফাইন ভুসি কিনতে পারত।

গাড়ির কাছে নিজেই চলে এল মণ্ডা, পিছু হটে জুত করে দাঁড়াল, যেন সে নিজেই জানে কখন কী করতে হয়। এই সব বুজর্গ কাণ্ড দেখলে দিলুর বুকে মোচড় লাগে আর কান্না পেয়ে যায়। সে ভাবে, এই ঘোড়াটা আধেকটা মানুষ, তার সংসারটাকে কাঁধে নেবার জন্য সব সময় মুখিয়ে রয়েছে। কখনও কোনও ওজর করে না গাড়ি পিঠে নিতে। ঘাড় বাঁকিয়ে থেমে পড়ে না, পা আছড়ে বলে না, আর যেতে পারছি না দিলু!

তৈরি ঘোড়া দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ। খোদাদিল জগন্নাথ দাসের আদি অন্নপূর্ণা মিষ্টান্ন ভাণ্ডারে এসে মস্ত এক ঠোঙা গুড়ের ঝুরি কিনল। আজ তার চার বছরের মেয়ে 'নুরি' সঙ্গে আসেনি। মেয়ের উপর বড্ড টান। গাড়ির মোহড়ায় বসিয়ে রাখে। মেয়ে এই গাড়িতে বসে বর্ণপরিচয় শেখে। দুই ছেলে, পয়লাটি ক্লাশ ফাইভ, দ্বিতীয়টি থ্রি। দিলুর ভাষায় মেয়ে 'ওয়ান-ফ্যান' হয় নাই। মেয়ের সঙ্গে মণ্ডা নেচে নেচে খেলাও করে।

মেয়েকে দিলু শিখিয়েছে, একটা মস্ত জিনিস। ঘোড়াকে খেলাতে হলে সুর করে গাওনা দিতে হয়। এবং সেটি হচ্ছে একাট কারবালার ছড়া।

আহা রে দুলদুলি ঘোড়া
জোর কর থোড়া থোড়া
যেতে হবে টুঙ্গির শহর।

নুরি বলে—হা রে রে ডুলডুলি ঘুরা
জোর কর থুরথুরা
যাতি হবে টুঙ্গিরা শহর।

তারপর মেয়ে প্রশ্ন করে—টুঙ্গিরা শহর কুথায় বাপজি?

তাই তো বটে। টুঙ্গির শহর কোনদিকে বটে! ঈশানে না নৈঋতে, অগ্নি না বায়ুতে? গাড়ি চালাতে চালাতে ছিটকি তুলে হরিরামপুর ঘাটের দিকে দেখিয়ে দিল খোদাদিল, বলল—কী জানি মা, ওই দিকেই হবে। পথটা তো ওই পানে গিয়ে শহরে মিশবে।

—ওই পানে টুঙ্গিরা?

—হ্যাঁ, জননী।

—ঠিক জানো?

—ঘোড়া জানে।

—মুণ্ডা জানে?

—হ্যাঁ।

গোয়াস-কালিকাপুরে এসে বেশ অবাক হল খোদাদিল। হাট বসেনি। সমস্ত সুনসান। বকুলতলায় তবারকের দোকানে খবর নিয়ে জানল, নন্দীবাবু মারা গিয়েছে, নন্দী স্টোর্সের মালিক।

অগত্যা গাড়ি খালি টানবে, নাকি মতিলালতলায় ফিরে গিয়ে প্যাসেঞ্জার ধরবে চিন্তা করল দিলু। দুপুরে ঘণ্টা খানেকের জন্য রোজকার মতো বাড়ি ফেরা দরকার। তা ছাড়া টাকাটা সে নেয়নি, সোনাভানের সঙ্গে একপ্রস্থ ঝামেলার আশঙ্কা করছিল মনে মনে। বউ ইজ্জতের কথা বলে, এইডে কি ইজ্জত হল না?

চোখ বড় বড় করে খোদাদিল দেখল, বাস্তবিক পিচ পড়েছে, রোলার টেনেছে। বেঁড়ে সাপের মতো পেট ফেলে পড়ে আছে 'খাব-খাব' করা পথটা। দেখেই মাথাটা বিগড়েগেল। সে মনে মনে একদঙ্গল কাদাখোঁচা পাখির মতো রিকশার দলকে নেমে পড়তে দেখল। রিকশার চালকের ভঙ্গিটা ঠিক কাদখোঁচার সামিল, ঠুকরে খাদা থেকে, পিচ থেকেই যেন বা খাদ্য তোলে। ওরা খোদাদিলের ঘোড়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

গলার চাটকি না দিয়ে মুণ্ডার পিঠে রাগের চোটে সজোরে ছিটকি বসিয়ে দিল খোদাদিল। ঘোড়া এমনই একটা বেবগ্না লাফ দিয়ে হেঁচকা টানল যে ঝুরির ঠোঙাটা মোহড়া থেকে তলায় পড়ে গেল এবং একটা কুকুর ছুটে এসে মুখ দিল। ঠোঙা অতএব পড়েই রইল পথে। পথের একপাশে কাত হয়ে আয়েস করছে একখানা হুডতোলা ঠিকেদারি জিপ। খোদাদিলের কান রাঙা হয়ে উঠল।

খোদাদিলের মনে হল, ঘোড়াটা তাকে পাতালের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে। যেন সে গড়িয়ে পড়ে যাবে। হঠাৎ তার মনে হল, একটা ঘোড়াজ্বিনে তার গাড়িটা টেনে নিয়ে যাচ্ছে। মেয়ের সুস্বাদু খাবার ফেলে নষ্ট করে দিল। এই বেটা মেয়ের সঙ্গে খেলা করে!

—ওক্কে, ওক্কে! বলে চেঁচায় খোদাদিল। ঘোড়া তার গতি মন্দ করে না। তখন মনে পড়ে বাড়ি ফিরে চানাখোল খাবে বেটা, তাই তিয়াসায় খুন হয়ে যাচ্ছে।

—সবুর কর মুণ্ডা, সবুরে মেওয়া, আসমান থেইক্যা খাঞ্চাভর্তি খাবার পাঠাবে খুদা। হজরত ঈশা মুনাজাত করেছিল, মুনে নাই? বুলো মুণ্ডা আল্‌হামদো! শালা যে শুনে না আল্লামিঞা! ইডারে সবুর দেও রসুল! বলতে বলতে মুণ্ডার তলপেটে আদুরে লাথি বোলায় খোদাদিল মুনশি। তবু মুণ্ডা তাকে বালুমাটি পেরিয়ে টেনে একটা গর্তে ফেলে দিল। পাহি মচকে দিল, ঘাড় নামিয়ে দিল পথে।

মুণ্ডাকে মারল খোদাদিল। তাপর টাঙাসুদ্দো মুণ্ডাকে রাস্তায় ফেলে বাড়ি চলে এল। বাড়িতে ঢুকেই তার মাথা খারাপ হয়ে গেল। আজ ছিল রবিবার। তিন বাচ্চাই ঘরে আছে। সুনাভান মাটির উনুনে কাঠের আঁচ লাগিয়ে বালুহাঁড়ি চড়িয়েছে, ধক করে ছোলা ভাজার চড়বড়ানি শব্দ এবং গন্ধ কানে-নাকে ছুটে এল। এ কেমন 'আস্পদ্দা' সুনাভান, তুমি মুণ্ডার খোরাক বাচ্চাকে দেও! তুমার শানবোধ নাই! করো কী?

—বউ?

—জী!

—কী ভাজছিস র‍্যা?

—অল্পই দুই মুঠা বালিচাঁড় নুরির বাপা!

—ক্যানে?

রাস্তায় দাঁড়িয়ে তর্জায় ঘোড়াঅলা। চৈত্রের দগ্ধানিতে আপাতত লোকশূন্য পথে লাল ধুলোর কেঁড় পাক মারে।

—সুদখোরের গু খাস মাগি, ঘোড়ার নাদ খাস স্যাকের বিটি, আমার মুণ্ডার খুরাক মারিস হারামি। তোর কারণে সতীন আনব ঘরে, বালুচাঁড় দিস তুই! তোকে আমি থুক দিই, ঢেলা মারি ননিমুখি। ঘোড়ার খতরখাগি!

—চোপা রাখো নুরির বাপা। শুনছি, তুমি সরকারকে টাকা খয়রাতি দিয়া ফিরছ! ক্যানে, ভুখে আমার কোল কাঁদলে, মুই বালুতে চাঁড় দিব না?

—না, দিবি না।

—খয়রাতি দেও কারে!

—চোপ সুনাভান!

—ক্যানে চুপ করব! পরিবারকে পথে বসিয়ে কমরেডি করছ, 'পেস্টিজ' করছ! নরলোকে আমার ইজ্জত দেখে না?

—দেখে! কী দ্যাখে তোর?

—সব দ্যাখে, গা-গতর সব দ্যাখে দিগরের মানুষ। হুঁহ, 'পেস্টিজ'! এই পথই হল সংসার! পর্দা নাই, ফের যেতি বিয়োতে হয়, কুথায় বিয়োব শুনি? ইদিকে ঘোড়ার চোপা খুব, বালবাচ্চার কিছু নাই? জিবে সোয়াদ নাই? খাবে না তারা?

—নাহ্, খাবে না।

—খাবে। একশোবার খাবে।

ব্যাস্। চড়াক করে তপ্ত লাল ধুলা খোদাদিলের মগজে ঢুকে তার বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন করে ফেলল। চেলা কাঠ তুলে সে প্রথমে বউকে মারল। মারল ছেলে দু'টিকে। নুরির মুখের কষে ছোলার খোসা লেগেছিল, বাপের এই রকম আগমূর্তি কখনও সে দেখেনি। বিস্ময় আর ভয় একসঙ্গে খুকুর চোখে ফুটে উঠল। তাকে যে বাবা মারতে পারে, তবু যেন তার বিশ্বাস হচ্ছিল না। সে হাত তুলে বাবাকেই ধরতে চেয়েছিল। অশ্বের অক্ষির মতো কালো সজল চোখে নুরির গহন স্নেহপদার্থ ভাসছিল, তবু তার পিঠে চেলার দাগ বসে গেল।

নুরিকে মেরেই খোদাদিল ঘোড়ার ডাক শুনতে পেল। গাড়িসুদ্দো উঠে এসেছে ঘরের উঠোন-খাওয়া পথে। ঘোড়ার গলা জড়িয়ে ধরে চোখ দু'টি বন্ধ করে দিলু আকাশে মুখ তুলে 'খাঞ্চা-খাঞ্চা' বলে চিৎকার ছড়িয়ে দিল। বাচ্চাদের সঙ্গে সোনাভান কেঁদে চলেছে।

সেই রাতে আকাশে চাঁদ ছিল না। কিছুতেই ঘুমাতে পারছিল না খোদাদিল। মেয়েটা আধেক রাতে রোজই তার কাছে, মাকে ছেড়ে পথ ডিঙিয়ে চলে আসে। নুরি অতটুকু হলেও আক্কেল ধরে। গরুর পাল গেলে দাঁড়িয়ে থাকে। সাইকেল সাড় দিলে পথ পার হয় না।

সোনাভান খোদাদিলকে দেখিয়ে দেখিয়ে নুরির পিঠে সরষের অল্প গরম তেল মাখিয়ে দিয়েছে।

এখন তুইথুলি মুইথুলি পাখি ডাকছিল। এরা দুটি নারীপুরুষ। শোনা যায়, পাখি দুটির কেউ একজন ঘরের চাবি কোথাও রেখে আর মনে করতে পারছে না।

পুরুষটা বলছে—তুই থুলি? অর্থাৎ তুমি রেখেছ।

বউ পাখিটা অবাক হয়ে বলে—মুই থুলি! অর্থাৎ আমি রেখেছি? এই ডাক শুনে দিলুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছিল। এই পাখি দুটো থামতেই জানে না। হঠাৎ মনে হল, কিছু কি তা হলে হারিয়ে গেল? কী সেটা? চাবি? টাকার থলি? কী?

নুরি কি আসবে না আজ? খুকুর পিঠে কি খুবই দাগ পড়েছে? সে কি আর বাপকে বিশ্বাস করবে না? তার সঙ্গে কি টাঙায় করে যাবে না গঞ্জে? মোহড়ায় বসে, অ-এ অজগর আসছে তেড়ে বলবে না? শুধোবে না, টুঙ্গির শহর কতদূর? এই বুকের কাছে শুধু একটা তীব্র হ্রেষা জাগবে কেবল হাহাকার করে?

হঠাৎ উঠোনময় পথে ঠিকেদারি জিপের তীব্র ঝলসানো আলো ভয়ংকর বেগে ধেয়ে গেল। ধাঁধিয়ে গেল নুরির চোখ, ঘোড়া ডাকল হয়দরি হ্রেষায়। নুরি হতবুদ্ধি হয়ে বাবাকে কাতর গলায় ডেকে জিপের চাকার তলায় চলে গেল। মানুষের গলার সর্বনেশে আর্তনাদসহ খুকুকে পিষে দিল জিপ।ঘোড়া খুঁটা উপড়ে পাগলের মতো ছুটে গেল পথের উপর।

উঠোনময় পথের রক্তাক্ত শিশু ধড়ফড় করতে করতে মুখে গাঁজলা তুলে মরে গেল। বিভিন্ন ঘর থেকে অনেকগুলো লণ্ঠন নেমে এল পথে। ঘোড়া একটি খুদে অরণ্যে ঢুকে গেছে। তার গলার অদম্য হ্রেষা কান্নার বিদ্যুৎ ছড়িয়ে অরণ্যের মাথার আকাশে একটি জ্বলজ্বলে তারাকে কাঁপিয়ে তুলছিল।

লাল পথটা এইভাবে কালো গায়ে এগিয়ে আসতে থাকে।

দুই

লাল সড়ক যখন কালো হল, খোদাদিল মুনশির বর্ণবোধ সম্পূর্ণ হল। নবসাক্ষর খোদাদিল মুনশিকে স্বরবর্ণের প্রথম বর্ণটি অতি উত্তমরূপে চিনিয়ে দিয়ে গেছে তার মেয়ে নুরি। কালো অজগরের পিঠের উপর দিয়ে রিকশা চরবে ভেবেছিল দিলু, সে কখনও ভাবতে পারেনি যুদ্ধ ফেরতা নিলামের আর্মি জিপ নামিয়ে দেবে চকের মজুমদার বাবুরা। রিকশার খেপ পনেরো, ঘোড়া বিশ, কিন্তু আর্মি জিপ মাথাপিছু তিন-চার টাকা। মুণ্ডা তাহলে কার সঙ্গে পাল্লা ধরবে? আর্মি জিপের পিঠেপিঠি নেমে গেল নন্দবাবুদের ট্রেকার।

অগত্যা মাথাপিছু দরেই নামতে হল ঘোড়াদিলকে। তা-ও মানুষ জিপ পেলে কি ট্রেকার পেলে ঘোড়া ধরে না। রিকশায় বাবুগিরি করে যায়। ঘোড়া কত আর শস্তায় সওয়ারি নেবে? তিন টাকা? এক খেপ পনেরো-আঠারোর বেশি উঠবে না। জনা পাঁচ-ছয় প্যাসেঞ্জার তো চাই।

দিলু টাঙায় বসে নাড়া কাটে দাঁতে ধরে। এক খেপ জোগাড় হয় কখনও, কখনও হয় না। লোক ভরছে মুনশি, জিপ এসে পড়ল, অমনি প্যাসেঞ্জার নেমে দৌড়ল। টাঙায় বসে রইল একটা বুড়া মতন মানুষ।

—নেমে যাও কাকা! মুণ্ডা নাচার।

—ক্যানে বাপ?

—এক প্যাসেঞ্জারে ঘোড়ার দানাপানিই হয় না, কী খাব আর কী রাখব বলো দিহিনি।

—আমাকে তাহলে কোলে কইর্যা তুল্যা দেও ঘোড়াদিল, আমিও নাচার।

—ভারি একখান বাক্যি কইলে গোকুল কাকা! বলে পথের উপর থুথু ফেলে চোখ দু'টিকে বিষণ্ণতায় সরু করে তোলে দিলু। ভাবে, মানুষ নেমকহারাম, এই বুড়াই একদিন বিবির ডাইরিয়া হলে তার টাঙার পায়ে পড়েছিল, তার ঘোড়াকে দেখিয়ে বলেছিল খোদার জীব দয়াবান। মাঝরাতে বিবিকে হাসপাতালে পৌঁছে দিয়েছিল মুনশি।

এবং আজ হেসে ফেলে বৃদ্ধ বলল—ঘুড়াডারে ফেল্যা দে মুনশি। খেতে দিতে পারছিস না, শুকিয়ে মারছিস। চাঁদনি চকে বেইচ্যা আয় গা।

—কী বেরহম কথা কাকা! নামো তুমি নামো দেহি। যাও, জিপে যাও। ঘোড়ার গাড়িতে বইসা আর নবাবি কোরো না। না নামলে ঘাড় ধাক্কা দিব!

—কীহ! কোচোয়ানের মুখে এত বড় কথা! কই, কে আছিস! ওরে ছুকুদ্দি!

পাঁচজন রিকশাঅলা ছুটে এসে খোদাদিলকে মারতে বাকি রাখল। এই অঞ্চলের তিনখানা টাঙা রাস্তা কালো হওয়ার পিঠেপিঠে বন্ধ হয়ে গেছে। একজন টাঙাঘোড়া ফেলে এখন রিকশা টানছে। তাতেও যে সংসার ভালো চলে, তা নয়। জিপের সঙ্গে পাল্লা ধরে ঘরের মানুষ, বনের পশু কেউই পারে না। মুণ্ডা আজ বনেও ফিরে যেতে পারবে না, সে বেচারি অরণ্যের পথ ভুলে গেছে।

রাত্রে সেদিন ফিরতি চালানে মতিলালতলা থেকে খালি গাড়ি ফিরল খোদাদিল। এই প্রথম সে চমকে উঠল। বুঝল বাঘা দুলদুলির দিন শেষ হয়ে এসেছে। জং-এ-কারবালা খতম। গোকুল কাকা ঠিকই বলেছে, ওই বুড়ার উপর রাগ তার পড়ে গেল। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়ল ওই নিরীহ অরণ্য-বিস্মৃত জীবটার উপর। রাস্তার ওপারে দাঁড়িয়ে পা ঠুকে মশা তাড়াচ্ছে। মশা তাড়ানোর জন্য বউ সাঁঝাল-আগুন করেনি, শীত পড়লে এ বছর জীবটা চটের পিরহান-জামা পাবে না। ওর পায়ের কাছে বড় খোকা একটি জ্বলন্ত কুপি রেখেছে কেন? ওই আলোয় দেখা যাচ্ছে মণ্ডার চোখে পিচুটি গলা জল, পা চারটি শীর্ণ হয়েছে, পেটের খাঁচায় হাড় বেরিয়ে পড়েছে। তবু বাঘার উপর থেকে দিলুর রাগ যাচ্ছিল

না।

এই জীবটার জন্যই নুরি মরেছে। অদ্ভুত এই যুক্তি মগজে হঠাৎ খাড়া হয়ে দিলুকে ভিতরে ভিতরে খেপিয়ে তুলল। মণ্ডাকে খুন করতে ইচ্ছে হল তার।

—তোর দানা খেয়েছিল বলে মেয়েকে মেরেছি, মেয়ে মরে গেল! আর আজ কাঁদছিস তুই? অসহ্য! বলে চেলা কাঠ হাতে নেয় খোদাদিল। ঘোড়ার কাছে ছুটে গিয়েও থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে। হাত ওঠে না। কেঁদে ফেলে।

পরের দিন মাত্র পনেরো টাকা খেপ দেয় মণ্ডা। এক পিঠে মাত্র একজন প্যাসেঞ্জার টেনে বাড়ি ফেরে মুনশি। ঘোড়া আরও শুকিয়ে যায়। দানাপানি হয় না অধম মূক প্রাণীটার। আসমানে আল্লার আরশ অর্থাৎ সিংহাসন মনে হল দুলছে। মক্তবের মৌলবি বললেন—তোমার গুনাহ্ হচ্ছে খোদাদিল। পথের জন্য মেয়ে কুরবানি করলে, খুদার জীবটাকে আর মেরো না। পারলে টাঙার শহর লালবাগে গিয়ে ব্যবসা দাও, না পারলে বাঘাকে বেচে দাও।

মৌলবির কথা শুনে চুপ করে রইল দিলু। ঘরে এসে কেমন ঠান্ডা হয়ে রইল। এখন আর পথটাকে উঠোন মনে হয় না। উঠোনকে পুরোপুরি পথ ঠাহর হয়। সংসারকেও মনে হয় পথ। পথকে মনে হয় অজগর। নুরির কচি মুখটা বারবার মনে পড়ে যায়।

একদিন পথের ঠিকাদার এল বাড়িতে, এই লোকটার জিপেই নুরি মরেছে, অথচ পথ মানুষটাকে কোনও শাস্তি দেয়নি। তারই ঠিকার কাজে মণ্ডাকে নিয়ে যেতে হল খোদাদিলকে। হরিরামপুর ঘাটের কাছাকাছি কিছুটা পথ এখনও কাঁচা। সেখানে খোয়া ইঁট ফেলতে চলে গেল টাঙা। কী পরিহাস।

কখনও ভাবেনি মুনশি তার যত্নের টাঙায় সে ইঁট বইবে এবং মণ্ডা সেই গাড়ি টানবে।

সন্ধ্যা পর্যন্ত মাল টেনে ৮০ টাকা রোজ পেল দিলু। এত টাকা কতদিন চোখে দেখেনি। আগে কত টাকা কতই ঘেঁটেছে। টাকাগুলো, বেশ গরম ঠেকছিল তার। মণ্ডার বিমর্ষ মুখের দিকে চাইল, যেন বেজার মুখ কিছুতেই প্রসন্ন হয় না। তাতেই যেন জীবটা শুকিয়ে গিয়েছে। ওর কি নুরির কথা মনে পড়ে? মায়া হচ্ছিল দুলদুলের জন্য। ভাবল এই টাকা দিয়ে খইল, চিটেগুড়, চানা কিনবে, জীবটাকে খাওয়াবে পেট ভরে। দোকানে গিয়ে দাঁড়িয়ে রইল মুনশি। তারপর মাথায় পোকা নড়ে উঠল। মনে হল, বাঘাটা তার দুশমন।

দোকান ছেড়ে নেমে খাসির মাংস কিনে বাড়ি ফিরে এল। ছেলেরা এবং বউ এবং সে আনন্দ করে খাচ্ছিল রাতে। অর্ধভুক্ত মণ্ডা রাস্তার ওপারে একা দাঁড়িয়ে পা ঝামড়ে সভয়ে মশা তাড়াচ্ছিল, তার চোখ বেয়ে নামছিল জমজমার পবিত্র জল।

মণ্ডার দিকে আলো-আঁধারে চোখ গেল মুনশির, সে আর খেতে পারল না।

—কী হল নুরির বাপ?

—মাংসে একটা বেলেচি পড়েছে, মণ্ডার চুল, দ্যাখ তো কবীর!

—না, না। খাও বাপু, চুল নাই। কই?

—গন্ধ লাগে।

—কিসের?

—মণ্ডার গায়ের, গোছলপাতি নাই কি না!

—মুনের সন্দ, মুনে রাখো মুনশি, ছাওয়ালদের খাতি দেও। বলে উঠল সোনাভান।

রাত্রে একলা জেগে বসে রইল খোদদিল, কিছুতেই ঘুম আসে না। ভোররাতের ফজরের আজান পড়লে হ্রেষা দিত ঘোড়া, ইদানীং আর ডাকে না। বেলা চড়লে তবে টাঙা নিয়ে পথে নামে মুনশি।

আজ দু'খেপ মোটামুটি হল। চল্লিশ টাকা কামাতে পেরেছে। চানা কিনল আজ। কিন্তু খইল কিনতে এসে থেমে গেল। এবং অদ্ভুত ! পরের দিন সকালে বউকে বলল—বালুহাঁড়িতে চাঁড় দে সুনাভান।

বউ অবাক, কিছুক্ষণ হতবাক চেয়ে রইল স্বামীর মুখে। চোপা যেন নিষ্ঠুর আবেগে ঝুলে পড়েছে।

কোঁচড়ে ছোলা ভাজা নিয়ে গাড়ি ফেলে শুধু মণ্ডাকে সঙ্গে করে বেরিয়ে গেল মরদ। কিছু দূর হেঁটে সদরঘাট পেরিয়ে ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হল মুনশি।

পিঠ বাঁকিয়ে দুর্বল ঘোড়া মনিবকে টানতে থাকল। ছিটকি পড়ল গায়ে পায়ে, চমকালো খোদার জীব। দু-তিনবার হড়কে পড়ে গেলে ঘোড়াকে উত্তম প্রহার দিল মুনশি। মার খেতে খেতেও বড়ই বাধ্য প্রাণীটা প্রভুর জন্য আপ্রাণ পিঠ পেতে দাঁড়িয়ে রইল, একটু চিৎকার করল না। পা ঠুকল না মাটিতে।

দুপুর নাগাদ লালবাগ পৌঁছল মুনশি। মির্জা নৈনিহালের বাড়ি পৌঁছে গেল চাঁদনি চকে। নৈনিহাল ঘোড়াসুদ্দো মুনশিকে দেখে হতভম্ব এবং দোস্ত এসেছে বলে খুশি। ভাজা ছোলা ঘোড়ার মুখে ধরে খোদাদিল বলল—এইডেরে রাখেন মির্জা, খাতে দিতে পারি নাই। দেখবেন, হলে দর, না হলে মগনা। আমি চললাম।

মণ্ডা ভাজা চানা খেল না, মুনশি চলে যাচ্ছে দেখে ছটফট করে উঠল। টাঙার শহর লালবাগে দানাপানি পেয়ে মণ্ডা ট্যুরিস্টদের টানতে লাগল।

ঘোড়া রইল না, কিন্তু মুনশির ঘোড়াদিল নামটা ঘুচল না। এক রাত্রে তুইথুলি পাখি ডেকে উঠলে নুরির কণ্ঠস্বর মনে পড়ে গেল।

হা রে রে ডুলডুলি ঘুরা
জোর কর থুরথুরা
যাতি হবে টুঙ্গিরা শহর।

বেজায় যাতনায় সোনাভানকে বুকের সঙ্গে চেপে ধর ঘোড়াদিল।

—তুইথুলি সুনাভান?

—কারে থুইলাম মুনশি?

—নুরি রে, মণ্ডা রে! কুথায় থুলি বউ?

—মুই থুই নাই, তুমিই মুগুারে রাখ্যা আইল্যা, চাঁদনির বাজারে।

—না, মুই রাখি নাই, থুই নাই।

—মিছা কও ক্যান, থোও নাই?

—তুই আমারে সব ফিরায়ে দে বউ! বলে ডুকরে উঠল ঘোড়াদিল মুনশি।

সোনাভান স্বামীর এই অপত্য কান্না দেখে 'থ' হয়ে তার মরদকে দেখতে থাকে। পাখি দুইডা তখনও পরস্পর দোষারোপ করে চলেছে। বউ কিন্তু যেন হারানো চাবি খুঁজে পেয়েছে এমনই চাপা কৌতূহলে স্বামীর কানে কানে বলল—আছে মুনশির পো। উপায় আছে। কাসিদের মানত দেও, নুরি ফিরা গভ্যে আসবে।

—কাসিদ?

—কারবালার কাসিদ। ঘোড়ারে না পাইলে মানুষ নিজেই ঘোড়া সাজে মুনশি। সাইজ্যা রুহরে আরাম দেও, কোমরে ঘণ্টা বান্দো, পায়ে মল পিন্দো, শরীলডারে ধমধমাও ঘোড়াদিল।

—ঘোড়াদিল! তুই কইলি সুনা? সোয়ামীর নাম? আপন জুবানে?

—হ্যাঁ গো নুরির বাপা, পথ তুমারে আর মানুষ রাখে নাই। তুমারে তো আর আল্লা ডাকতে পারি না। মনিষ্যিরে কাসিদের দুলদুল ডাকলে পাপ নাই। তুমি আমার লেগে খবর আনবা, তলপেটের খবর। মানত দেও মুনশি।

বউয়ের কথা শুনতে শুনতে খোদাদিলের চোখ দুটি আনন্দে জ্বলে উঠল। তার মনে হল, সে কাসিদই হবে। শরীর আর আত্মা দিয়ে অনুভব করবে মগুার ছন্দ, সে ঘোড়া হয়ে পাগলের মতো ছুটবে কারবালা।

বর্তমানে খেতমজুর খোদদিলের মনে হল, জীবন এই পথের উপর একটি চমৎকার ঘোড়া নাচ। নুরির সঙ্গে নাচত বাঘামগুা। চারিদিকে তারই ছায়া তাকে ঘিরে ধরেছে। রাস্তার উপর কোমরে দুলদুলির ঘণ্টা বেঁধে দাঁড়াল খোদাদিল। পায়ে বাঁধল ঘোড়ার ঘুঙুর। হাতের তাগায় ছোট ছোট ঘণ্টা, গলায় পরল গাঁদার মালা। মসজিদে সিজদা দিল মুনশি। পথের উপর দাঁড়িয়ে ভাবল, পথের শেষ কোথায়? কোথায় বা শুরু? তার পথটা কি কারবালায় গিয়ে শেষ হয়েছে?

কাসিদ বার হচ্ছে দেখে গ্রামের ছেলেবুড়া, মেয়েমরদ, কচিকাঁচার দল মুনশিকে দেখতে এল।

—কী মানত সুনাভান?

—কাসিদের কানে কানে বুলেছি ফুপু।

—নবিজির দরগা রোশনাই কর খুদা। হোসেনকে এক বাতি, একবাতি জুলুয়া...বলে বউঝিরা সমস্বরে কাসিদের গান ধরল। পথে লাফিয়ে পড়ল মানবাশ্ব, এক বিদীর্ণ অশ্বপুরুষ, ছন্দিত ঘন্টায় পথে অনেকক্ষণ নাচল।

সোনাভান ঘোড়াদিলের কাছে এগিয়ে এসে কাঁধের ছোট থলেতে একটি কৌটো ঢুকিয়ে দিয়ে বলল—কৌটায় মেহেদিমাখা দিলাম, মগুার সাদা চিতেয় মাখায়ে দিবা আর

আশীর্বাদ চাইবা, বলবা, তোর মুখে খবর চাই বাঘা, নুরি ফির আসবে তো?

গাঁয়ের বিভিন্ন লোকের মানত মাথায় করে কাসিদ চলেছে লালবাগের কারবালায়। সঙ্গে তার মেহেদি আর জুলুয়া (শুভদৃষ্টি)-র বার্তা, বাতি জ্বালানোর সমাচার। মনে হচ্ছিল, আজই যেন সোনাভানের সঙ্গে তার শাদি হয়েছে। সোনা যেন সারারাত বাসর জাগবে।

আঠারো মাইল পথ দৌড়তে হবে, কাসিদ কখনও থামে না। কারবালার সংবাদবাহক অশ্ব কখনও তার গতি শিথিল করে না। চলতে চলতে দুর্বল দেহ খোদাদিলের জিভ বেরিয়ে পড়ল। আকাশে মেঘ জমল, বিদ্যুৎ চমকে উঠল, ঝড় বইতে শুরু করল। পথ অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

আহা রে দুলদুলি ঘোড়া
জোর কর থোড়া থোড়া
যেতে হবে টুঙ্গির শহর।

কারবালায় না পৌঁছালে তো খবর আনা যাবে না। ঝড়-বৃষ্টিবাদলা কিছুই কি ঘোড়াদিলকে দমাতে পারে? কতবার সে পথে পিছলে পড়েছে, কতবার সে উঠে দাঁড়িয়ে ছুটে চলেছে, ছুটে এসেছে, জিভ বেরিয়ে পড়লেও কাসিদ থামতে জানে না।

কারবালায় পৌঁছলে বৃষ্টি থেমে গেল। আলোয় ঝলমল করে উঠল প্রাচীন শহর। লোকে ভরে গেল সমস্ত কিনারা, ময়দান। প্রচুর টাঙা ঘুরে বেড়াচ্ছে এদিক ওদিক। কতক টাঙা দাঁড়িয়ে রয়েছে। নৈনিহাল মির্জা বাড়িতে নেই। মণ্ডাকে নিয়ে বার হয়ে গেছে।

কোথায় বাঘা? তাকে কি চিনতে পারবে? বউ মেহেদি দিয়েছে মণ্ডার চিতিতে মাখাতে। কেমন আছে হোসেনের জীব? কেমন আছে অপমানিত পরাস্ত বাতিল ঘোড়া? কিন্তু কে কাকে বাতিল করেছে? নবাবি পথে এখনও কি মানুষ টানছে না বাঘা? যেন বা জীবটা ধূসর শহরে ঢুকে ছায়ার মতো গাড়ি টেনে বেড়ায়।

যখনই কোনও হ্রেষা কানে আসে ছটফট করে মুনশি ছুটে যায়। —আমি এনেছি বাপা, তোমার জন্যে মেহেদি এনেছি। তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি, আমি তোমার সঙ্গে নাচব খাঞ্জা। অন্ন দে বাপ, খেতে দে। আমি তোকে চানা দিব, সরিষার খইল দিব, ফাইন ভুসি দিব, চিটাগুড় দিব, চাপাতি, খেসারি দিব, মটরশুঁটির নীল ফুল, সব দিব ফতেহা! আমারে লাও বাপজি। মুণ্ডা-আ-আ-আ। সাড়া দে বাপ। ওই তো ডাকে! কারবালার ডাক মাবুদ (হে ঈশ্বর)।

ভিড়ের স্রোতে পাগল কাসিদ ভেসে যায়। কৌটো থেকে বাটা শুকনো মেহেদি বার করে ঘর্মাক্ত মুখে পাগলেরই মতো মাখতে থাকে খোদাদিল। তার চোখের উপর ভেসে ওঠে নববধূ সোনাভানের মেহেদিরাঙা হাত, খোদাদিলের বাসনার ভিতর একটি দুধপথের মতো সড়ক তৈরি হয়, সেই পথের প্রান্তে অশ্বধনি শোনা যায়, নুরি দামাল ভঙ্গিতে এগিয়ে আসতে থাকে, তার সঙ্গে খেলা করতে করতে এগিয়ে আসে কালো ঘোড়া।

—মুণ্ডা-আ-আ-আ। বলে চিৎকার করে মুনশি মানুষের স্রোতে পড়ে যায়। তাকে

মাড়িয়ে চলে যেতে থাকে মিছিল। তার কপালের ফেট্টিতে লেগে থাকে লহু-পসিনা-পিয়াসার মেহেদি।

দূরে গাড়ির চাকায় বাঁধা একটি কৃষ্ণঅশ্ব, কপালে যার চিতি, মুনশিকে পড়ে থাকতে দেখে হ্রেষা দেয়, পা ঝামড়ায়, তীব্র ছটফট করে। কিন্তু বাঁধন ছিঁড়ে ছুটে যেতে পারে না। নৈনিহাল মির্জা ঘোড়ার গায়ে হাত বুলিয়ে দিতে থাকে। বুঝতে পারে না, ঘোড়া এত ছটফট করছে কেন।

মির্জা কী মনে করে মুণ্ডাকে ছেড়ে দিতেই কারবালার নিঃসঙ্গ তীরবিদ্ধ অশ্ব ছুটতে শুরু করে, আঠারো মাইল পথ তার কাছে কিছুই না। কিন্তু বাঘা সারা লালবাগ ছুটে বেড়িয়ে কাকে খুঁজছে জানে না। তার চোখে পথের একটি আশ্চর্য ক্ষুধা জ্বলতে থাকে।

একটি রক্তাক্ত ভুল

সেদিন আমার চোখের জলের এক কানাকড়ি দাম ছিল না। চোখে বারবার জল এসে পড়তে চাইছিল। সেই অবাধ্য অশ্রুকে লুকোবার জায়গা ছিল না। চোখের জলকে মানুষ কতটা ঘৃণা করে, যে ওইভাবে কেঁদে না দেখেছে সে বুঝবে না। অথচ আমার কষ্ট কারও চেয়ে কম ছিল না।

বললাম—আজও কষ্ট হয় নিমা। কষ্ট একটুও কমেনি। বরং যতদিন গেছে বেড়েছে। মাঝে মাঝে পাগল পাগল লাগে।

নাকটাকে বাতাসে উপর দিকে ঠেলে তুলে কষ্টকে দেখাবার জন্য বড় করে একটা শ্বাস টানলাম। নিমা সামান্য অপাঙ্গে আমাকে দেখছিল। আমার কষ্ট ওকে স্পর্শ করছে কিনা কে জানে! আমি জানি, মানুষ এই কষ্টের চেহারা কখনও ধরতে পারে না।

—পুলিশের গুলিতে মরেছে আপনার বন্ধু! আগে একদিন বলেছিলেন। বলল নিমা।

—হ্যাঁ, ছেলেবেলার বন্ধু। যাকে বলে, ন্যাংটো কালের দোস্ত। এক ক্ষুরে মাথা মুড়াতাম আমরা। বাড়িতে ভাত খেতাম, ওদের বাড়ি গিয়ে আঁচাতাম। গৌতম ছিল ভীষণ নরম প্রকৃতির। পরিবার দরিদ্র বলে সে কখনও কারও সামনে মাথা তুলে কথা বলত না, আমার পাশে ছায়ার মতো থাকত, এতই চুপচাপ। যা বলতাম, চোখ বড় বড় করে শুনত, কোনও কালে আমার কোনও কথার অবাধ্য হয়নি। এই ছেলেকে যেদিকে খুশি টেনে নিয়ে গেলে, ও যাবে। না বলবে না। আমি তাকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে গেছি, ও বুঝতেই পারেনি। মৃত্যুর মুহূর্তে সে কেমন আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিল।

—এমন শুনিনি কখনও। বলে উঠল নিমা।

—না, শুনবে না। কারণ, ওই বয়সে মৃত্যুর জন্য কেউ একেবারেই প্রস্তুত থাকে না। ওকে আমি বুকের সঙ্গে চেপে ধরেছি, যেন সে আমার বুকের সঙ্গে মিশে যেতে চাইছিল। ওর রক্তে আমার জামা ভিজে উঠেছিল. হঠাৎ খিঁচুনি দিয়ে উঠল গোরা। গৌতমের ডাকনাম গোরা। খিঁচুনি দিতে দিতে গোরার দেহ স্থির হয়ে গেল। দু'চোখ বড় বড় করে ঠেলে উঠেছে। তাতে আশ্চর্য বিস্ময়। মনে হচ্ছিল, তার এই মৃত্যুকে কিছুতেই সে মেনে নিতে পারল না। বারবার খুব ঠান্ডা গলায় গোরা বলেছিল, আমাকে বাড়ি নিয়ে চল প্রতুল। ডিহির মাঠে কদবেল পেকেছে, কুড়ুতে যাবে না?

নিমা হঠাৎ তার মুখটা অন্য দিকে ঘুরিয়ে নিল। দু'চোখে হালকা করে সাদা উড়নি চেপে ধরেছে। বুঝলাম, আমার কথা তাকে সামান্য হলেও স্পর্শ করেছে। সে আর কোনও

প্রশ্ন করছে না।

বেশ কিছুক্ষণ পর মুখটা আমার দিকে অল্প একটু ঘুরিয়ে ঈষৎ ভেজা গলায় বলল—আপনারা কোন ক্লাশে পড়তেন তখন?

—নাইনে পড়ছি, নতুন ক্লাশ।

—ওটা কোনও ছাত্র আন্দোলন ছিল?

—না। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির প্রতিবাদে আইন অমান্য করেছিল পার্টি। আমি পার্টিকে ঘৃণা করি নিমা। সেদিনও করতাম, আজও করি।

—তাহলে গেলেন কেন?

—কোথায়? ওহ্, আইন অমান্য করতে?

—হ্যাঁ।

এক মিনিট চুপ করে থাকি। তারপর বলি—চাপে পড়ে গেলাম। আমার বড়দা চিরকালই রাজনীতি করা লোক। এখন তো উপমন্ত্রী হয়েছে। জেলার লোক বলে তুমি নিশ্চয়ই সবই জানো। আচ্ছা, তোমার গাঁয়ের নামটা কি যেন...মধুর কুল?

—হ্যাঁ। মানে মধুর কুল আমার মামা বাড়ির গাঁ, ওখানেই জন্ম, ওখানেই বেড়ে উঠেছি। তবে...

—তবে? ও হ্যাঁ, শোনো আমার গ্রাম সীতানগর, অজগাঁ। দাদা ওই গাঁয়ের ছেলে। এখন মন্ত্রী হয়েছে। বরাবরই খুব দাপুটে নেতা ছিল। আমি দাদাকে কোনও দিন সহ্য করতে পারিনি।

—আচ্ছা, আপনি কি গোরার এই মৃত্যুর ঘটনা সকলকেই বলেন?

—তাই কি বলা যায়? সবাই শুনবে কেন? তুমি আমার জেলার মেয়ে বলেই বলছি। তা ছাড়া তুমি আমার কাছে একটা আবেদন নিয়ে এসেছ।

—হ্যাঁ। আপনি একবার আপনার দাদার কাছে আমাকে নিয়ে চলুন। আপনাকে কিছু বলতে হবে না, আমিই সব বলব।

—কী বলবে? চাকরি চাইবে?

—চাওয়া কি যায় না?

—যাবে না কেন। অনেকেই তোমার মতো কলকাতায় এসে ধর্না দেয়। অনেকে আমার কাছেও আসে।

—তাদের কী বলেন আপনি? এই গল্পটা শুনিয়ে বিদায় করে দেন বুঝি?

—না। গল্প তাদের বলি না। সরাসরি বলি, অতুলের সঙ্গে আমার কোনও যোগাযোগ নেই। তারা শোনে না, বুঝতে চায় না। ভাবে, আমি তাদের এড়াতে চাই বলে দাদার সঙ্গে সম্পর্ক অস্বীকার করছি।

—তাই-ই কি করেন না?

—না। একেবারেই নয়, আমি পিসির বাড়ি থাকি। পিসির ছেলে থাকে আমেরিকায়, মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে। এই বাড়িতে দাদা আসে না। পিসিই বলে দিয়েছে,

এ বাড়িতে মন্ত্রীর আসার দরকার নেই। অতুল এলে প্রতুল থাকবে না। আমি বা পিসি অতুলের পার্টির কোনও উপকার চাই না।

—ও, আচ্ছা!

—তুমি বিশ্বাস করলে না? শোনো, আমি পার্টির কাছে চাকরি চাইনি। চাইলে পেতাম।

—আপনি কী করেন?

—করি একটা কিছু, তা এমনই যে উল্লেখ করার মতো নয়। অল্প কিছু কামাই করি। বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায়, বাংলা ইংরেজি কাগজে ইলাস্ট্রেশনের কাজ করি, বইয়ের মলাট এঁকে দিই। সামান্য একটু নাম হয়েছে। ছবি আঁকি, প্রতিষ্ঠা পাইনি। পাব বলেও মনে হয় না। এ ব্যাপারেও দাদার সাহায্য চাইনি কখনও। চাইবও না।

—আমি কিন্তু আপনার কাছে সত্যিই সাহায্য চাইছি। এখানে মেয়েদের একটা সস্তা মেসে থাকি। টিউশনপত্তর করে চালাই। আপনার পিসিকেও বলেছি সেকথা এবং এখন, এই মুহূর্তে আপনাকে বলছি, আপনি আমাকে দাদার কাছে নিয়ে চলুন, সঙ্গে একটু থাকবেন। একটা চাকরি, আমার হয়ে যেতেই পারে। আমার অনার্সের রেজাল্ট মোটামুটি ভালো।

বুঝতে পারলাম, আমার গল্পটা নিমাকে ছোঁয়নি। ভেবে দেখলাম, ছোঁয়ার কথাও নয়। গল্পটা পুরোপুরি শুনতেও হয়তো চায় না মেয়েটি। কারণ, তাতে তার কোনও লাভ নেই।

আমি চুপ করে আছি দেখে হঠাৎ নিমা বলে উঠল—আপনি তো নিজের জন্য চাইছেন না। তা ছাড়া আমিই চাইব। আপনাকে খালি একটু সঙ্গে থাকতে হবে। কোনও কিছু বলতে হবে না। আপনার উপস্থিতিই আমার পক্ষে যথেষ্ট। পলিটিক্সে এখনও লোকাল ইন্টারেস্ট দেখা হয়, কারণ অতুল এম, এল, এ, আমাদের লোক। আমাদের ভোটেই এখন মন্ত্রী। তাই না? গোরাও তাঁর গ্রামের ছেলে ছিল। বলছি কি, মাটির দরদ আপনার দাদারও আছে। যত সংগ্রাম, তা উনি ওই জেলার মাটিতেই করেছেন।

—এই সব কথা তুমি অতুল এম, এল, এ-কে শোনাতে চাও? কতই তো শুনতে হয় ওকে! গোরার কথা তুমি বলতে যাবে কেন? এইসব কথা শোনাতে গেলে সাংসদ-মন্ত্রীরা আজকাল বিরক্ত হয়। খানিকটা রাগত স্বরে বলে উঠি আমি।

লক্ষ করি, এবার নিমা তার ঘাড় নামিয়ে ফেলে। চোখ রাস্তার উপর মাটিতে রেখে দাঁড়িয়ে পড়ে। উড়নিটা আবার চোখের উপর তুলে ধরে, মনে হল, অশ্রু মুছে ফেলল। অবাক হয়ে কণ্ঠ নরম করে বললাম—তুমি ভুল লোক ধরেছ নিমা। আমি পারব না। দাদার সামনে আমি কখনও দাঁড়াই না। আমি ঘৃণা করি।

—কেন করেন! একটু যেন তেতে উঠল নিমা। স্বার্থ প্রতিহত হচ্ছে দেখলে মানুষ রেগে যায়। আমাকে সে তার জেলার আত্মীয় ভেবে স্বার্থের অসহায় উদ্রেক ঘটিয়েছে, স্বার্থ জিনিসটা সিদ্ধির সামান্য উপায় দেখলে অত্যন্ত শিথিল যুক্তিকেও কঠিন ভঙ্গিমায়

উপস্থিত করে, বেকার মানুষ এভাবেই জীবনকে আঁকড়ে ধরতে চায়।

কিন্তু সহসাই নিমা কণ্ঠস্বর বদলে ফেলে বলল—রাজনৈতিক ক্ষমতাকে ঘৃণা করে আপনি বাঁচতে পারেন, কারণ আপনি আর্টিস্ট, কিন্তু আমরা পারি না। আচ্ছা, আপনারা দুই ভাই-ই আর গ্রামে যান না শুনেছি। কেন যান না?

বেশ কিছুক্ষণ দমে গেলাম আমি। এই প্রশ্ন তো কতকাল আমি নিজেকেই করেছি। বস্তুত আমি পলাতক। আমি নিজের জন্য একটি গোপন জীবন খনন করে চলেছি। একটি রক্তাক্ত ভুলে ভরা স্মৃতি আমার প্রহারক। কী করে নিমাকে আমি বোঝাব, কেন আমি সীতানগর যাই না।

প্রতুল নিমাকে বলল—অতুল এম, এল এ কেন তার গ্রামে যায় না, তার জবাব কি ভাই প্রতুলকে দিতে হবে?

নিমা বলল—গ্রামের মানুষ আপনাদের দুই ভাইকে আলাদা করে দেখবে কেন! দু'জনই আপনারা যান না, যা দেখে তাই-ই তো বোঝে মানুষ।

—ভুল বোঝে! আমি কী করতে পারি? কেন, একই বাড়ির দুই ভাই গ্রামে পৃথক দুই পার্টি করে, তারা কি আলাদা নয়? আমি তো দাদার...

—শুনুন, গ্রামের ওই দুই ভাই দুই পার্টিতে নাম লিখিয়ে দুই মুখ দিয়ে পরিবারের স্বার্থ আগলায়। মানুষ ঠিকই জানে।

—কিন্তু আমার সম্বন্ধে তোমার জানাটা ঠিক নয়। ভুলই বুঝছ কেবল। আমি তোমার জন্য কিছুই করতে পারব না। গ্রামে যাই না ভয়ে।

—ভয়!

—হ্যাঁ। সীতানগরে গোরাদের বাড়ির বাইরে পথের ধারে একটা স্মৃতিস্তম্ভ আছে। তাতে লেখা আছে, শহিদ গোরার নাম, জন্ম এবং মৃত্যুর তারিখ। ওই বেদীটার সামনে দাঁড়াবার সাহস আমার নেই। গ্রামের মানুষ আমাকে ঘৃণা করে নিমা। ভাবে, অতুল এম, এল. এ একজন অকৃতজ্ঞ মানুষ, গ্রামের জন্য কী করেছে? সে এখন কলকাতার লোক। ভাইকে পর্যন্ত নিজের কাছে টেনে নিয়েছে এবং আখের গোছাচ্ছে সেখানে। গ্রামের শহিদ বেদীকে আগলে পড়ে আছে গোরার মা। কে কাকে মনে রাখে? ক্ষমতা হাসিল হলে মানুষ সবকিছুই ভুলে যায়।

—আপনি তাই-ই মনে করেন?

—হ্যাঁ, করি।

—আমি তাহলে চাকরিটা পাব না?

—না।

—আমি কিন্তু পাব প্রতুলদা। আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। আমার আসল নাম শঙ্খমালা। নিমা নামটা অব্যবহারে মুছে গেছে। আমি মালা। গোরার বোন। মধুরকুলে মামাবাড়ি থাকতাম। কচ্চিৎ সীতানগর এসেছি। বাবা গরিব বলে মামারাই আমাকে মানুষ করেছে। আমি পাব না? বলে দু'চোখে কী এক ধরনের তীব্র আলো ফুটিয়ে তুলল নিমা।

এই ঘটনার পর প্রতুল অনেকক্ষণ পথের উপর অত্যন্ত বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। নিমা প্রতুলের এই বিমূঢ়তার সম্মুখ থেকে নিঃশব্দে সরে চলে গেল। চুপচাপ পিসির বাড়ি ফিরে এল প্রতুল।

প্রথমে ভাবল, ঘটনাটি পিসিকে বলবে। পরে কি মনে হল, পিসির সামনে নিমার প্রসঙ্গ তুলতে ইচ্ছে করল না। বেশ ক'দিন নানা রকম চিন্তা করল প্রতুল। নিমা তার চাকরির ব্যাপারে অনেকটাই নিশ্চিন্ত। শহিদের বোন দাদার শহিদত্বের বিনিময়ে এক যুগ পরে সরকারের কাছে চাকরি দাবি করছে। এই দাবি কি অন্যায্য, খুব অযৌক্তিক কিছু? তা তো নয়।

নিমার কথা অতুল এম. এল, এ-র কি মনে আছে? না থাকলে মনে করাতে হবে। মনে মনে প্রস্তুত হতে থাকে প্রতুল। একটি চাকরির খয়রাতি দিয়ে প্রতুলরা দুই ভাই, শহিদের দাম চুকাতে পারে। সীতানগরের মানুষ তাদের ঘৃণা করে, সেই ঘৃণার হাত থেকে অব্যাহতি পেতে হলে নিমার জন্য একটা চাকরির বন্দোবস্ত করাই তো উচিত।

নিমার একটি চাকরি হয়ে গেলে, প্রতুল গাঁয়ে ফিরবে। একেবারে ফিরে যাবে, তা নয়, কিন্তু মাঝে মাঝেই যেতে পারবে। গাঁয়ের গা-ঘেঁষে যে ছোট নদীটা কুলুধ্বনি করে আজও বয়ে চলেছে, তার সঙ্গে দেখা হবে। দিগন্ত-জোড়া ফসলের মাঠ, বৈঁচির বন, বাবলা ফুলে ছাওয়া দিঘির পাড়, বর্ষার কদম্ব ফুল, সরষে ফুলের ক্ষেতে উড়ন্ত প্রজাপতি, মটরশুটির নীল আর মুকুটপরা স্বর্ণালী সাদা মেঘ দেখতে পাবে প্রতুল। ডিহির মাঠে খুব প্রত্যুষে হালকা আঁধারে গোরাকে সঙ্গে করে সে পাকা কদবেল কুড়াতে যাবে।

দাদার সংগ্রামী রাজনীতি গ্রাম বাংলায় অনেক রক্ত ঝরিয়েছে, অনেক গ্রামেই শহিদ আছে। শহিদস্তম্ভও আছে নানা চাকলায়। এইসব শহিদরাই যেন প্রতুলকে গাঁয়ে ঢুকতে দেয় না, স্মৃতির ক্ষীরনদীতে বৃষ্টি হয়, সেখানে পৌঁছতে পারে না প্রতুল। এ যুগে মানুষ শহিদের জন্য নগদ দাম দাবি করে। দেওয়া-থোয়ার রাজনীতির কাছে সমস্ত দাবিই নগদানগদি হবে, তাতে অবাক হলে চলবে কেন! একজন মানুষ যদি গলা ফাটিয়ে স্লোগান দিয়েই চাকরি পায়, তাহলে নিমা চাইবে না কেন! কিন্তু গোরা কি সত্যিই শহিদ? ও তো মরতে চায়নি, বাঁচতে চেয়েছিল। ওর ওই মৃত্যুকালীন উদ্যত বিস্ময় ভুলব কেমন করে!

এক সকালবেলা প্রতুল হঠাৎ অতুলকে টেলিফোন করে। সে ভেবেছিল, সামনাসামনি হয়ে কথা বলার আগে আড়াল থেকে বলাই ভালো। প্রতুলের ফোন পেয়ে অতুল বেশ আশ্চর্য হল। বলল—তুই ফোন করছিস, কেন রে!

প্রতুল কোনও ভূমিকা না করেই বলল—তোমার গোরাকে মনে আছে দাদা!

—কেন থাকবে না! কেন, কী হয়েছে?

—শঙ্খমালা, নাম, যাকে আমরা মালা বলে জানতাম, গোরার একটি বোন আছে। মনে করতে পারো?

—ও আচ্ছা! হ্যাঁ, তার কী হয়েছে?

—হয়নি কিছুই। মালা বি, এ পাশ করে এখন এম, এ পড়ছে। পিসির এই

পাড়ারই পুবদিকে, গোড়খাড়ায় একটি মেয়েদের মেসে থাকে। টিউশনপত্তর করে। ওর একটা চাকরি দরকার। তুমি দেবে?

—তোকে এসে ধরেছে?

—হ্যাঁ, ধরো তাই। দিতে পারো না! গোরার বোন, ভেবে দেখো। তোমার কথা শুনে, আন্দোলনে গিয়ে আমি আমার বন্ধুকে হারিয়েছি।

—আমার ক্ষমতা কতটুকু প্রতুল! আমি পার্টিকে বলতে পারি, পার্টি কমপেনসেট করবে।

—ক্ষতিপূরণ চাইছি না। চাকরি চাইছি। কারণ এর ক্ষতিপূরণ হয় না।

—আচ্ছা ভেবে দেখি। তবে আজকাল অর্থ সাহায্য করা হচ্ছে, চাকরি তো হচ্ছে না।

—তাহলে এতদিন কমপেনসেট করনি কেন?

—গোরার মৃত্যুর পর, পার্টি থেকে চাঁদা তুলে সাহায্যের একটা চেষ্টা তো হচ্ছিল, গোরার আত্মীয়-স্বজন ওই সাহায্য নিতে চায়নি। তুই সে কথা জানিস না, মনে নেই তোর? প্রত্যেক বছর, গোরার মৃত্যুদিনে তেসরা আগস্ট পার্টি শহিদ স্মরণের অনুষ্ঠান করে। শহিদ বেদীতে মালা দেওয়া, ফুল দেওয়া—তারপর বক্তৃতা—আমি যেতে পারি না, কিন্তু খবর তো পাই। তুই মালাকে বলে দে, পার্টি ফান্ড থেকে সাহায্য দেওয়া হবে। চাকরি হবে না। বলেই অতুল টেলিফোন ছেড়ে দিল।

পরের দিনই নিমা এল প্রতুলের পিসির বাড়ি। এসেই বলল—কিছু ভেবে দেখলেন প্রতুলদা! আমাকে নিয়ে যাবেন দাদার কাছে?

—না যাব না। তোমার চাকরি হবে না নিমা। আমি টেলিফোনে মন্ত্রির সঙ্গে কথা বলেছি। ওরা কিছু ক্ষতি পূরণ দেবে। তুমি এক কাজ করো, টাকাটাই নাও। আমি আমার বন্ধুর স্মৃতিকে বেচে দিই। একটি কদবেলের কত দাম নিমা? একটি নদী, তার দাম কত! কী আশ্চর্য, তার সেই বিস্ময়কর দৃষ্টি কেন যে আমি ভুলতে পারি না। বলে দু'হাতে মুখ ঢাকে প্রতুল।

প্রতুলের এই অদ্ভুত কষ্ট চোখ বড় বড় করে চেয়ে দেখে নিমা। কথা বলে না। এমন সময় টেলিফোনটা বেজে ওঠে, রিসিভার কানে তুলেই অতুলের গলা শুনতে পায় প্রতুল। সঙ্গে সঙ্গে প্রতুল কিছুটা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। দ্রুত বলে ওঠে—আমি তোমাকে বলি দাদা। আমার একবার গাঁয়ে ফেরা দরকার। তেসরা আগস্ট ফিরব। তার-আগে নিমার চাকরি তোমাকে করে দিতে হবে। আগস্ট মাস অনেক দূরে। আমি ওই গাঁয়ে গিয়ে যেন বলতে পারি, গোরার জন্য আমার আর কোনও কষ্ট নেই। শহিদ বেদীতে ফুল চড়ানোরও আর দরকার নেই। আমাকে একটি চাকরি দিতে পারতে তুমি। আমি চাইনি। আমি সেটা গোরার বোনের জন্য চাইছি। কী বলছ, এবার বলো।

টেলিফোনের ও-প্রান্ত থেকে কী কথা ভেসে এল নিমা শুনতে পেল না। কিন্তু এক মিনিটের মধ্যেই প্রতুলের মুখ আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। লক্ষ করল নিমা। রিসিভার

কান থেকে নামিয়ে রেখে প্রতুল অস্থির আবেগে বলে উঠল—তোমার চাকরিটা হয়ে যাচ্ছে নিমা। কালই আমাদের দেখা করতে হবে।

—আমি বলেছিলাম, চাকরি আমার হবেই। মা এক যুগ ধরে বেদীটা সাফসুতরো করে রেখেছে। ঝোপজঙ্গলে যাতে ঢাকা না পড়ে সেই চেষ্টাও করেছে মা। রোজ সন্ধ্যায় ধূপবাতি দেয়, মোমবাতি জ্বলে। তুমি একবার আমার সঙ্গে যাবে প্রতুলদা! ওখানে গিয়ে দাঁড়ালে তোমার খুব আনন্দ হবে, কদবেলের গন্ধও পাবে তুমি। যাবে না? নিমা বলে ওঠে আবেশ ধরা গলায়। যেন বা সে বিহ্বল হয়ে পড়েছে।

প্রতুল এবার চোখ দু'টি ছোট করে বেদনার্ত দৃষ্টিতে নিমাকে দেখতে থাকে এবং সেই দৃষ্টি ঘৃণায় ভরে যায়। সে বলে ওঠে—আমি আর কোনও গন্ধ পাব না নিমা। আমি সীতানগর ফিরবও না কখনও।

নিমা হঠাৎ বলে উঠল—তোমাকে ফিরতেই হবে প্রতুলদা। কারণ চাকরিটা আমি নিচ্ছি না। তুমি যা পারো, আমিও তাই পারি। তুমি আমাকে বিয়ে করবে?

আমি নিমার প্রস্তাবে এতই বিমূঢ় এবং আনন্দিত হয়ে উঠি যে, মনে হয়, গোরার সেই বিস্ময়ঘন দৃষ্টি আরও উজ্জ্বল হয়ে উঠল। আস্তে করে বলি—ইস্। পিসিকে তাহলে তো বলতে হয় কথাটা!